শ্রী স্বপনকুমার

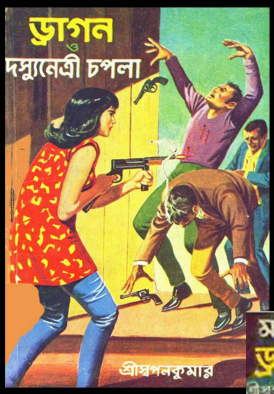

ড্রাগন

সমগ্র

দ্বিতীয় খন্ড

ড্রাগন সমগ্র

দ্বিতীয় খন্ড

শ্রীস্বপনকুমার

প্রকাশক ঃ
শ্রীমতী নির্মলা আগরওয়াল
রাধা পুস্তকালয়
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
সেপ্টেম্বর—২০০৪

মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা

বর্ণসংস্থাপন ঃ
টাইপ সেটার (বি. জি. প্রিন্টার্স)
১৯ই গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা-৬

মুদ্রাকর ঃ
অন্নপূর্ণা এজেন্সি
৬১, সূর্য্য সেন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ড্রাগনের অভিযান	৫
হত্যা তদন্ত	৮
তদন্তে দীপক চ্যাটার্জি	১২
দ্বিতীয় শিকার	১৫
সায়ানাইড	১৮
মৃত্যুর আহ্বান	২২
গোপন সভা	২৬
নাইট ক্লাব	২৯
নৈশ অভিযান	৩১
ড্রাগনের পালায়ন	৩৩
রক্তলোলুপ ড্রাগন	
প্রথম চ্যালেঞ্জ	৩৫
একজোড়া দস্তনা	৩৮
হীরা রহস্য ও দীনদয়াল	৪২
ডাগনের ছায়া	৪৬
বিশ্লেষণ	৪৮
ভয়াবহ ডাকাতি	৫০
ভয়ঙ্কর জালিয়াতি	৫২
সন্দেশের দোকান	৫৫
সফল সন্ধানে	৫৯
গোপন বৈঠকে হানা	৬০
সংঘর্ষ	৬২
আকাশ পথে ড্রাগন	
এরোপ্লেনে রহস্যময়ী নারী	৬৫
অনুসন্ধান	৬৮
এ মেয়ে ত মেয়ে নয়	৭১
আবার ডাকাতি	৭৩
সূত্র আবিষ্কার	৭৬
নারী হত্যা	৭৮
আকস্মিক গ্রেপ্তার	৮১
ঘটনা চক্র	৮৪
ড্রাগনের পশ্চাতে	৮৬
মুখোমুখী	৮৮
মুক্তির পথে	৯০

বিষয়	পৃষ্ঠা
আবার আকাশপথে	৯২
ছদ্মবেশী ড্রাগন	
স্প্রে মেশিনের রহস্য	৯৪
রহস্যজনক নারীহত্যা	৯৬
সেই কাটা হাতটা	১০০
ভদ্রায় তদন্ত	১০২
সরল সন্ধান	১০৫
আর একটা হত্যার প্রচেষ্টা	১০৭
দীপক সমীপে	১১০
মিস ডরোমির রহস্য	১১৩
ড্রাগনের ছোঁয়া	১১৫
ড্রাগনের চক্রান্ত	১১৮
প্রথম পরিচয়	১২৪
ড্রাগনের হতাশ	১২৯
জাল চেকের রহস্য	১৩০
লুণ্ঠন ও হত্যা	১৩৩
মৃত্যু পরোয়ানা	১৩৬
হত্যার প্রচেষ্টা	১৩৭
ড্রাগনের গ্রেপ্তার	১৪১
ফাঁসির মঞ্চে ড্রাগন	১৪৩
ড্রাগনের হুঙ্কার	১৪৪
বিপদের মুখে দীপক	১৪৬
মৃত্যুর ফাঁদে	১৪৮
পরিশেষ	১৫১
অজানা দ্বীপে ড্রাগন	
হলধর হালদার	১৫৩
চক্রান্তের জাল	১৫৬
ড্রাগনের ছোঁয়া	১৫৮
হোটেলে নরহত্যা	১৬১
ড্রাগনের হুঙ্কার	১৬৫
একটি সূত্র	১৬৭
আবার প্রতারণা	১৭০
আকস্মিক আঘাত	১৭৩
ড্রাগনের নিশানা	১৭৬
অজানা দ্বীপের পথে	১৭৯
অজানা দ্বীপে	১৮১

ড্রাগন সমগ্র

।। এক।।

ড্রাগনের অভিযান

রসময়কে নিশ্চয়ই আপনারা চেনেন?

আলমবাজারের আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই তাকে চেনে তার মধুর ব্যবহারের জন্যে!

ধনীর ছেলে সে নয়। আলমবাজার অঞ্চলের একটা বস্তিবাড়ির একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে সে থাকে। তবে লোকের বিপদে-আপদে বুক দিয়ে সাহায্য করে বলে সর্বত্র তার খ্যাতি।

আলমবাজারে লোক জানে—বিপদ উপস্থিত হলে একবার রসময়ের কাছে তা খুলে বললে, সে যেমন করেই হোক তাকে সাহায্য করবেই।

অবশ্য সব সময়ে অর্থ দিয়ে করতে পারে না সে। তবু লোকে তাকে খুব ভালবাসে, কারণ নানাভাবে সাহায্য তার দ্বারা সম্ভব।

কারো বাড়িতে কঠিন অসুখ—চিকিৎসা হচ্ছে না টাকার অভাবে; রসময়ের কাছে খবর গেলেই, সে যেখান থেকে হোক পাঁচজনের কাছে চেয়েচিন্তে টাকা যোগাড় করে ঔষধের ব্যবস্থা ঠিক করে দেবে।

কারও বাড়িতে কেউ মারা গেছে, শ্মশানে যাবার লোক নেই; রসময়ের কাছে খবর গেলেই, সে লোকজন যোগাড় করে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ঠিক করবে।

তবে একটা কথা, টাকা ধার সে কাউকে দেয় না, যাকে যতটুকু পারে সাহায্য করে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে।

কিন্তু একটা কথা কেউ জানে না।

সে কথাটা হলো রসময় কি করে—বা কি করে তার দিন চলে।

বছর চার-পাঁচ হলো ঐ অঞ্চলে এসে ঘর ভাড়া নিয়েছে। এর মধ্যেই সকলে তার সুখ্যাতিতে মুখর।

সকাল থেকে সে চায়ের দোকানে বসে গল্প করে সময় কাটায়। এর মধ্যে কারও কোনও সাহায্য প্রয়োজন হলে করে। দুপুরে কোথায় যেন বেরিয়ে যায়, হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করে। বেলা দুটো-তিনটে নাগাদ ফিরে আসে।

তারপর আবার চায়ের দোকানে আড্ডা। রাতে কিছু খাবার কিনে নিয়ে বাড়িতে ঢোকে; খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমোয়। ওঠে পরের দিন সকালবেলা।

সারাটা দিন যে তার কি করে কাটে তা সবাই জানে। কেবল দুপুরে দু'তিন ঘণ্টা সে বাড়িতে থাকে না।

কোত্থেকে সে এসেছে তা কেউ জানে না। এর আগে কোথায় ছিল তাও কেউ জানে না। কেউ প্রশ্ন করলে বলে—এর আগে ছিলাম ভবঘুরে।

অনেকে বলে, দুপুরে রসময় নাকি কোন এক জুয়ার আড্ডায় গিয়ে জুয়া খেলে। আড্ডাটা কোলকাতায়।

সবাই অবশ্য এ কথা বিশ্বাস করে না। তবে রসময় যে কোত্থেকে অর্থ উপার্জন করে, সে রহস্য কেউ জানে না। আর তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কারও নেই।

সেদিন রাত দশটা।

অন্যদিনের মতোই বেলা দুটো নাগাদ বের হয়েছিল রসময়। কিন্তু ফিরতে ফিরতে সেদিন রাত দশটা বেজে গেল।

হোটেলে সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ সে ঘরে ফিরলো।

ঘরের তালা খুলে দেখে, ঘর অন্ধকার। কিন্তু আলো জ্বালাবার আগেই সে অনুভব করল, ঘরের মধ্যে যেন একজন লোক আছে।

রসময় চমকে উঠল।

বললে—কে? কে এখানে?

কোন উত্তর নেই। রসময় মোমবাতিটা খোঁজার জন্যে হাত বাড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে দু'খানা বলিষ্ঠ হাত আচমকা যেন কোত্থেকে এসে তার মুখটা টিপে ধরল।

কোনও কথা বের হলো না রসময়ের মুখ দিয়ে। একটা অদ্ভুত গন্ধ তার নাকে ভেসে এলো।

মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে। রসময় চিৎকার করার চেষ্টা করে, কিন্তু কোন শব্দ বের হয় না।

জ্ঞান হারিয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

জ্ঞান হারাবার আগের মুহূর্তে তার মনে হয়, কে যেন একটা আলপিন ফুটিয়ে দিলে তার ডান বাহুতে।

তারপর আর কোনও হুঁশ থাকে না তার। ধপ করে পড়ে যায়।

সেই সামান্য শব্দ বাড়ির অন্য কোন লোকের কানে পৌঁছয় না।

রসময় পড়ে গেলে লোকটা একটা টর্চ জ্বেলে সারাটা ঘরের মধ্যে কি যেন খুঁজতে থাকে।

কি খুঁজছে সে কেউ জানে না।

টর্চের মৃদু আলোয় দেখা যায়, তার সারাটা দেহ ভারী একটা ওভারকোটে ঢাকা। কোটের কলার তোলা। মাথায় টুপি—সেটা কিঞ্চিৎ নামানো, ভ্রূ পর্যন্ত!

মুখের অর্ধেকের বেশি ঢাকা। চোখেও একটা কালো চশমার আবরণ। ডান হাতে শক্তিশালী একটা রিভলবার।

বাঁ হাতের টর্চটা জ্বেলে, সে কি যেন খুঁজছিল। একটা পরে একটা বাক্সের মধ্য থেকে সে পায় এক টুকরো কাগজ।

ছোট্ট কাগজ।

তাতে কি যেন হিজিবিজি লেখা, তা সাধারণ কেউ দেখলে বুঝতেই পারবে না।

লোকটা নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলে টাকা যা খুশী থাক না কেন, আসল জিনিসটা তা পাওয়া গেছে।

সেটা পকেটে ফেলে সে। তারপর বেরিয়ে আসে ঘর ছেড়ে পথে।

বাইরে আধো অন্ধকার।

দূরে দূরে গ্যাসপোস্টের আলোগুলো জ্বলছে টিমটিম করে। সে আলোয় অন্ধকার দূর হচ্ছে না—বরং আরও যেন বেশি রহস্যময় ভাবে চারদিক আচ্ছঃ

তার উপর শীতের কুয়াশা। একটু দূরের জিনিসও দেখা যায় না।

লোকটা পথে নামল।

পায়ের ক্রেপসোল জুতোর কোনও শব্দ হলো না। কেউ তাকে দেখল না। শুধু দূরে দু'একটা কুকুর ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে লোকটা এগিয়ে গেল প্রায় দু'তিনশো গজ।

সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল একটা মোটর গাড়ি। তাতে বসেছিল একজন লোক। বোধ হয় লোকটির ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল।

সে বললে—পেয়েছেন কর্তা?

—হ্যাঁ, চালাও।

—কোন দিকে চালাব?

—ডান্‌লপ ব্রীজের তিন নম্বর আড্ডায়।

—আচ্ছা, কর্তা।

গাড়ি ছুটে চলল লোকটা গাড়িতে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে।

কেউ জানল না, রাতের আঁধারে কি ভয়াবহ দৃশ্যের অভিনয় হলো আর এই লোকটাই বা কি ভয়ঙ্কর ব্যক্তি।

গাড়ি ছুটল!

পেছনে পড়ে রইল শুধু পেট্রোলের পোড়া গন্ধ আর ভিজে বাতাসের আর্তনাদ।

।। দুই।।

হত্যা তদন্তে

পরদিন সকাল।

রসময় যে ঘরটাতে থাকত, তার পাশের একটা ঘরে থাকে রবীন মাস্টার আর তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা।

রবীন মাস্টারী করে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আই.এ.পাস। বি.এ. পড়েছে মাস্টারী করার ফাঁকে ফাঁকে। এটা পাস করতে পারলে আরও বড় স্কুলে সে সুযোগ পাবে, এই তার আশা।

সকাল সাতটা।

রবীন ঘুম থেকে উঠে চা খাবার আগে মুখ-হাত ধুতে বাইরে এসেছে এমন সময় দেখে রসময়ের ঘরের দরজাটা খোলা। ভেতরে সে পড়ে আছে মেঝেতে।

কি ব্যাপার?

বুঝতে পারে না রবীন। সে এগিয়ে যায় ঘরের মধ্যে। দেখে মেঝেতে পড়ে আছে রসময়ের দেহ।

রবীন ডাকে— রসময়বাবু।

কোন উত্তর নেই!

গায়ে হাত দিতেই চমকে ওঠে রবীন! দেহটা যেন পাথর হয়ে গেছে, তাতে প্রাণের স্পন্দন নেই।

রবীন চীৎকার করে ওঠে। চীৎকার শুনে দু'একজন ছুটে আসে। তারা সবাই প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার, মাস্টারমশাই?

রবীন বলে—রসময় বাবু মারা গেছেন। কিন্তু এ-মৃত্যু ত স্বাভাবিক নয়। বোধ হয় কেউ তাঁকে খুন করেছে।

—খুন!

সবাই আঁতকে ওঠে যেন।

—হ্যাঁ, তাই ত মনে হচ্ছে। তা না হলে তাঁর মত সুস্থ-সবল লোকের ত হার্টফেল হতে পারে না এত সহজে!

—তা বটে। তা হলে উপায়?

—থানায় খবর দিন।

—আপনিও একটু চলুন না।

—হ্যাঁ, তা যাব, নিশ্চয় যাব।

তিন-চারজন মিলে তখনই চৌমাথার মোড়ের একটা দোকান থেকে ফোন করল বরাহনগর থানায়।

বরাহনগর থানার ও.সি. মিঃ বটব্যাল বেশ রাশভারী লোক।

যেমন চেহারা তেমনি মেজাজ। মানুষকে তিনি মানুষ বলেই গণ্য করেন না।

তিনি ফোন তুলে বললেন—হ্যালো, কি ব্যাপার, এত সকালে?

—আজ্ঞে স্যার, খুন।

—খুন!

মিঃ বটব্যাল নড়ে চড়ে বসলেন। তারপর বললেন—কোত্থেকে বলছেন?

—আলমবাজার থেকে। আপনারা যদি দয়া করে একবার আসেন—

—হ্যাঁ, নিশ্চয় আসব। খুন হয়েছে কোথায়?

—একটা বস্তিতে। আমরা আলমবাজারের মোড়ে অপেক্ষা করছি।

—ঠিক আছে। আমরা শীগ্‌গিরই যাচ্ছি আপনাদের ওখানে।

—ধন্যবাদ, স্যার।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন মিঃ বটব্যাল।

সেকেণ্ড অফিসার মিঃ তালুকদার সামনেই বসেছিলেন।

তিনি বললেন—আমি যাব স্যার?

না, খুনের কেস যখন, তখন আমিই যাচ্ছি।

—দেখুন ত কি ব্যাপার, উঃ—একেবারে খুন! এরকম খুন আমাদের এরিয়াতে গোটা তিন-চারেক হলেই বাস। আর চাকরী বজায় থাকতো না।

মিঃ তালুকদার মনে করেছিলেন যে, তিনি এই খুনের কেসটার তদন্তের ভার পেলে, কর্মদক্ষতা দেখিয়ে প্রমোশনের চেষ্টা করবেন, কিন্তু ব্যাপার দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে, সে আশা-দুরাশা মাত্র।

তিনি মনে মনে খুব বিরক্ত হলেন। সাধারণত খুনের কেস ত আর সব সময় পাওয়া যায় না। তবে বিরক্ত হলেও সে ভাব চেপে রাখলেন।

মিঃ বটব্যাল বললেন—দেখি কি ব্যাপার। হঠাৎ খুন হলো কেন?

মিঃ তালুকদার বললেন—বস্তিতে খুন ত?

—হ্যাঁ।

—বোধ হয় মদ খেয়ে মারামারি বা ঐ ধরনের কিছু হবে।

—তা হতে পারে।—দেখা যাক—

দু'জন পুলিশ নিয়ে জীপে করে তিনি বেরিয়ে পড়লেন তক্ষুণি।

কিন্তু অকুস্থলে পৌঁছেই মিঃ বটব্যালের একেবারে চক্ষুস্থির হবার উপক্রম।

ঘরেয় মাঝামাঝি রসময়ের মৃতদেহটা পড়ে আছে।

তার ডান হাতে পিন ফুটিয়ে তার সঙ্গে একটা কাগজ লাগানো।

দেখলেন সেই কাগজে বিরাট একটা ড্রাগনের ছবি আঁকা। বীভৎস চেহারার ড্রাগনটা শিকারের উপর ওৎ পেতে বসে আছে।

তার নিচে লেখা—

ড্রাগনের প্রতিহিংসা—এক!

সেটা দেখে ত মিঃ বটব্যাল বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়লেন।

তিনি দেখলেন, ঘরের জিনিসপত্র সব লণ্ডভণ্ড। কে যেন ঘরের মধ্যে কিছু খুঁজছিল। কিন্তু সে তা খুঁজে পেয়েছে কিনা, তা বোঝা যায় না!

মৃতদেহে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। তা হলে কিভাবে লোকটাকে হত্যা করা হলো?

সব কিছু দেখে মিঃ বটব্যাল হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি বুঝলেন যে, এটা সাধারণ খুনের কেস নয়। এর সঙ্গে বিরাট রহস্য জড়িত।

তবে রহস্যটা কি তা বুঝতে পারলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ বাইরে এসে ফোন করলেন লালবাজারে ডি. সি. মিঃ সেনের কাছে।

মিঃ সেন সব ঘটনা শুনে বললেন—এ ব্যাপারটা ত খুব সাধারণ মনে হচ্ছে না। কে এই ড্রাগন? আর প্রতিহিংসাই বা সে নিচ্ছে কেন?

কিছুই জানি না—তবে যখন 'এক' লেখা আছে, তখন নিশ্চয় এই ধরনের আরও হত্যাকাণ্ড হতে পারে।

—তা বটে।

—ঠিক আছে আপনি কোনও জিনিসপত্র সরাবেন না। আমরা আসছি।

—ও, কে, স্যার।

মিঃ বটব্যাল গভীর বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ভেবেছিলেন সাধারণ একটা খুন, তিনি এটা সলভ্ করে সুনাম বৃদ্ধি করবেন—কিন্তু তা আর হলো না।

তিনি ফোন করে ফিরে এসে সবাইকে জেরা করতে শুরু করলেন!

একজনকে বললেন, প্রথমে কে মৃতদেহটা দেখেছিল জানেন?

—হ্যাঁ, রবীনবাবু।

—ডাকুন তাঁকে।

—আচ্ছা, স্যার।

একজন গিয়ে রবীন মাস্টারকে পাশের ঘর থেকে ডেকে আনল।

মিঃ বটব্যাল তাকে জেরা শুরু করলেন।

—আপনার নাম?

—আজ্ঞে রবীন মুখোপাধ্যায়।

—কি করেন?

—আজ্ঞে মাস্টারী, প্রাথমিক স্কুলে।

—আপনি প্রথম ডেডবডিটা দেখেন?

—হ্যাঁ, স্যার।

—তখন বেলা ক'টা?

—সাতটা মতো হবে।

—আপনার ঘর কোন্‌টা?

—ঐ পাশেরটা, স্যার।

—হঠাৎ ঐঘরে এলেন কেন বলতে পারেন?

—আজ্ঞে, আমার বাথরুমের যাবার পথ যে এখান দিয়ে; আমি মুখ ধুতে বাইরে আসি।

—বুঝেছি! এসে কাউকে ডাকেন?

—হ্যাঁ। রসময়বাবুর মৃতদেহটা দেখেই আমি চীৎকার করে উঠি। তা শুনে অনেকে ছুটে আসে।

—রসময়বাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল?

—সামান্য।

—তিনি কি করতেন?

—তা ত জানি না। কিছুই ত করতে কখনো দেখিনি। তবে দুপুরে কোথায় যেন বেরিয়ে যেতেন।

একটু ভেবে মিঃ বটব্যাল ধমকে উঠলেন—দেখুন, কোনও কথা গোপন করছেন না ত?

—না, স্যার। তাতে লাভ কি?

মিঃ বটব্যাল তখন আরও দু'তিনজন প্রতিবেশীকে ডেকে নানা প্রশ্ন করলেন কিন্তু কেউই বলতে পারল না রসময় কি করতো।

—তিনি তখন একজনকে প্রশ্ন করলেন—লোকটা কিরকম ধরনের ছিল জানেন?

—খুব ভাল লোক ছিল, স্যার। লোকের বিপদে-আপদে সাহায্য করত খুব।

—কতদিন এখানে ছিল?

—তা প্রায় চার পাঁচ বছর হবে।

—তার আগে কোথায় ছিল?

—তা ত জানি না। বাড়িতে খুব কমই থাকত। বেশির ভাগ সময়ই চায়ের দোকানে, না হয় বাইরে ঘুরে বেড়াত, ব্যাচেলার লোক ত।

তা বটে।

কোনও দিক থেকেই কোনও সূত্র বের হচ্ছে না। মিঃ বটব্যাল চিন্তিত হলেন।

—আচ্ছা, রসময়বাবুর কাছে কেউ আসত?

—মাঝে মাঝে দু'একজন বন্ধু আসত, তা ছাড়া কেউ নয়।

—কোথাকার বন্ধু?

—আজ্ঞে এই পাড়ার ছোকরা, বাইরের কেউ নয়।

—'ড্রাগন' নামে কোনও লোকের নাম বা কথা তাঁর কাছে শুনেছেন?

—কখনো না। সত্যি আশ্চর্য—এত ভাল লোক যে হঠাৎ খুন হবে—

—তা ভাবতে পারেননি, তাই না? দুনিয়াতে অনেক কিছু হয়। যাকগে, আত্মীয়-স্বজন কেউ আছেন এঁর?

—জানি না। কাউকে ত কখনো এখানে আসতে দেখিনি স্যার।

—ঠিক আছে। দেখা যাক কতদূর কি করা যায়।

মিঃ বটব্যালকে চিন্তিত দেখাল।

।। তিন ।।

তদন্তে দীপক চ্যাটার্জী

সকাল আটটার মধ্যেই হঠাৎ দ্রুতপায়ে মিঃ সেনকে প্রবেশ করতে দেখে দীপক চমকে উঠল।

—কি ব্যাপার, মিঃ সেন। এত সকালে যে?

—হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত কেস, যাবেন নাকি?

—কোথায়?

—বরাহনগর আলমবাজারে। কেসটা অদ্ভুত বলেই ভাবলাম যাবার পথে আপনাকে নিয়ে যাই।

—মার্ডার কেস?

—হ্যাঁ, কিন্তু আনট্রেসেব্‌ল। তা ছাড়া লোকটার দেহে কোনও আঘাতের চিহ্নও নেই। দেখলে হার্টফেল করেছে বলে মনে হয়।

—তা হলে?

—কিন্তু তার বাহুতে ফোটানো একটি পিন, তাতে আটকানো একটা কাগজ। তাতে লেখা—'ড্রাগনের প্রতিহিংসা—এক'। ড্রাগন যে কে, তাও জানি না।

—আশ্চর্য তো!

ড্রাগনের নাম শুনে দীপক যেন একটু চমকে উঠল।

বললেন—তবে কি কোলকাতায় ড্রাগনের আবির্ভাব ঘটল!

—কে এই ড্রাগন?

—আমি জানি বোধ হয়। যা হোক চলুন, ফিরে এসে বলব।

—আচ্ছা।

—তদন্ত কেউ করছে নাকি?

—হ্যাঁ। স্থানীয় থানার ও, সি, মিঃ বটব্যাল ফোনে জানান আমাকে। তিনি বোধ হয় হালে পানি পাচ্ছেন না তাই....

—তা বটে। যাক আমরা ত আছি। দেখি কি করতে পারি। তবে আশা রাখি, কিছু সূত্র হয়তো বের করতে পারব।

দীপক পোশাক পালটে ফেললে। তারপর মিঃ সেনের জীপে গিয়ে উঠল।

জীপ ছুটে চলল বরাহনগরের দিকে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীপক ও মিঃ সেন দেখলেন, ছোটোখাটো একটা ভিড় জমে গেছে সেখানে।

দীপক, মিঃ সেন ও বটব্যাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

দীপক মৃতদেহটাকে ভাল করে দেখল। দেহের কোথাও কোন ক্ষতচিহ্ন নেই। কেবল একটা আলপিন ফোটানো আছে বাহুতে।

দীপক নিচু হয়ে মৃতের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি যেন শুঁকতে লাগল। তারপর খাটের নিচে মুখ দিয়েও সে কি যেন শুঁকল। তারপর বললে—যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই।

—কি ব্যাপার? মিঃ সেন প্রশ্ন করলেন।

ক্লোরোফর্মের গন্ধ পাচ্ছি। হত্যা করার আগে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করা হয়েছিল।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। তারপর এই পিন ফুটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আমার মনে হয় এই পিনে তীব্র কোনও বিষ আছে।

—তা হলে তো পোস্টমর্টেম-এ পাঠানো উচিত; তাই নয় কি?

—হ্যাঁ।

মিঃ সেনের নির্দেশে ডেড বডি পোস্টমর্টেম-এ পাঠানো হলো।

মিঃ সেন বললেন—এটা কি ব্যাপার বলে মনে করেন, মিঃ চ্যাটার্জি?

দীপক একটু চিন্তা করে বললে—এই ড্রাগন কে বা কারা, কিংবা কেন তারা কোলকাতায় এসেছে, তা না জেনে কিছু বলা যায় না। আমার বাড়িতে সারা পৃথিবীর ক্রিমিন্যালদের হিষ্ট্রি যোগাড় করে নোট করা আছে। আমি সেটা দেখে হয়ত কিছু বলতে পারব।

মিঃ সেন বললেন—ঠিক আছে।

দীপক তারপর বললে—বাড়ির লোকদের কি জেরা করা হয়েছে, মিঃ বটব্যাল?

—হ্যাঁ, আমি সব রেকর্ড করে নিয়েছি।

—দেখি সেগুলো।

পড়ে দেখ্‌ল দীপক। তারপর চিন্তিতভাবে বললে—কেসটা তা হলে খুব সাধারণ নয়। এরকম ঘটনা আরও ঘটলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

—তা বটে। মিঃ বটব্যাল বললেন কারণ এতে লেখা আছে, ড্রাগনের প্রতিহিংসা—এক। তার মানে, আরও দু'একটি এমনি ঘটনা ঘটতে পারে।

দীপক একটু থেমে বললে—আমার যা জানবার জানা হয়ে গেছে, এবারে চলুন যাওয়া যাক।

মিঃ সেন বললে—চলুন।

দীপক গিয়ে জীপে উঠল।

জীপ চলতে শুরু করলে দীপক বললে—কিছু একটা সূত্র ড্রাগনের আবির্ভাব ঘটেছে। তবে সেটা যে কি, তা বুঝতে পারছি না।

—নিশ্চয়ই মূল্যবান কিছু।

—তা বটে। তবে এরকম একটা লোকের কাছে কি এমন মূল্যবান বস্তু থাকতে পারে?

—শুধু একটা জিনিস দ্রষ্টব্য, মিঃ সেন। তা হলো, গত চার-পাঁচ বছর সময় কিছুই করত না। অথচ বেশ তার ভালভাবে চলে যেত। তার মানে, মোটা কোনও দাঁও মেরে সে এখানে এসে বাস করছিল।

—তা হওয়া সম্ভব।

দীপক আর কোনও কথা বললে না।

।। চার।।

দ্বিতীয় শিকার

—বাড়িতে এসে দীপক চাকর ভজহরিকে চা আনতে আদেশ দিল।

চা ও খাবার খেতে লাগলেন মিঃ সেন। দীপক খুঁজে বের করল কয়েকটা মোটা মোটা খাতা। এসব বাঁধানো খাতায় দেশ-বিদেশের বড় বড় সমস্ত ক্রিমিন্যালদের ইতিহাস রেকর্ড করা আছে।

অবশেষে একটা খাতা বের করে তার মধ্যে একটা পাতা খুঁজে বের করল—ড্রাগনের ইতিহাস।

মিঃ সেন দেখলেন, তাতে লেখা ঃ—

ড্রাগন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি বিখ্যাত দল। তাদের দলে প্রচুর লোক আছে—তারা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে। এদের দলপতি একজন বার্মিজ—তার নাম, ইউ নাম। তবে লোকটা যে কোন্ দেশের তা সহজে বোঝা যায় না। কারণ তার পিতা বার্মিজ, মাতা ভারতীয়। তবে নিজেকে সে বার্মিজ বলেই পরিচয় দেয়।

ঐ লোকটি আট-দশটি ভাষায় অনর্গল কথা বলে যেতে পারে ।

বর্মা, থাইল্যাণ্ড, বাটাভিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, হংকং, পর্যন্ত তাদের দলের কাজকর্ম চলে।

আজ পর্যন্ত এরা কত যে নরহত্যা করেছে, তা গুণে বলা যায় না। শিকারী নেকড়ের মতোই এরা হিংস্র মানুষের প্রাণের কোনও মূল্য দেয় না।

ভারতের বুকে এদের আবির্ভাব আজ অবধি হয়নি। এদের সংকেত চিহ্ন হলো ড্রাগনমূর্তি!

একবার এদের দলপতি হংকং-এ ধরা পড়েছিল—তবে বিচার চলা কালেই সে জেল থেকে পালিয়ে যায়। আর ধরা পড়েনি।

এই খানেই লেখা শেষ।

মিঃ সেন বললেন—এর বেশি আর কিছু জানেন না দীপকবাবু?

—না।

—তবে আপনার কি ধারণা এই ড্রাগনই এসেছে ভারতের বুকে?

—তাই তো মনে হয়। তা ছাড়া সাধারণ কোনও দস্যুর এত সহজে একটা সূত্রহীন মার্ডার করে পালাতে সাহস হতো না।

—তা বটে।

—কিন্তু কেন যে এখানে হঠাৎ হানা দিল তা বুঝতে পারছি না, হয়ত বিশেষ

কারণ আছে।

—তা থাকা সম্ভব।

একটু থেমে দীপক বললে—আর একটা কথা, মিঃ সেন, ঐ রসময় লোকটার একটা ফটো তুলে নিতে পারলে ভাল হয়। পুরানো ক্রিমিন্যাল রেকর্ড থেকে দেখবো, লোকটা কোনও পুরানো অপরাধী কিনা।

—বুঝেছি।

আর কথা বাড়ান না মিঃ সেন। বললেন—এবার তা হলে উঠি মিঃ চ্যাটার্জী। অনেক কাজ আছে আমার।

—তা তো বটেই।

মিঃ সেন উঠে দাঁড়ান।

ভোরের ঘুম থেকে উঠে একঘণ্টা মর্নিং-ওয়াক করা, মিঃ সেনের বহু দিনের অভ্যাস।

রোজ ভোর পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটায় তিনি ঘুম থেকে ওঠেন।

তারপর পোশাক পরে ফেলেন। হাতে নেন একটা ঘড়ি। তারপর বের হন ভ্রমণে। ভ্রমণ শেষে তিনি যান মার্কেট, বাজারটাও সেরে নিয়ে বাড়ি ফেরেন।

পার্কস্ট্রীটে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে তিনি থাকেন। সেখান থেকে হেঁটে যান এসপ্ল্যানেড অবধি। সেখান থেকে মার্কেটে।

সেদিনও অন্যদিনের মতো তিনি বেড়াতে বের হয়েছিলেন। তখনও পূর্বদিক পুরোপুরি ফর্সা হয়নি। পাখিরা ডাকছে। একটু পরেই ভোর হবে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি যখন এলেন এসপ্ল্যানেডের মোড়ে তখন ভোর হয়ে এসেছে।

কার্জন পার্কে এসে একটা বেঞ্চিতে তিনি বসলেন। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তিনি পায়ে ফিরতে উদ্যত হবেন, এমন সময় দূরে কি একটা বস্তুর দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো।

পার্কের মধ্যে একটা লোক শুয়ে আছে বলে তাঁর মনে হলো।

লোকটা কে?

তিনি এগিয়ে গেলেন সেদিকে। কিন্তু গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষুস্থির হবার উপক্রম।

দেখেন, পার্কের মধ্যে একটা লোক পড়ে আছে। তার ডান বাহুতে একটা আলপিন বেঁধানো। তার সঙ্গে আটকানো একটা কাগজ।

তিনি পড়তে লাগলেন।

কাগজটাতে লেখা ঃ

'ড্রাগনের প্রতিহিংসা'—দুই!

মিঃ সেন লোকটার গায়ে হাত দিলেন। গা ঠাণ্ডা। হাত-পা শক্ত অর্থাৎ রাইগার মর্টিস শুরু হয়ে গেছে অনেক আগেই।

মিঃ সেন তাড়াতাড়ি চলে গেলেন এসপ্ল্যানেডের মোড়ে। তখন সবে ভোর হয়েছে ছ'টা বাজে।

দোকানপাট সব বন্ধ। দু'একটা মেডিক্যাল স্টোর্স শুধু খোলা আছে।

তিনি একটা ডাক্তারখানায় ঢুকে নিজের পরিচয় দিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন।

দীপকের বাড়ির নম্বরে ডায়াল করলেন। একটু পরে রতনের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—হ্যালো।

—কে দীপকবাবু?

—না, আমি তার সহকারী রতনলাল। দীপক এখন ঘুমিয়ে আছে।

—বিশেষ দরকার, দেখুন তো তাঁকে ডেকে দিতে পারেন কিনা, আমি মিঃ সেন কথা বলছি।

—আচ্ছা, ধরুন।

একটু পরে দীপকের ঘুমজড়িত কণ্টস্বর শোনা গেল।

—হ্যালো. মিঃ সেন?

—হ্যাঁ দীপকবাবু, এক্ষুণি একবার এসপ্ল্যানেডের মোড়ে চলে আসুন।

—কেন বলুন তো?

—একটা ডেড্ বডি পাওয়া গেছে। ড্রাগনের কাজ বলে মনে হচ্ছে।

—সর্বনাশ। আচ্ছা, আমি আসছি।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখল।

একটু পরেই দীপকের গাড়ি ধুলো উড়িয়ে এসপ্ল্যানেডের মোড়ে ছুটে এলো। মিঃ সেন দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন—শীগ্‌গির আসুন আমার সঙ্গে ।

—লাশ কোথায়?

—পার্কের মধ্যে।

দু'জনে হেঁটে পার্কে এলেন। দীপক ভাল করে দেখল ডেড্‌বডিটা! দেখেই সে চমকে উঠল।

—কি হলো, একে চেনেন?

—নিশ্চয়, এ হলো বিখ্যাত গুণ্ডা-সর্দার, রামলাল । গত দু'তিন বছর হলো কোলকাতায় এর আবির্ভাব। এর মধ্যেই সারা কোলকাতা এর ভয়ে অস্থির।

—তা একে ড্রাগন হঠাৎ হত্যা করল কেন?

—তা তো জানি না।

দীপক লোকটার দেহ পরীক্ষা করল। দেহের কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্নমাত্র নেই।

দীপক মৃতদেহের মুখটা শুঁকে বললে—একেও ক্লোরোফর্ম করে তারপর পিন ফুটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কোনও জায়গা থেকে বোধ হয় এটা এনে এখানে ফেলে গেছে।

—তা তো দেখছি।—কিন্তু মাটি শুকনো—কোনও পায়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মোটরের চাকার দাগও দেখতে পাচ্ছি না।

দীপক হাসল।

বললেন—মিঃ সেন, ড্রাগনের দল এত কাঁচা কাজ করে না, জানবেন।

—তাই তো দেখছি! কিন্তু এভাবে পরপর মানুষ খুন করছে এরা কি উদ্দেশ্যে?

—তা তো আমারও অজ্ঞাত। যা হোক, স্থানীয় থানায় ব্যাপারটা জানিয়ে দিন। আর মৃতদেহ পোস্টমর্টেম করতে পাঠান।

মিঃ সেন চিন্তিতভাবে বললেন—কোলকাতা শহরের বুকে পা দিয়েই তো ড্রাগন রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল দেখতে পাচ্ছি!

—হ্যাঁ। এদের কাজই এমনি ধারার।

—কিন্তু এবার দেখছি উপরওয়ালাদের কাছ থেকে কৈফিয়ৎ তলব শুরু হবে। পরপর দুটো খুন, একই দলের দ্বারা—এ তো সাধারণ ঘটনা নয়।

—যা হোক, এদের উদ্দেশ্য না জানলে কোনমতেই তো এগোনো সম্ভব নয়। ভাল কথা—এই গুণ্ডা রামলাল কোথায় থাকত, তা আমাদের জানা দরকার। তা হলে কোন সূত্র মিলতে পারে।

মিঃ সেন বললেন—ঠিক আছে, সে চেষ্টা করছি। যত শীগ্‌গির সম্ভব রামলালের আস্তানার খবরটা যোগাড় করতেই হবে।

মিঃ সেনকে রীতিমত চিন্তিত দেখায়।

।। পাঁচ ।।

সায়ানাইড

পরদিন সকালবেলা।

সংবাদপত্রের বুকে বড় বড় হরফে খবর বের হয়েছিল ঃ

কোলকাতার বুকে ড্রাগনের আবির্ভাব।

পর পর দুইটি নরহত্যা।

পুলিশবাহিনী কোনও সন্ধান পায়নি।

তার নীচে ছোট ছোট বিস্তারিত খবর বের হয়েছিল।

ড্রাগন নামধারী লোকটি হঠাৎ কোত্থেকে এলো কোলকাতায়, তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনাও প্রকাশিত হয়েছিল। আর সবার শেষে ড্রাগনের পরবর্তী কর্মধারা বন্ধ করবার জন্য কোলকাতা পুলিশকে তৎপর হতে আবেদন করা হয়েছিল। তা না হলে জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ নয়।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলল দীপক। রতনের দিকে চেয়ে বললে, দেখছিস কাগজে বেশ বড় বড় কথা লিখছে। কিন্তু এরা জানে না, ড্রাগন কি বস্তু। সে সাধারণ একটা চিৎপুরের গুণ্ডা নয় যে, ঝট করে তাকে ধরা যাবে!

—তা তো বটেই। আসলে ড্রাগন যে কে, তা এরা কেউ জানে না।

—তাই মনে হয়।

—আর হঠাৎ যে কোন কোলকাতার বুকে ড্রাগনের আবির্ভাব হয়েছে, তাও কেউ কল্পনা করতে পারছে না;

দীপক একটু চিন্তা করল। তারপর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে ধীরকণ্ঠে বললে—আমার ধারণা যদি মিথ্যা না হয় তা হলে ড্রাগন নামধারী লোকটি যে আরও ভয়াবহ কাণ্ডকারখানা করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রতন কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার কথায় বাধা সৃষ্টি করলে টেলিফোনের আর্তনাদ।

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং।

রতন ফোন তুলল। বললে—হ্যালো, কে কথা বলছেন?

—মিঃ সেন বলছি, দীপকবাবুকে একটু দিন!

দীপক ফোন তুলল। বললে—হ্যালো, নতুন কোনও বিশেষ খবর আছে নিশ্চয়?

হ্যাঁ, আছে। যে দুটি লোক ড্রাগনের কবলে পড়ে মারা গেছে, তাদের দু'জনের শরীর পোস্টমর্টেম করে পটাসিয়াম সায়নাইড পাওয়া গেছে। দেহে যে পিন ফোটানো হয়েছিল, তাতেই ছিল ঐ তীব্র বিষ। অবশ্য তার আগে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করা হয়েছিল।

—আমিও এটা আন্দাজ করেছিলাম, মিঃ সেন!

—দ্বিতীয় খবর হলো, প্রথম যে-লোকটি আলমবাজারে খুন হয় তার ফটো লালবাজার রেকর্ড সেকশনে দেখিয়ে জানা গেছে যে, সে একজন পুরানো ক্রিমিন্যাল। তার কেস রেকর্ড ছিল বহুদিন আগে। সাত-আট বছর আগে। তারপর

থেকে তার আর কোনও পাত্তা পাওয়া যায়নি। তার নাম ছিল তখন স্বরূপচাঁদ।

—বুঝেছি! সে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে আলমবাজার অঞ্চলে বাস করত। কিন্তু হঠাৎ ড্রাগন তাকে খুন করল কেন? তা জানা যাচ্ছে না।

—সেটাই তো চিন্তার বিষয়।

তৃতীয় খবর হলো, গুণ্ডা রামলাল নামে যে লোকটির বডি এসপ্ল্যানেডে পাওয়া গেছে, তার ঠিকানা আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ বের করেছে। পুলিশ রেকর্ডে জানা গেছে যে, সে বিডন স্কোয়ারের উল্টো দিকে টেগোর ক্যাসন স্ট্রীটে দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করত।

—বর্তমানে সে কি কোনও অপরাধজনক কাজ করেছে?

—না। দীর্ঘ তিন-চার বছর ধরে তার কোনও কু-কাজের খবর পাওয়া যায়নি। এমন কি সে রীতিমত ভদ্র নাগরিকে পরিণত হয়েছিল। বললেন মিঃ সেন।

—আমিও তাই ভেবেছিলাম। তা হলে বোঝা যাচ্ছে, ড্রাগনের কাজ হচ্ছে পুরোনো ক্রিমিন্যালদের হত্যা করা। নিশ্চয় এর পেছনে কোনও গোপন ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

—তা থাকা স্বাভাবিক বটে।

—যা হোক, আমি এক্ষুণি লালবাজারে যাচ্ছি। রামলালের বাড়িটা একটু সার্চ করতে হবে—যদি কোনও প্রমাণ মেলে।

—আচ্ছা।

—দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখল।

লালবাজার থেকে পুলিশের জীপে করে দীপক, মিঃ সেন আর দু'জন কন্‌ষ্টেবল রওনা হলেন টেগোর ক্যাসল স্ট্রীটের দিকে।

নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছুতে অসুবিধে হলো—কারণ সরু গলির মধ্যে গাড়ি চলে না। মোড়ের মাথায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দীপকরা এগোলো গলির ভিতরে।

একটা পুরোনো জীর্ণ বাড়ির একতলায় দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত রামলাল। পাশে আরও দু'তিনজন ভাড়াটে।

রামলালের স্ত্রী, একটি পুত্র এবং কন্যাও ঐ বাড়িতেই থাকে। আর একটি কন্যার বিয়ে হয়ে গেছে—শ্বশুরবাড়িতে থাকে।

মিঃ সেনের আহ্বানে রামলালের স্ত্রী ঘোম্‌টা দিয়ে এগিয়ে এলো।

দীপক প্রশ্ন করল—আপনার স্বামী মারা গেছেন তা শুনেছেন কি?

হ্যাঁ। কাগজে পড়েছি সে খবর।

—তিনি কি বাড়ি থেকেই খুন হন?

—না। যেদিন তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায় তার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা, তিনি

কি একটা জরুরী কাজে বেরিয়ে যান। বলেন—রাত ন'টায় ফিরবেন।

—কি কাজে যান বলে যাননি?

—না। শুধু বাক্স থেকে কি একটা কাগজ বের করে, পকেটে পুরে নেন। আমি কাগজটা দেখেছিলাম—কি সব হিজিবিজি দাগ কাটা। তিনি বলেন যে, একজন পুরোনো বন্ধুকে তিনি এটা দিতে যাচ্ছেন। একটু পরেই ফিরবেন।

—তারপর?

—তারপর তিনি আর ফিরে আসেননি। তিনি এভাবে খুন হবেন জানলে কি তাঁকে যেতে দিই!

বলতে বলতে ভদ্রমহিলার চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

দীপক বলে—যদি কিছু মনে না করেন তাঁর ঘরখানা একটু দেখতে পারি কি? এতে তাঁর হত্যা-রহস্যের সমাধানের সুবিধে হবে।

—বেশ তো, দেখুন না—

দীপক, রামলাল যে ঘরে থাকত, সেই ঘরে প্রবেশ করে মিঃ সেনের সঙ্গে কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিস ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না।

অনেক খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একটা সুটকেসের ভেতর থেকে বের হয় একটা পোস্টকার্ড।

সেটা দেখে দীপক চমকে ওঠে।

পোস্টকার্ডের উপরে এক কোণে একটা ছোট্ট ড্রাগনের ছবির মনোগ্রাম ছাপানো।

তার নিচে লেখা—

প্রিয় রামলাল,

আশা করি কুশলে আছ। স্বরূপচাঁদের মৃত্যুর খবর নিশ্চয় খবরের কাগজে পাঠ করেছ।

তোমাদের জন্যই আমাকে আসতে হয়েছে এই সুন্দর কোলকাতা শহরে। তোমরা যে পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করেছ, তার জন্যে আমি ক্রুদ্ধ হলেও সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হয়েছি কাগজের টুকরোটা সময়মত তোমরা আমাকে দাওনি বলে।

যদি তোমার বাড়িতে আমার অভিযান না চাও, তা হলে কাল কোলকাতার চৌরঙ্গী রোডের মুখে সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটায় আমার সঙ্গে দেখা করে কাগজটা দেবে।

আর যদি না আসো, বা কাগজটা না দাও তা হলে ওটা তো আমি হস্তগত করবোই— সেই সঙ্গে সপরিবারে তুমি নিহত হবে। আশা করি তা তুমি চাও না। ইতি—ড্রাগন।

চিঠিটা পড়ে দীপক বললে—কিছু বুঝলেন?

মিঃ সেন বললেন—কি এত মূল্যবান কাগজ?

—তা জানি না। তবে নিশ্চয় তার মূল্য অর্থসম্পদের থেকে বেশি।

—তা বটে।

—আর রামলাল জানতেন যে, ড্রাগনের সঙ্গে দেখা হলে তার বিপদ হতে পারে। তবুও সে পরিবারকে বাঁচাতে বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়েও কাগজটা তাকে দিতে গিয়েছিল। আর ড্রাগন সেই সময়েই প্রতিহিংসা গ্রহণ করেছে।

—তাই তো মনে হচ্ছে।

দীপক একটু ভেবে বললে—আর একটা কথাও বোঝবার আছে। ড্রাগনের সঙ্গে এদের বহুদিনের সম্পর্ক ছিল।

—তা ছিল। তা না হলে রামলাল বলত না যে, পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

দীপক বললে—এর বেশি আর বর্তমানে কিছু জানা যাবে না। তাই চলুন এখন ফিরে যাওয়া যাক।

রামলালের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

।। ছয় ।।

মৃত্যুর আহ্বান

সেদিন বেলা দুটো বাজে।

দীপক খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করে উঠে বের হবে কিনা ভাবছে, এমন সময়ে ভজহরি এসে বললে—একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

—বয়স কত?

প্রায় পঞ্চাশ হবে, বেশ সম্ভ্রান্ত লোক। এই কার্ডটা পাঠিয়ে দিলেন।

দীপক দেখতে পেলে, কার্ডে নাম লেখা—

শ্রীহরি বিশ্বাস
উড্ মার্চেন্ট, ভবানীপুর।

দীপক একটু চিন্তা করল। হরিহর বিশ্বাস বলে সে কোনও লোককে চেনে না। দীপক ভদ্রলোককে ডেকে আনতে বললে। একটু পরে তিনি প্রবেশ করলেন। দোহারা চেহারা। মাথার সামনের দিকে টাক। পরনে দামী স্যুট। পায়ে দামী

জুতো।

দীপক বললে—আমি আপনার কোনও কাজে লাগতে পারি কি?

—হ্যাঁ। বিশেষ প্রয়োজনেই আমি দেখা করতে এসেছি স্যার।

—বলুন।

শুনলাম, আপনি নাকি দস্যু ড্রাগনের কেস তদন্ত করছেন। কথাটি কি সত্যি?

—আপনার সম্পূর্ণ পরিচয় না পেলে তো তা বলতে পারি না!

—আমি সেই উদ্দেশ্যেই এসেছি। দস্যু ড্রাগন কোলকাতায় এসে ইতিমধ্যে দুটি মার্ডার করেছে। আর আমার ধারণা সত্য হলে সে আরও দুটি মার্ডার করবে। তার একটি ভাবী শিকার হলাম আমি। আমি প্রাণরক্ষার তাগিদে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—আপনার মনে এ ধারণা হলো কেন?

—কারণ একটা চিঠি। এ চিঠিটা পেয়েই আমি এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

দেখি চিঠিটা।

দীপকের দিকে একটা কাগজ এগিয়ে দেন হরিহর বিশ্বাস। দীপক সেটা খুলে দেখে কাগজটির উপরে অবিকল রামলালের চিঠির মতোই একটা ড্রাগনের ছবি মনোগ্রাম করা। তার নিচে লেখা—

প্রিয় হরিহর,

আশা করি তুমি আমাকে ভুলে যাওনি। তোমার দুটি বন্ধু ইতিপূর্বে প্রাণ দিয়েছে। তোমাকেও প্রাণ দিতে হবে তোমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে।

তোমাদের চারজনের কাছে আড়াই লক্ষ টাকা জমা ছিল, তা তোমরা চারজনেই নিয়েছ—ভেবেছিলে আমি বোধ হয় সাগরগর্ভে প্রাণ দিয়েছি কিন্তু সেটা যে মিথ্যা তা তো বুঝেছ।

তোমাদের ঐ টাকা আত্মসাৎ করার জন্যে তোমাদের অংশ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তাই নক্সার দুটো টুকরো তোমার দু'বন্ধুর কাছ থেকে নিয়েছি। তোমার অংশটা তুমি অবিলম্বে আমাকে দেবে—তা না হ'লে শুধু নিজে মরবে না—সপরিবারে ধ্বংস হবে।

আশা করি, পত্রের গুরুত্ব বুঝতে পারবে। ইতি—

ড্রাগন।

চিঠিটা মন দিয়ে পড়লে দীপক।

তারপর বললে—কবে এটা পেয়েছেন?

—কাল।

—আপনার সঙ্গে ড্রাগনের আগে পরিচয় ছিল?

—ছিল।

—কোথায় আপনাদের পরিচয়?

—আসাম-বর্মা ফ্রন্টে।

—এই নক্সাটির রহস্য কিছু বলবেন কি?

—তা বলতে পারি। কিন্তু একটু গোপনীয়তা অবশ্য পালন করা উচিত।

—তা বটে। তবে এখানে আমি রতন আর আমার চাকর ছাড়া কেউ থাকে না। চাকর রান্নাঘরে, রতন বাইরে গেছে—কেউ নেই। আপনি নিশ্চিন্তে বলতে পারেন।

হরিহরবাবু বলতে শুরু করলেন ঃ

আমি যে দু'জন মারা গেছে তারা দু'জন আর আমাদের একালের বিখ্যাত ধনী রায়সাহেব ধরণীধর পালিত, আমরা চারজনে ছিলাম দস্যু ড্রাগনের দলের ক্যাশিয়ার। তার মধ্যে দু'জন আগে মারা গেছে, তারা ড্রাগনের দলে কাজ করত। তবে আমরা দু'জন তা করতাম না।

ড্রাগনের দল পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যে প্রচুর অর্থ ও হীরা-জহরত উপার্জন করত, তা বর্মা থেকে গোপন পথে আসামে চালান দিত।

বর্মা-আসাম সীমান্তের কাছে পার্বত্য অঞ্চলের একটি গোপন গুহায় এই সম্পদ সঞ্চিত করে রাখা হতো। এইভাবে যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হয়েছিল তার মূল্য প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ কোটি টাকার মত—একটা রাজার সম্পদ বলা যায়।

আমাদের দু'জনকে অর্থাৎ আমাকে ও ধরণীকে ড্রাগন বলেছিল যে, বর্মা থেকে সে কাজ শেষ করে পালিয়ে আসামে আসবে। তখন ঐ টাকা সে তুলে নেবে। আর আমাদের চারজনকে দেবে দু'লক্ষ টাকা হিসাবে এর পারিশ্রমিক বাবদ।

আমরা টাকার লোভে এই সম্পদ পাহারা দিতে রাজী হই। অবশ্য পাহারা দেবার কিছু ছিল না—কারণ, গোপন গুহা থেকে তা বের করা কারও পক্ষে সহজসাধ্য নয়।

এই পাহাড়ে এত গুহা ছিল যে, খুঁজে বের করা সহজ নয় বলে তার একটা নক্সা তৈরি হয়েছিল। এই নক্সাটি কিন্তু ড্রাগন বিশ্বাস করে একজনের কাছে রাখেনি। এটা চারটে সামনে টুকরো করে দিয়ে রেখেছিল আমাদের চারজনের কাছে। উদ্দেশ্য, কেউ একা এটা বের করতে পারবে না—আর চারজনে একসঙ্গে বেইমানী করাও সম্ভব নয়।

কোথায় সে সম্পদ লুকোনো আছে তা ড্রাগনও বোধ হয় জানে না। কারণ চারটি টুকরো একত্র করে জোড়া না দিলে তা মিলবে না কোনদিনই।

এদিকে ড্রাগন শেষবার আড়াই লক্ষ টাকা নগদ জমা রেখে যায় ধরণীবাবুর কাছে। তার দু'জন সঙ্গী স্বরূপচাঁদ আর রামলালকে নিয়ে সে বর্মায় ফিরে যায়। কিন্তু ঐ টাকাটা গুহাতে রাখা হয়নি।

কিছুদিন পর স্বরূপ আর রামলাল ফিরে এসে বলে যে, ড্রাগন পুলিশের তাড়া খেয়ে মোটর-বোটে করে পালাবার চেষ্টা করে। পুলিশ-লঞ্চ তাড়া করে, তখন সে মোটর-বোট থেকে জলে লাফ দিয়ে পড়ে। তখন একটা বিরাট কুমীর তাকে গিলতে আসে। ড্রাগনের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়। তারপর আর ড্রাগনকে দেখা যায়নি। সে বোধ হয় কুমীরের পেটে গেছে বলে পুলিশের ধারণা।

এদিকে পুলিশ সন্ধান পেয়ে ড্রাগনের সম্পদ উদ্ধারের জন্য আসাম-বর্মা সীমান্তে হানা দেয়। আমরা দু'জন তখন উপায় না দেখে, সে আড়াই লক্ষ টাকা ছিল, সমান চারভাগে ভাগ করে নিয়ে আসাম থেকে পালিয়ে আসি। ভেবেছিলাম, ঐ টাকা দিয়েই শেষ জীবনে আমরা প্রতিষ্ঠিত হবো। আর আসামের পাহাড়ে যে অর্থ-সম্পদ তা আজও তেমনি আছে। কোন দিন উদ্ধার হবে কিনা তা কেউ জানে না।

এখানে এসে চার-পাঁচ বছর নিরাপদে কেটে গেল। ব্যবসা-বাণিজ্য করে ভালই দিন কাটছিল। পূর্বের সব কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

এমন সময় হঠাৎ একদিন শুনলাম স্বরূপচাঁদ মারা গেছে ড্রাগনের হাতে। ড্রাগন কোলকাতায় এসেছে দীর্ঘদিন পরে। এতদিন সে কোথায় ছিল, এভাবে কিভাবে বাঁচল, তা আমরা জানি না কিছুই।

বুঝতে পারলাম কুমীরের কবলে পড়ে তার মৃত্যু হয়নি।

এবার দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড হলো—রামলাল মারা গেল, তাও জানলাম। এখন আমাকেও চিঠি দিয়েছে—জানি না, আমি বাঁচব কিনা। তারপর নিশ্চয় আসবে ধরণীধর পালিতের পালা। দু'টুকরো নক্সা সে পেয়ে গেছে। এখন বাকী দু'টুকরো সংগ্রহ করে আমাদের দু'জনকে হত্যা করে সে বোধ হয় ফিরে যাবে আসামের ঐ গুপ্ত-সম্পদ উদ্ধার করতে।

—তা বটে। তা হলে ড্রাগনের চক্রান্তের কিছুটা আঁচ পেলাম এতক্ষণে।

—এখন আমার কি করা উচিত বলুন তো?

—বলছি।

এই বলে দীপক কোনও কথা না বলে টেবিলের ড্রয়ার খুলে পিস্তল বের করল।

তারপর আচমকা ছুটে গেল জানালার দিকে। জানালার কাছে একটা লোককে ঘোরঘুরি করতে দেখে সন্দিগ্ধ হয়েছিল সে।

দীপক জানালার কাছে যাবার আগেই লোকটা চলে গেল অনেক দূরে পিস্তলের রেঞ্জের বাইরে।

তারপর একটা অপেক্ষামান গাড়িতে উঠতেই, গাড়িটা ছুটে চলে গেল দ্রুতগতিতে।

দীপক ফিরে এসে বসল চেয়ারে।

হরিহর বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে দীপক বললে—তা হলে বুঝতে পারছেন যে, আপনার পেছনে তাদের লোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে?

—তা তো বুঝতেই পারছি।

—শুধু তাই নয়। আপনি যে এখানে এসেছেন, তাও ওরা জানে। আপনাকে অনুসরণ করে আপনার সঙ্গে এসেছে। একটি মুহূর্তের জন্যও আপনি নিরাপদ নন।

—কিন্তু ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠার শক্তি কি কোলকাতা শহরে কারও নেই?

—দেখুন, সাধ্যমত চেষ্টা আমরা নিশ্চয় করব। তবে আপনি সাবধানে থাকবেন। সাবধানে বাড়ি যাবেন। আপনার বাড়িতে পুলিশ প্রহরা রাখার ব্যবস্থা করছি। লালবাজারে মিঃ সেনকে আমি ফোনে জানিয়ে দেবো সব কথা, তা হলেই তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন।

হরিহর বিশ্বাস নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল। সে বাইরে এসে মোড়ের মাথা থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

।। সাত ।।

গোপন সভা

কোলকাতা শহরের চীনেপাড়া একটি কুখ্যাত অঞ্চল সন্দেহ নেই।

চিরদিন এই অঞ্চলে গুণ্ডা-বদমাশের বেশ উপদ্রব আছে। পুলিশের কালো খাতায় এই অঞ্চলটার নাম লেখা আছে।

তবু এই অঞ্চলেই যে কি ভয়াবহ রক্তাক্তের বিষাক্ত বাষ্প ফেনিয়ে উঠতে পারে, তা কেউ কল্পনা করতে পারে না।

বউবাজার স্ট্রিট থেকে বাঁদিকে রাস্তা। সেই পথ থেকে একটা গলিপথ পেঁচিয়ে ঘুরে, বেঁকে, পাক খেয়ে একটা অপরিসর প্রায়ান্ধকার বাড়িতে এসে শেষ হয়েছে।

বাড়িটি দোতলা। তার দোতলার একটি ছোট্ট নিচু ঘরে জ্বলছিল টিম্‌টিমে একটা ইলেট্রিক বাল্‌ব।

ঘরের কোণে আট-দশ জন লোক বসে নিজেদের মধ্যে জটলা করছিল। তাদের ভাষা বিভিন্ন—জাতিতে তারা বিভিন্ন। কেউ চীনে, কেউ হিন্দুস্থানী, কেউ বাঙালী। তবে তারা যে একই উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিল, তা তাদের মুখের ভাব দেখে বোঝা যায়।

ঘরের কোণে ঝুলছিল একটা পর্দা। সেটার রঙ্ ঘন হল্‌দে। তার উপরে বিরাট লাল রঙের ড্রাগনের ছবি আঁকা।

এমন সময় হঠাৎ ঘরের কোণে আর একটা লাল আলো দু'বার জ্বলে উঠে সবার মুখে ফিস্ ফিস্ করে ধ্বনিত হলো একটা কথা, কর্তা এসে গেছেন। সবাই চুপ করল।

একটু পরেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল একজন দীর্ঘকায় লোক। পরনে দামী স্যুট, চোখে গগল্‌স্—সেই মোটা গগল্‌সের কাচ দিয়ে তার চেহারা সঠিক চেনা যায় না।

লোকটি প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলে উঠে দাঁড়াল। অবশ্য তাদের এভাবে উঠে দাঁড়াতে কেউ বলেনি। তারা নিজেদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাভরে আপনার থেকেই উঠে দাঁড়ায়।

—বসো। ধীর কণ্ঠে লোকটি বলে।

সকলে বসে পড়ে।

লোকটি গম্ভীর কণ্ঠে বলে—তিন নম্বর, তোমার কি খবর?

তিন নম্বর হলো সামসুল নামে একজন গুণ্ডা। সে উঠে দাঁড়াল।

ধীর কণ্ঠে বলল—হুজুর, আপনার নির্দেশ মত সেদিন ফলো করেছিলাম ঐ হরিহর বিশ্বাসকে। সে গাড়ি করে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। আমি তাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ঐ গোয়েন্দাটার চোখ শিকারী কুকুরের মত। আচমকা পেছন থেকে আমাকে তাড়া করল। আমি তখন পালাতে পথ পাই না। তারপর থেকে দু'দিন লোকটার বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা করেছি—কিন্তু তার বাড়ির সামনে পুলিশ প্রহরা মোতায়েন করা হয়েছে। তাই বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারিনি।

ধীর কণ্ঠে ড্রাগন বলে—দীপক চ্যাটার্জী গোয়েন্দার নাম শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। বর্মাতেও সে দু-একবার গেছে বলে মনে হয়।

—হ্যাঁ কর্তা, তা গেছে। লোকটা সাংঘাতিক।

—কিন্তু সে হঠাৎ এ ব্যাপারে এলো কেন?

—বোধ হয় পুলিশ থেকে তার হাতে কেস দেওয়া হয়েছে।

ড্রাগন গম্ভীর ভাবে কি যেন চিন্তা করল। তারপর বললে—লোকটা যদি

বেশি বাড়াবাড়ি করে, তবে খতম করতে হবে।

—কিন্তু লোকটার যেন পাথরের প্রাণ। কিছুতেই ওকে যে মারা যায় না।

—কেউ তা না পারলেও ড্রাগনের কাছে তা অসম্ভব হবে না জেনে রেখো। যাক, কি কি ভাবে পরবর্তী কাজগুলো করতে হবে তা, আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি—মন দিয়ে শোন।

ড্রাগন তারপর যে-সব কথা বলে চলল, শুনলে যে-কোন সাধারণ লোক ভয়ে আঁতকে উঠত, কিন্তু লোকগুলো নির্বিকারচিত্তে সে সব কথা শুনতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর আবার দপ্ দপ্ করে দু'বার আলো জ্বলে উঠল।

দলপতি ধীর পায়ে চলে গেল ঘর ছেড়ে।

উপস্থিত লোকেরা সবাই চুপচাপ বসে রইল। তারপর একটু পরে সবাই একে একে ঘর থেকে প্রস্থান করল। প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভাবে চলে গেল নিজ নিজ গন্তব্য পথে, যেন কেউ কাউকে চেনে না।

লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে বসে কথা হচ্ছিল, দীপকের সঙ্গে মিঃ সেনের।

দীপক আগাগোড়া সব ঘটনা মিঃ সেনকে খুলে বললে। মিঃ সেন বললেন—এতক্ষণে বোঝা গেল ড্রাগনের কোলকাতার বুকে চলা-ফেরার রহস্য।

—সেইজন্যেই তো হরিহরবাবুর বাড়িতে পুলিশ প্রহরা বসাবার জন্যে আপনাকে বলেছিলাম।

—তা ঠিক। কিন্তু ধরণীবাবু তা হলে ড্রাগনের সম্ভাব্য চতুর্থ শিকার? তাঁর বাড়ির সামনেও পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা উচিত।

—তাঁর বাড়ি বাগবাজারে। ঠিকানাটা আমি জেনে নিয়েছি হরিহরবাবুকে ফোন করে। তাঁকে সব কথা বলে এ ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

—আর একটা কথা। ওদের বিষয়ে কোনও খবর বার্তা জোগাড় করার উপায় কি?

—একমাত্র উপায় হলো, ড্রাগনের দলের কোনও লোকের সন্ধান করা। কিন্তু তেমন কোনও সন্ধান এখনও পাইনি। আমি অবশ্য আজ থেকে কোলকাতা শহরের কুখ্যাত কয়েকটি অঞ্চলে ছদ্মবেশে হানা দেব ভেবেছি। তা হলে এদের খবর পেতে অসুবিধা হবে না।

—তা বটে।

দীপক আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বেজে উঠল ফোন।

ফোন করছিল রতন। সে বলে—দীপক, তুই শীগগির বাড়ি চলে আয়। ড্রাগনের একটা চিঠি এসেছে।

দীপক একটু ভেবে বললে—তুই বরং চিঠিটা নিয়ে গাড়িতে করে চলে আয় এখানে।

একটু পরেই রতন গাড়ি চালিয়ে এসে উপস্থিত হলো লালবাজারে। দীপকের হাতে চিঠিটা দিল।

খামের চিঠি। খামের উপরে ডাকঘরের কোণে সীলমোহর আঁকা নেই।

দীপক বললে—এ চিঠিটা তো ডাকে আসেনি!

রতন বললে—না। মনে হয় কেউ এটা লেটার-বাক্সে ফেলে গেছে।

দীপক চিঠিটা পড়তে লাগল। উপরে যথারীতি ড্রাগনের চিত্র মনোগ্রাম করা। নিচে লেখা ঃ—

প্রিয় দীপক চ্যাটার্জী,

শুনেছি তুমি ভারতের একজন খ্যাতনামা গোয়েন্দা—গোয়েন্দাশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তুমি আমাকে চেনো না—আমি সারা বিশ্বের দস্যুশ্রেষ্ঠ ড্রাগন।

তাই বাধ্য হয়ে তোমাকে এ চিঠি লিখছি যে—তুমি কোনদিন আমার পেছনে লাগতে এসো না। তার ফলে তোমার মৃত্যু অবধারিত হবে জেনো।

ইতি— ড্রাগন।

চিঠিটা দু'বার পড়ল দীপক।

রতনের দিকে চেয়ে বলল—এটা আর কিছুই নয়—যেন পূর্বতন বড় বড় দস্যুদের মতই অহমিকায় পূর্ণ।

রতন বললে—তা বটে, তবে ড্রাগন খুব সহজ লোক বলে মনে হয় না।

।। আট।।

নাইট ক্লাব

সেদিন সন্ধ্যা।

দীপককে দেখা গেল কোলকাতা শহরের বিভিন্ন গোপন আড্ডায় খোঁজ খবর নিতে।

দীপক জানত যে, ড্রাগনকে সেখানে ধরতে না পারলেও তার নানা খোঁজ-খবর ঠিকই পাওয়া যাবে। অন্তত তার কোনও না কোনও অনুচরের খবর ঠিকই মিলবে মনে হয়।

দীপক তাই বিভিন্ন বার, নাইট ক্লাব ইত্যাদি জায়গায় হানা দিয়ে ফিরছিল কিন্তু

সর্বত্র সে ব্যর্থ হলো। পাওয়া গেল না কোনও খোঁজ।

অবশেষে সে হানা দিল পার্ক স্ট্রীটের একটা বার ও হোটেল-এ।

দীপক জানত, এখানে যারা রাত্রিবেলা নিয়মিত আসে, তাদের শতকরা নব্বই ভাগই নানা ধরনের ক্রিমিন্যাল।

তাই খুব নিশ্চিন্ত মন নিয়ে সে সেখানে প্রবেশ করল—হয়তো কাউকে পাবে, যার কাছ থেকে ড্রাগনের হদিশ মিলবে।

দীপক অর্ডার দিল দামী খাবার ও সেই সঙ্গে নানা ধরনের দামী মদ।

খেতে শুরু করল সে। দেখতে দেখতে তার টেবিল ঘিরে অনেক লোক জমে উঠল।

দীপক ছদ্মবেশে এসেছিল। তাই সে জানত যে, তাকে কেউ চিনতে পারবে না। দীপক তাদের মদ অফার করল। ফলে তার টেবিলে ভিড় জমল—যেমন মৌচাককে ঘিরে মৌমাছিরা ভিড় করে।

দীপক মদ ও খাবার খেতে লাগল।

একটু পরেই সে দেখল, কোণের টেবিলে বসে আছে সামাদ খাঁ নামে একজন নামকরা গুণ্ডাসর্দার। সারমাদ খাঁ যে কোলকাতা শহরের গুণ্ডাদের গেজেট, তা জানত দীপক।

নানা গুণ্ডার বিষয়ে সে খবর রাখে।

দীপক একজন বয়কে ডেকে বললে—কোণের ঐ ভদ্রলোককে ডেকে আন। সারমাদ খাঁ এগিয়ে এলো।

তার পরনে দামী স্যুট, পায়ে দামী স্যু ও মুখে দাড়ি।

দীপক বললে—এক ঢোঁক খান। সারমাদ খেলো।

দীপক বলল—কিছু গোপন কথা ছিল আপনার সঙ্গে। আপনাকে একটু বাইরে যেতে হবে।

সারমাদ খাঁ দীপকের সঙ্গে বাইরে এলো।

দীপক বললে—আমাকে কি তুমি চিনতে পেরেছে, সারমাদ? আমি দীপক চ্যাটার্জী।

—এ্যাঁ। হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সারমাদ খাঁ!

দীপক—ভয় নেই, আমি মোটা পুরস্কারের ব্যবস্থা করব। ড্রাগন নামধারী যে দস্যুর আগমন ঘটেছে কোলকাতায়, আমি তার বিষয়ে জানতে চাই।

—ড্রাগন?

হ্যাঁ, নিশ্চয় তুমি তার নাম শুনেছো?

—শুনেছি। তার দলের একজনকে চিনিও। সে আমাদের আড্ডায় জুয়া খেলে। তার নাম সামসুল।

—এদের প্রধান আড্ডা কোথায় জান?

—জানি। রাজেন বাই লেনে। চীনেপাড়া অঞ্চলে বাড়িটা।

—ঠিক আছে।

দীপক ঠিকানাটা লিখে নেয়। তারপর দু'খানা দশ টাকার নোট গুঁজে দেয় তার হাতে।

সারমাদ খাঁ বলে—স্যার, বড় কম হলো।

—ঠিক আছে আরও ত্রিশ টাকা তুমি পাবে—দেখা করো আমার বাড়িতে।

—আচ্ছা স্যার।

দীপক বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

।। নয়।।

নৈশ অভিযান

ঢং—ঢং—

দূরের পেটা ঘড়ি জানিয়ে দিল রাত দশটা বাজে।

ঠিক এমন সময়ে একটা লোককে দেখা গেল বৌবাজার স্ট্রীট থেকে একটা গলিতে প্রবেশ করতে। লেন থেকে বাই লেন।

আরও সরু গলিতে প্রবেশ করল লোকটা। ভাল করে দেখে নিল রাস্তার নামটা।

লোকটার দেহে ভারী ওভারকোট। মাথার টুপিটা নামানো।

রাজেন বাই লেনের কোণে গিয়ে লোকটা চুপ করে দাঁড়াল। সে যে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী, তা বোঝাই যায় না।

সব বাড়ির আলো নিভানো। কেবল একটা বাড়িতে আলো জ্বলছে। দীপক চিন্তিত হলো। এতো রাতে আলো জ্বলছে।

দীপক ভাবল, নিশ্চয় ঐ বাড়িতে কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে।

সাড়ে দশটা বেজে গেল—এগারোটা। তখন দেখা গেল ঐ বাড়ি থেকে সাত-আট জন লোক বেরিয়ে এলো পথে। তারপর তারা চলল নিজ নিজ গন্তব্য পথে। দীপক চিন্তা করল।

এরা কারা? সে একটা গ্যাসপোষ্টের আড়ালে আত্মগোপন করল।

লোকগুলো পাশ কাটিয়ে চলে গেল ধীর পায়ে। দীপক তখন দাঁড়িয়ে। সবাই চলে গেলে দীপক বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল।

সব আলো নিভে গেছে। বাড়িটা ভেতর থেকে বন্ধ। দেখা গেল জীর্ণ অন্ধকার

বাড়ি।

দীপক দেখল, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। সে বাইরে থেকে কয়েকটা যন্ত্রের সাহায্যে একটু চেষ্টা করতেই দরজার ছিটকিনিটা খুলে গেল।

ভেতরে প্রবেশ করল সে।

সারা বাড়ি অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দীপক বুঝল সাত-আটজন লোক তখনই চলে গেছে, আর বাড়িতে বিশেষ কেউ নেই।

ভেতরের দিকে এগোল দীপক।

হঠাৎ একটা লোক তার সামনে এসে পড়ল। অচেনা লোক তার পিছনে আর একজন।

দীপক তৈরি ছিল।

সে আচমকা পিস্তলের বাট দিয়ে একজনকে আঘাত করেই দ্বিতীয় জনের দিকে এগিয়ে গেল!

দ্বিতীয় লোকটা ছোরা বের করার আগেই দীপক তার তলপেটে মারল লাথি। লোকটা ছিটকে পড়ল।

দীপক তাকেও অজ্ঞান করে ফেলল। তারপর বেঁধে ফেলল দু'জনকে।

সে তখন এগিয়ে চলল ভিতরের দিকে। দেখতে হবে এ বাড়িতে কি আছে?

দোতলায় ঢুকলো দীপক। দেখল একটা বন্ধ ঘর। সেটা খুলে দেখল একটা পর্দা। তবে উপরে ড্রাগনের মূর্তি আঁকা। ঘরটা খালি।

দীপক কোন্ দিকে যাবে ভাবছে—এমন সময় পেছন থেকে ধ্বনিত হলো—হ্যাণ্ডস্ আপ, মিঃ চ্যাটার্জী।

—কে তুমি?

—আমি ড্রাগনের দলপতি যার খোঁজে আপনার এই নৈশ অভিযান। কিন্তু জেনে রাখবেন আমি নরহত্যা করতেও পেছপা নই। আমি হরিহর বিশ্বাস ও ধরণীকে যেমন ভাবেই হোক হত্যা করব—তেমনি হত্যা করতে পারি আপনাকেও।

তা জানি। তোমার মনে দয়ামায়া কিছু নেই।

—না, কিন্তু সাবধান দীপকবাবু, আপনি একটু নড়লেই আমার হাতের পিস্তলের গুলি আপনার দেহে বিদ্ধ হবে।

মৃদু হাসল দীপক।

।। দশ।।

ড্রাগনের পলায়ন

দীপকের ভাবভঙ্গী দেখে কিন্তু বোঝা গেল না সে বিন্দুমাত্র ভয় পেয়েছে।

ড্রাগন বললে—এ বাড়িতে আমার নিজের অন্তত দশজন লোক সব সময় মজুত থাকে আর আমার চোখ-কান সর্বদা খোলা থাকে বুঝলেন দীপকবাবু?

হ্যাঁ! কিন্তু তোমাকে আমি ভয় করি না।

লোকটি দীপকের কাছে এগিয়ে এসে বলল—ঠিক আছে, আপাতত বন্দী থাকুন।

দীপকের বাঁ হাতের তালুতে লাগান ছিল ছোট্ট একটা স্পঞ্জের মত বস্তু, হাতের আংটি ছিল ফাঁপা—আর তার সঙ্গে লাগানো স্প্রীং। হাতের স্পঞ্জে সে চাপ দিতেই হঠাৎ একটা তীব্র আলাক লোকটার মুখে গিয়ে লাগল। সে কিছু বোঝার আগেই তার হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ল।

লোকটা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

দীপক ভাবল, আর এগোনো নিরাপদ নয়। সে তাই নিচে এলা লালবাজারে জরুরী ফোন করে দিতে মিঃ সেনের কাছে।

একটু পরে পুলিশ ভ্যান এসে গেল। দীপক পিস্তল হাতে পাহারা দিচ্ছিল বাড়ির সামনে এতক্ষণ ধরে, যাতে ড্রাগন পালাতে না পারে।

পুলিশ ভ্যান এলে দীপক এগিয়ে গেল, মিঃ সেন তাকে দেখে খুশী হলেন। বললেন—কি ব্যাপার?

—ব্যাপার খুব ভাল। বিখ্যাত ড্রাগন এখন একাই এই বাড়িতে আছে। এখনও বোধ হয় তার মূর্ছা ভাঙেনি।

—ভেতরে চলুন।

—কিন্তু সাবধান। ড্রাগন ছাড়াও আরও দলবল দু-পাঁচজন নিশ্চয়ই আছে।

—তা থাকা স্বাভাবিক।

—তাই হঠাৎ ভেতরে যাবেন না—বিপদে পড়তে পারেন। সাবধানে এগোবেন।

—বুঝেছি।

পিস্তল উদ্যত করে এগিয়ে চলল দীপক, মিঃ সেন ও পুলিশবাহিনী।

কয়েক মিনিট।

ভেতরে প্রবেশ করে সামনেই যে দু'জন লোক অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তাদের

গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

তারপর উঠে গেল দোতলায়। কিন্তু সেখানে তারা কাউকেই দেখল না।

রতন বললে—হয়তো বাড়ির পেছন দিকেও কোন গুপ্তপথ আছে।

—তা থাকা অসম্ভব নয়। সেই পথেই বোধ হয় পালিয়ে গেছে দস্যু ড্রাগন। দস্যু ড্রাগন বা তার দলের বাকী লোকদের পাওয়া গেল না। অবশেষে দোতলার একটা ঘরের দেওয়ালে পাওয়া গেল একটা গোপন পথ। দীপক বললে—এই পথেই বোধহয় পালিয়ে গেছে ড্রাগন।

—ঠিক তাই। মিঃ সেন বললেন।

সেই সুড়ঙ্গ পথের সামনেই ভাঁজ করা একটা কাগজ পড়ে থাকতে দেখা গেল তাতে লেখা ঃ

প্রিয় দীপক চ্যাটার্জী,

এত সত্বর যে তোমার মুখোমুখি এসে পড়ব তা কল্পনাও করিনি। তাই আমি ঠিক তৈরি ছিলাম না। এই সুযোগে তুমি খুব বড় ফাঁদে আমাকে ফেলেছিলে। ভেবেছিলে আমাকে ধরবে।

কিন্তু সহজে আমাকে ধরা যায় না। আমি আজ পালিয়ে যাচ্ছি বটে, তবে আশা রাখি শীগগিরই আবার মুখোমুখি মিলিত হবো আমরা, দেখা যাবে সে দ্বৈরথ সমরে কে জেতে কে হারে।

হরিহর বিশ্বাস আর ধরণীধর যে আমার হাত থেকে রেহাই পাবে তা ভেবো না।

তবে, কবে কখন কিভাবে যে তাদের উপরে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব তা জানতেও পারবে না তোমরা। ইতি—ড্রাগন।

চিঠিটা পড়ে মিঃ সেন বললেন—ড্রাগনের চিঠিটা দেখে বোঝা যাচ্ছে এত সহজে সে ভারত ছেড়ে যাচ্ছে না।

অবশেষে বন্দী দু'জনকে নিয়ে পুলিশভ্যান চলল লালবাজারের দিকে।

রক্তলোলুপ ড্রাগন

।। এক ।।

প্রথম চ্যালেঞ্জ

সেদিন সকালবেলা।

দীপক আর রতন চা ও খাবার খেয়ে খবরের কাগজের পাতা উলটে চলছিল আর কোথায় কোন্ অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে তার অনুসন্ধান করছিল। এমন সময় চাকর ভজহরি সেদিনের ডাকে আসা চিঠিগুলো এনে দীপকের টেবিলে রাখল।

দীপক প্রতিটি চিঠির উপরে চোখ বুলিয়ে সেগুলো রেখে দিচ্ছিল।

হঠাৎ একটা চিঠির উপর থেকে সে চোখ সরিয়ে নিতে পারল না।

রতনকে ডেকে বললে—এই দেখ রতন, দীর্ঘ দুটি মাস পরে আবার আমাদের বন্ধু ড্রাগন আমাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চিঠি লিখেছে।

—তাই নাকি? দেখি!

—দাঁড়া, আমি আগে পড়ে নিই।

দীপক চিঠিটা পড়তে লাগল। তাতে লেখা

প্রিয় ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জী,

সুদীর্ঘ দুই মাস পরে তোমাকে চিঠি লিখে আমি আবার আগামী সংগ্রামের জন্যে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি।

তুমি গতবার হরিহর বিশ্বাস ও ধরণী ধরের কাছ থেকে নক্সার টুকরো দুটো নিয়ে লালবাজারে জমা করে দিয়েছ, তা জানতে পেরেছি। এতে বিরাট ক্ষতি হয়েছে আমার। কারণ, আমার গুপ্তধন উদ্ধারের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।

তারপর তুমি নিশ্চয় আশা করতে পার যে, আমার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেবার জন্যে তোমাকে ক্ষমা করব না।

সত্যিই তাই। তোমাকে ক্ষমা করব না—তোমার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র দয়া নেই।

শুধু তাই নয়—আমি তোমাকে তীব্রভাবে ঘৃণা করি। অদূর ভবিষ্যতে এই ধরাপৃষ্ঠ থেকে তোমাকে চিরদিনের মত সরাতে না পারলে আমার মন তৃপ্ত হবে না কিছুতেই।

তবে তার আগে আমাকে অনেকগুলো কাজ করতে হবে। প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতে হবে। যে কাজে আমি হাত দিয়েছি তুমি যদি তাতে বাধা দিতে আস,

তোমার শেষ নিঃশ্বাস বাতাসকে ভারী করে তুলবে।

এর বেশি লেখা নিষ্প্রয়োজন। ইতি—

ড্রাগন।

চিঠিটা দীপক পড়ে তুলে দিল রতনের হাতে। রতন সেটা পড়ে বললে—তাহলে ড্রাগন কিছুতেই ভুলতে পারছে না তার প্রতিহিংসা।

—কি করে পারবে? তাই ড্রাগনের যতটা ক্ষমতা আছে তা সে নিশ্চয়ই প্রয়োগ করবে ঐ গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য।

—তা ত করবেই।

—আরও একটা কথা। ড্রাগন এত সহজ পাত্র নয় যে, চট্ করে সে কাজকর্ম বন্ধ করে ভারত ছেড়ে চলে যাবে।

—তা ঠিক। মিঃ সেনকে কি এই ঘটনা জানাবি?

—প্রয়োজন নেই।

—কেন?

—যখন তেমন অবস্থা আসবে তখন ঠিকই তিনি জানতে পারবেন।

—তা ত বটেই।

দীপক আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় কলিং বেলটা বেজে উঠল।

একটু পরে ভজহরি প্রবেশ করল, তারপর বললে—বাবু, আপনার সঙ্গে একটি মেয়ে দেখা করতে এসেছে।

—বয়স কত?

—বাইশ-তেইশ হবে। বেশ সুন্দরী। মনে হয়, মেয়েটি খুব চিন্তিত।

দীপক হাসল।

বললে—ভজহরিও দেখছি আজকাল লোকের চোখ-মুখ দেখে সে চিন্তিত কিনা তা বুঝতে পারে। যা হোক, মেয়েটিকে নিয়ে এসো।

ভজহরি বেরিয়ে গেল।

একটু পরে যে মেয়েটি প্রবেশ করল তাকে দীপক চেনে।

তার এক বন্ধুর বোন, নমিতা, বেথুন কলেজে বি. এ. পড়ে।

—এসো নমিতা। দীপক বললে।

—নমস্কার! বিশেষ কারণে দেখা করতে এলাম আপনার সঙ্গে।

দীপক হেসে বললে—বিশেষ কারণ ছাড়া পারতপক্ষে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে না নমিতা।

—তাই নাকি?

সত্যিই তাই। বিপদে পড়ে যত লোক দেখা করতে আসে, তার শত ভাগের

এক ভাগও বিনা কারণে আসে না।

—তা বটে।

নমিতা সোফার উপরে বসে পড়ল। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তাকে বেশ খানিকটা বিষণ্ণ বলে মনে হচ্ছিল।

দীপক বললে—নমিতা, এবার বলো, কি ব্যাপারে তুমি আমার সাহায্য চাও?

—ব্যাপারটা ঠিক আমার নয়—আমার এক বন্ধুর! নমিতা একটু আস্তে বললে।

—হুঁ! কি হয়েছে তার?

নমিতা একটু ইতস্ততঃ করে আঁচল দিয়ে মুখটা মুছল। তারপর বললে—ব্যাপারটা ঘটেছে আমার এক সহপাঠিনীকে নিয়ে।

—সেও কি বি. এ. পড়ে?

—হ্যাঁ। মেয়েটি বাঙালী নয়। তার নাম মণিকা শর্মা।

—ওদের দেশ কোথায়?

—ওরা ইউ. পি.-এর লোক—মণিকার বাবা হলেন হীরালাল শর্মা। তিনিও এলাহাবাদের একজন নামকরা জুয়েলার।

—বুঝেছি। তা ব্যাপারটা একটু খুলে বলো এবার। কোনও গোপনীয়তার হেতু নেই, কারণ রতনের কাছে আমার কিছু গোপন নেই।

—তাই বুঝি? নমিতা বলে চলল—হীরালাল শর্মা অর্থাৎ মণিকার বাবা এলাহাবাদেই থাকেন। এখানকার ব্যবসা দেখাশোনা করেন। মণিকা ছেলেবেলা থেকেই এখানে অর্থাৎ কলকাতায় তার মাসীর বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করছে। একেবারে বাঙালী হয়ে গেছে বলা যেতে পারে। আমরা দুজনেই বর্তমানে বেথুনে বি. এ. পড়ছি তা ত জানেন। মণিকা হঠাৎ খুব মুশকিলে পড়ে গেছে। তাই এলাম আপনার কাছে।

—কি মুশকিল বল?

—মুশকিল হলো, মণিকা। ব্যারিস্টার ত্রিদিব চৌধুরীর ছেলে অজিতের প্রেমে পড়েছে। তারা বিয়ে করতে চায়—কারণ প্রেম গভীরতা লাভ করছে। মণিকা বাবার অনুমতি চেয়ে এলাহাবাদে চিঠি লিখেছিল। উত্তরে তার বাবা জানান যে, তিনি কোলকাতায় এসে ব্যারিস্টার ত্রিদিববাবুর সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলবেন। অবশ্য দুজনই ব্রাহ্মণ—তাই অসুবিধা হবে না।

—এসব ত নেহাৎ পারিবারিক ব্যাপার। এতে আমি কি করতে পারি?

—শেষটুকু শুনলেই বুঝতে পারবেন। মিঃ শর্মা গত পরশুদিন এসে কোলকাতার বেলভিউ হোটেলে উঠেছেন। গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ তাঁর মণিকার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি তা করেন নি। মণিকা খুবই চিন্তায় পড়ে যায়। সে আর তার মামা বেলভিউ হোটেলে গিয়ে মিঃ শর্মার খোঁজ করে।

হোটেলের ম্যানেজার জানায় যে, তিনি একবার মাত্র হোটেলে এসেছিলেন—পরে বেরিয়ে যান, আর ফিরে আসেননি।

—তার মানে—নো ট্রেস?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। এই খবর শুনে মণিকা খুব নার্ভাস হয়ে পড়ে। সে আমার কাছে ছুটে এসেছিল এ বিষয়ে পরামর্শের জন্যে। আমার দাদাও সব কথা শুনেছেন! তিনি বললেন আপনার পরামর্শ নিতে। বললেন যে, আপনি ছাড়া কেউ এটা সল্‌ভ্‌ করতে পারবে না।

দীপক হেসে বললে—তুমি বিমলের ছোট বোন। তাই তোমার অনুরোধ ত এড়াবার উপায় নেই।

—আমি মণিকাকে খুব ভালোবাসি। স্কুল থেকে কলেজ অবধি একই সঙ্গে পড়েছি, খুবই ভালবাসা আমাদের।

—ঠিক আছে বোন, তোমার বন্ধুর কেস আমি গ্রহণ করলাম।

—ধন্যবাদ।

একটা সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানিয়ে নমিতা বিদায় নিল।

নমিতা বেরিয়ে গেলে দীপক রতনের দিকে চেয়ে বলল—চল্‌ রতন, একটু বেরুনো যাক্‌।

—কোথায়?

প্রথমে বেলভিউ হোটেলে যাব। কয়েকটা কথা জেনে নিয়ে যাব লালবাজারে।

—আমাকেও যেতে হবে?

—কেন, তুই কি ড্রাগন নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিস নাকি?

রতন হেসে বলল—তা বটে।

দীপক হাসতে হাসতে বললে—বলতে পারি না, এর মধ্যে থেকেও হয়তো ড্রাগন বেরিয়ে পড়তে পারে।

কিন্তু দীপক জানত না, পরিহাসচ্ছলে সে যে কথাটা বললে, তা একদিন তার জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিতে পারে।

।। দুই।।

একজোড়া দস্তানা

মিডলটন ষ্ট্রীটের পূর্বদিকে ফুটপাথে আধুনিক ধরনের তৈরী বিরাট একটা পাঁচতলা বাড়ি। বাড়িটার ঠিক প্রবেশদ্বারে সোনালী হরফে লেখা ছিল 'বেলভিউ হোটেল—ফুডিং এ্যাণ্ড লজিং এভেলেব্‌ল হিয়ার।'

দীপক গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল হোটেলের দিকে।

কাচের স্যুইং ডোরটা ডান হাতে খুলে ধরে নেপালী দারোয়ান দীপকদের অভিবাদন জানাল।

প্যাসেজটা লাল রঙের দামী কার্পেটে মোড়া। প্যাসেজের পর হলঘর। সেখানে রিসেপশন কাউন্টারে বসে একজন ক্লার্ক—তার পাশে একটি যুবতী।

ক্লার্কটির পরনে স্যুট, চোখে চশমা, বয়সে তাকে তরুণ বলা চলে। বাইশ-তেইশ বছর বয়স তার।

আর উগ্র এনামেল করা অ্যাংলো যুবতীটির বয়স হবে পঁচিশ-ছাব্বিশ, তবে মেক-আপের জন্য বয়সটা কম দেখায়।

দু'জনে দীপকের দিকে তাকাল উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে।

—ইওর নেম প্লীজ।

যুবকটি ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করে। অ্যাংলো মেয়েটা শুধু তাকিয়ে থাকে বোবা দৃষ্টি মেলে, কোনও কথা বলে না সে।

দীপক কার্ডটা এগিয়ে দেয়; কার্ডের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে যুবকটি কাউন্টারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে পাশের একটা কোণে 'ম্যানেজার' লেখা কাচের দরজার ওপাশে চলে যায়।

মিনিট পাঁচেক কেটে গেল।

রতন দেখছিল হোটেলটা রীতিমত দামী। ডেইলি অন্ততঃ ত্রিশ-চল্লিশ টাকা চার্জ এ হোটেলে।

যুবকটি কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে বললে—ইউ মে গো ইনসাইড্।

সে আবার কাউন্টারে গিয়ে বসল। অ্যাংলো মেয়েটি রুমালে মুখ মুছল।

দীপকরা কাচের দরজা ঠেলে গিয়ে ঢুকলো সোজা ম্যানেজারের ঘরে।

প্রৌঢ়, বুদ্ধিমান, সৌম্য চেহারার ম্যানেজার—মিঃ হাজারী। তিনি হাসিমুখে ওদের অভ্যর্থনা করে বললেন—মিঃ চ্যাটার্জী, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

—আমি আপনার হোটেলের একজন বোর্ডার হীরালাল শর্মার বিষয়ে কিছু জানতে চাই।

—আপনি এ ব্যাপারে মাথা দিয়েছেন শুনে আমি খুশী হলাম মিঃ চ্যাটার্জী। মিঃ শর্মার ব্যাপারটা আগাগোড়া অস্বাভাবিক। আমি পুলিশের সাহায্য নেবার কথা ভাবছিলাম।

—ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বলে ভাবার কারণ কি মিঃ হাজারী?

—মিঃ শর্মার মতো একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক নিজের জিনিসপত্র ছাড়া এই কলকাতা শহরে তিনদিন কিভাবে থাকবেন? তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতেও তিনি যাননি বলে জানি। এক্ষেত্রে গোটা ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ছাড়া আর কি বলা

যেতে পারে?।

—হুঁ। দীপক একটু চিন্তা করল।

তারপর বলল—মিঃ শর্মা হোটেলে কতক্ষণ ছিলেন?

—ছিলেন আর কই?

—তার মনে?

—মানে, খুলে বলছি। সোমবার দিন ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় মিঃ শর্মা হোটেলে এসে একটা রুম ভাড়া নেন। কুলীর মাধ্যমে মালপত্র সব নিজের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক হোটেল থেকে বেরিয়ে যান। এর পরে হোটেলের কেউ আর তাঁকে দেখেনি।

—কেউ কি তার বিষয়ে কোনও খোঁজ-খবর নিয়েছিল, মিঃ হাজারী?

—কয়েকদিন আগে বেলা প্রায় আড়াইটায় বৌবাজার স্ট্রীটের বিখ্যাত জুয়েলারী দোকান 'মেনোলা' থেকে মিঃ শর্মার ফোন এসেছিল। রিসেপশন ক্লার্ক জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, মিঃ শর্মা বেরিয়ে গেছেন, তিনি ফিরে এলে ফোন করতে বলা হবে। তারপর খোঁজ করতে আসেন তাঁর মেয়ে ও এক আত্মীয়।

দীপক দ্রুত চিন্তা করতে থাকে।

—মিঃ হাজারী, মিঃ শর্মার ঘরটা আমি একবার ভাল করে দেখতে চাই। কোনও অসুবিধা হবে না ত আপনার?

—বেশ ত, চলুন। মিঃ হাজারী উঠে পড়লেন।

দু' মিনিট পরে ওরা দোতলায় মিঃ শর্মার ঘরটিতে গিয়ে উপস্থিত হলো।

একটা বেশ বড় ঘর—সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড্ বাথরুম। বেশ সাজানো-গোছানো।

ঘরের মধ্যে কোনও লোকের কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

নিভাঁজ খাটের শয্যা, বাক্স বেডিং কিছুই খোলা হয়নি।

বাথরুমের র‍্যাকে টয়লেট, তেল, সাবান ইত্যাদি সব নতুন আছে, কেউ ব্যবহার করেনি।

দীপক দেখল ট্রাঙ্ক, সুটকেশ দুটোই একেবারে নতুন। বেডিংও ঠিক তাই। বোঝা যায় ঘরে একজন লোক এসেছিল মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে।

দীপক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুটকেশ ট্রাঙ্কটার দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

বোঝা গেল, সে গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছে। সে এগিয়ে গিয়ে নকল চাবির সাহায্যে সুটকেশটা খুলে ফেলল।

ভেতরে কয়েকটা নতুন ভাঁজ করা জাম-কাপড়। ট্রাঙ্কে পাওয়া গেল কয়েকখানা খবরের কাগজ আর কয়েকটা বেড-কভার, পিলো-কভার ইত্যাদি নানা ব্যবহার্য জিনিস।

মিনিট দশেক সেগুলি পরীক্ষা করে দীপক সব বন্ধ করে রাখল।

দীপক বললে—মিঃ হাজারী, কোণের ঐ ময়লা-ফেলা ঝুড়িটা কি হোটেলের সম্পত্তি?

—হ্যাঁ।

দীপক এগিয়ে গেল। খুব ভাল করে সেটা পরীক্ষা করে বললে—আচ্ছা মিঃ হাজারী, নতুন বোর্ডার আসার আগে কি ময়লা-ফেলা ঝুড়িটা পরিষ্কার করা হয়েছিল?

—নিশ্চয়।

—তাহলে বর্তমানে ঝুড়ির মধ্যে ঐ যে একজোড়া সুতির গ্লাভস্ (দস্তানা) দেখছি, ওটা কি মিঃ শর্মাই ফেলে রেখে গেছেন?

—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

—আপনি ওটা আগে দেখেছিলেন?

—হ্যাঁ। সেদিন উনি আসেন খুব ভোরে। প্রচণ্ড শীত চলছে তখন জানেন ত! উনি গ্লাভস্ জোড়া হাতে দিয়েই এসেছিলেন। আমি ভেবেছিলাম যে যাঁর পোশাক এত দামী তাঁর গ্লাভস্ বা দস্তানা জোড়া এত কম দামী কেন?

—তা হোক, তবু এটা দেখার জিনিস।

বলে দীপক সাবধানে সে দুটো তুলে নিয়ে বিছানায় রেখে দেখতে লাগল ভাল করে।

—কি বুঝছেন দীপকবাবু?

—ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক। তাই নয় কি? ময়লা পোশাক বলতে ভদ্রলোক কেবলমাত্র একজোড়া দস্তানাই ফেলে গেলেন। প্রায় পাঁচশো মাইল ট্রেন জার্নি করে এসে ক্লান্ত হয়ে সকলেই আগে পথের জামা-কাপড় ছেড়ে ভালভাবে স্নান করে পরিষ্কার হয়—তাই নয় কি মিঃ হাজারী?

—তা ত বটেই।

—তা ইনি সেসব কিছুই করলেন না। কেবল জিনিসপত্র ও দস্তানা দুটো রেখে উধাও হয়ে গেলেন।

রতন বললে—হয়ত ভদ্রলোক অগোছালো ধরনের।

—মোটেই না। তিনি সঙ্গে বেশ সৌখিন জামা-কাপড়, প্রসাধন দ্রব্যাদি এনেছেন। তাই তিনি যে কেন হঠাৎ ওভাবে বেরিয়ে গেলেন তা সাধারণ বলে মেনে নিতে পারছি না।

—তা বটে।

—তাছাড়া দস্তানা দুটো আবার দেখ রতন!

খুব ময়লা।

—শুধু তাই নয়—খুব সস্তা জিনিস। মিঃ শর্মার মত সৌখিন লোকের হাতে এটা বড্ড বেমানান, নয় কি?

মিঃ হাজারী প্রশ্ন করলেন—আপনার কি সন্দেহজনক কিছু মনে হচ্ছে? যাতে কোনও অপরাধমূলক কিছু—

নিশ্চয়ই তেমন কিছু আছে। দীপক ধীর কণ্ঠে বললে—থাক সে কথা। আমি দেখছি কি করতে পারি। আপনার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ মিঃ হাজারী!

দীপক হোটেল থেকে বিদায় নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসল।

।। তিন ।।

হীরা রহস্য ও দীনদয়াল

ঘণ্টাখানেক পরে।

লালবাজারে মিঃ সেনের ঘরে বসে কথা বলছিল দীপক ও রতন।

নমিতা ও মণিকাকে ডেকে পাঠিয়েছিল দীপক ফোনে। একটু পরে দু'জনেকে ঢুকতে দেখা গেল।

নমিতা বললে—কি ব্যাপার দীপকদা, হঠাৎ জরুরী আহ্বান?

দীপক বললে—তোমাদের বিশেষ দরকার বলেই ফোন করতে বাধ্য হয়েছি।

—বলুন।

দীপক বললে—মণিকা দেবী, আপনার বাবার চেহারার একটা বর্ণনা দিতে পারেন?

—নিশ্চয়ই। বাবার বয়স এখন চলছে উনষাট বছর। উচ্চতা হবে প্রায় ছ' ফুট মত। মাথায় চুল কাঁচা-পাকা। গোলগাল গড়ন। রঙ বেশ ফর্সা। তিনি বেশ সৌখিন। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করে কামাতে ও ফিটফাট থাকতে ভালবাসেন।

দীপক একটা কাগজে কথাগুলো লিখে নিল দ্রুত হাতে। তারপর বললে—আরও কয়েকটা কথা জানতে চাই মণিকা দেবী।

—বলুন।

—আচ্ছা মিস্ শর্মা, আপনার বাবা অবসর বিনোদন করেন কিভাবে?

—বাবা বেশিরভাগ বিভিন্ন জুয়েলারী ফার্মে ঘোরেন। আর যেটুকু সময় পান তিনি সেতার বাজান।

—এখন বাজান?

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে বাজান। আমার ভয় হচ্ছে—বাবার কোনও বিপদ হয়েছে মনে হয়।

—মিস্ শর্মা, একটা কথা--

—বলুন!

—আপনি এরকম সন্দেহ করছেন কেন বলুন ত?

—কারণ, বাবা কোলকাতায় যখনই আসেন সবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করেন। এবারে তিনি তা করেননি।

—মণিকা দেবী, তিনি কি প্রতিবার এই রকমই করেন?

—হ্যাঁ।

দীপক চিন্তা করে।

তারপর একটু থেমে বলে—আচ্ছা মণিকা দেবী, আপনার বাবা কি শীতকালে দস্তানা ব্যবহার করেন?

—না, কখনো করেন না। যত শীতই হোক না কেন।

—আপনি ঠিক বলছেন ত?

—নিশ্চয়ই! ডেফিনেটলি!

—বুঝেছি।

—আমার বাবার বিষয়ে আমার চেয়ে ভাল নিশ্চয় কেউ জানে না।

—তা বটে।

একটু থেমে দীপক বললে—মণিকা দেবী, আমি কথা দিচ্ছি যে আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টা অর্থাৎ দু'দিনের মধ্যে ঠিক তাঁর বিষয়ে সব জানাব।

—একটা কথা।

—বলুন!

—তিনি সুস্থ আছেন ত? মানে বেঁচে আছেন?

—মনে হয়।

—আপনাকে ধন্যবাদ।

অসীম কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠে মণিকার চোখে।

নমিতা বললে—তাহলে এবারে আমরা চলি দীপকদা?

—আচ্ছা।

দু'জনে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ধীর পায়ে।

দীপক এবার তাকায় মিঃ সেনের দিকে। বলে—মিঃ সেন, আমি যা বলেছি সব ঠিক মনে আছে ত আপনার?

—নিশ্চয়।

—আচ্ছা 'মেনোলা' জুয়েলারী কোম্পানীতে কাকে পাঠিয়েছেন আপনি?

—চৌধুরীকে। নতুন ছেলে—কিন্তু কাজে খুব এক্সপার্ট জানবেন।

—বুঝেছি।

কয়েক মিনিট কাটল। দরজায় শোনা গেল ভারী পায়ের শব্দ।

—মে আই কাম ইন স্যার?

—কে, চৌধুরী? হ্যাঁ ভেতরে এসো।

ঘরে প্রবেশ করল বছর ত্রিশ বয়সের একজন যুবক। মাথার চুল কোঁকড়ান। কালো, দোহারা চেহারা।

—চৌধুরী, খবর কি বল?

চৌধুরী একটা চেয়ারে বসে পড়ল। বললে—আপনার কথামতো আমি গিয়েছিলাম স্যার।

—'মেনোলা'তে?

—হ্যাঁ।

—তারপর?

—ওখানকার মালিক মিঃ সেনগুপ্ত নামে একজন ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে দেখা করে মিঃ শর্মার বিষয়ে আমি জানতে চাইলাম। ঐ লোকটা মহা ফন্দিবাজ স্যার। চট্ করে কোনও কথা ফাঁস করে না। আমিও স্যার ছাড়বার পাত্র নই।

—কিছু জেনেছ?

—নিশ্চয়। তার কাছ থেকে আসার সময় আমি জেনেছি যে মিঃ শর্মা এলাহাবাদ থেকে আসার সময় কয়েকটা দামী হীরা সঙ্গে এনেছিলেন।

—দামী হীরা!

—হ্যাঁ, মোট সাতটা। তার দাম হবে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা। ঐ হীরাগুলো 'মেলোনা'তে বিক্রি করার কথা ছিল। এগুলোর দামের শতকরা কুড়ি ভাগ মিঃ শর্মা অ্যাড্‌ভান্স নিয়েছিলেন। তাই হীরাগুলো পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে তারা হোটেলে ফোন করেছিল।

দীপক ও মিঃ সেন দুজনে দুজনের দিকে তাকাল।

দুজনের চোখে চোখে কথা হলো।

—আর কিছু খবর আছে? মিঃ সেন বললেন।

—না স্যার।

—তবে তুমি যেতে পার।

চৌধুরী বেরিয়ে গেল ধীর পায়ে।

—একটা কথা মিঃ সেন।

—বলুন?

—মণিকার দেওয়া তার বাবার বর্ণনার সাথে একটা কথা যোগ করে দিন। তাঁর বাঁ হাতটা কাটা।

—আহা মিঃ শর্মার তো বাঁ হাত কাটা ছিল না।

—তা জানি।

—তবে?

—আমি বলছি যার কথা, সে মিঃ শর্মা নয়।

—আপনি কি বলতে চান দীপকবাবু?

—খবরটা রেকর্ড সেকশনে পাঠান, তারপর আমি যাব?

—ঠিক আছে।

মিঃ সেন টেবিল থেকে ফোনটা তুলে নিয়ে তৎক্ষণাৎ রেকর্ড সেকশনে খবরটা জানিয়ে দিলেন।

সব বর্ণনা দিয়ে বাঁ হাত কাটা তাও বললেন! তারপর বললেন—এই রকম কোনও পুরোনো ক্রিমিন্যাল আছে কিনা জানতে চাই।

—ও. কে. স্যার!

—ফোন নামিয়ে রাখলেন মিঃ সেন।

দীপক বললে—এবার শুনুন। আমার মতে যে লোকটা হোটেলে গিয়েছিল সে মোটেই হীরলাল শর্মা নয়।

—তবে?

—সে অন্যলোক। তার পরিচয়টা কি, পাওয়া যাবে রেকর্ড সেকশন থেকে।

কয়েকটা মিনিট কাটল।

তারপর ফোন বেজে উঠল।

মিঃ সেন ফোন তুলে বললেন—হ্যালো, কে?

ওপাশ থেকে ভেসে এলো ঃ স্যার রেকর্ড সেকশন থেকে বলছি। শুনুন।

—ও. কে.।

—আপনার বর্ণনা মতো লোকটিকে খুঁজে পেয়েছি। পুরনো কেস। কেস নম্বর ৪৬১৭। তার নাম হলো দীনদয়াল সিং। জহরৎ চোর বলে তার কুখ্যাতি আছে সারা ভারতে। বার দুই জেলও হয়েছে।

—তার ঠিকানা জানেন।

—হ্যাঁ। বর্তমানে সে ১৬৮ নং উইলিয়ামস্ লেন, পার্ক সার্কাসে থাকে। ঐ বাড়িতে দাসু শেঠ আর রামনাথ বলে দুজন সন্দেহ ভাজন গুণ্ডাও থাকে। মনে হয় সব এক দলের।

—ঠিক আছে। বাড়িটা কি ফ্ল্যাট বাড়ি?

—না, একটা ছোট হোটেল। ভাতের হোটেল—থাকার ঘরও দু' চারটে আছে।

—আর কিছু জানেন?

—না।

—ঠিক আছে।

ফোন নামিয়ে রাখেন মিঃ সেন।

দীপক বললে—মিঃ সেন, এক্ষুনি চলুন। বি রেডি, বেশি দেরি হলে জীবন সংশয়।

—সেকি! কেন?

কারণ দেরি হলে হয়ত ওরা মিঃ হীরালাল শর্মাকে খুন করবে।

—খুন! সর্বনাশ!

মিঃ সেন তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে যাত্রা করলেন নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

।। এক ।।

ড্রাগনের ছায়া

উইলিয়ামস্ লেন হলো পার্ক সার্কাস অঞ্চলের একটা ঘিঞ্জি রাস্তা।

নির্দিষ্ট বাড়িটা খুঁজে পেতে দেরি হলো না—একটা জীর্ণ ধরনের দোতলা বাড়ি সেটা।

দরজার উপরে ঝুলছে এক ময়লা রঙ্-উঠে-যাওয়া সাইনবোর্ড

শান্তি হোটেল

সস্তায় আহার ও বাসস্থান পাওয়া যায়

পুলিশ ভ্যানটা দীপক ও রতনকে নিয়ে সোজা এসে দাঁড়াল বাড়িটার সামনে।

ভ্যান থেকে নেমে পড়ল ওরা—দীপক, রতন, মিঃ সেন প্রভৃতি সকলে।

এরা তিনজন, দুজন কনস্টেবল ও দুজন সার্জেন্টসহ নির্দিষ্ট বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজার কড়া নাড়ল ওরা। একজন মাঝবয়েসী স্ত্রীলোক দরজা খুলে দিল।

পুলিশ বাহিনী দেখেই মেয়েটা চিৎকার করে উঠে সরে দাঁড়াল।

সে আবার চিৎকার করার জন্য মুখ খোলার চেষ্টা করছিল....

কিন্তু চিৎকার করা হলো না।

তার আগেই একজন বলিষ্ঠ কনস্টেবল এসে তার মুখ চেপে ধরল। তারপর

তাকে সরিয়ে নিলো দরজা থেকে।

ওরা ভেতরে গেল সকলে।

সামনেই একটা পর্দাঢাকা ঘর।

দীপক পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল।

সঙ্গে সঙ্গে রতন, মিঃ সেন প্রভৃতিও প্রবেশ করল।

দেখা গেল একটা তক্তাপোষের উপর বসে আছে মোট চারজন লোক। ওদের দেখে তারা উঠে পালাবার চেষ্টা করল।

সার্জেন্টদের তৎপরতায় তারা পালাতে পারল না—সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে গেল।

ওদের মধ্যেই একজন হলো দীনদয়াল। তার চেহারার সঙ্গে হীরালাল শর্মার চেহারার বেশ মিল দেখা গেল। তবে পার্থক্য শুধু এই যে, তার একটা হাত কাটা।

সে চুপচাপ বসেই রইল।

দীপক বুঝতে পারল যে, জেলঘুঘু দীনদয়াল পুলিশকে ভয় পায় না।

ঘরের এক কোণে দেখা গেল আর একটা তক্তাপোষ পাতা।

তাতে শুয়ে ছিলেন মাঝবয়েসী একজন ভদ্রলোক। তার হাত ও পা বাঁধা।

দীপক বললে—ঐ বাঁধা লোকটিই হলো। আমাদের হীরালালবাবু।

দীনদয়ালের সঙ্গে ভদ্রলোকের চেহারার বেশ মিল—কেবল একটি জিনিস ছাড়া। তা হলো দীনদয়ালের বাঁ হাতের কনুই থেকে কাটা—কিন্তু ভদ্রলোকের দুটি হাতই আছে।

দীপক এগিয়ে গেল।

ভদ্রলোকের বাঁধন খুলে দিল। তারপর দীনদয়ালের হাতে হাতকড়া পরানো হয়ে গেল।

রতন বললে—একজন ডাক্তার ডাকুন।

তক্ষুনি ডাক্তার ডাকা হলো। তিনি এসে একটা ইন্‌জেকশন দিতেই হীরালালবাবুর জ্ঞান ফিরে এলো।

দীপক বললে—দীনদয়াল, তুমি ত সাধারণ বুদ্ধিতে একাজ করনি। কে তোমাকে একাজ করতে বুদ্ধি ও অর্থ দিয়েছে?

—তার নাম বলতে বাধ্য নই।

—তবে দাওয়াই দেওয়া দরকার।

—না না, বলছি—তার নাম আপনাদের কাছে হলো ড্রাগন।

দীপক বললে—আমিও তাই ভাবছিলাম। একটা উপযুক্ত মাথা পেছনে না

থাকলে নিশ্চয়ই এত বড় কাজ করতে পারত না দীনদয়াল। এ কাজে যে লোক ব্রেন ও টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে তার ও-দুটোই আছে।

মিঃ সেন বললেন—কিন্তু ড্রাগন হঠাৎ এসব কাজ শুরু করল কেন?

দীপক বললে—এটা স্বাভাবিক। ড্রাগনের এখন টাকার প্রয়োজন। তাই সে নানা ধরনের অপরাধীদের হাত করে সেই পথে এগোতে চায়।

মিঃ সেন বললেন—তবে ত খুবই ভয়ের ব্যাপার সন্দেহ নেই!

দীপক বললে—হয়তো আরও কত ব্যাপার এর পর ঘটতে পারে।

—কেন?

—কারণ ড্রাগন এখন এদেশের সব বড় বড় অপরাধীদের নিয়ে কাজ করতে থাকবে।

—তা বটে।

মিঃ সেনকে বেশ চিন্তিত মনে হলো।

।। পাঁচ।।

বিশ্লেষণ

মিঃ শর্মাকে তাঁর মেয়ের তত্ত্বাবধানে রেখে দীপক, রতন প্রভৃতি আবার ফিরে এলো লালবাজারে।

মিঃ সেন বললেন—কি ব্যাপার সব আগাগোড়া বলুন ত?

দীপক বললে—সব বলছি। আগে ত কিছু খাবার আনান, ক্ষিদে পেয়েছে।

খাবার এলো।

খেতে খেতে দীপক বললে—প্রথম থেকেই সব ব্যাপারের মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা আমি লক্ষ্য করি মিঃ সেন। আমার তা থেকে মনে হয় যে, আসল মিঃ শর্মা হোটেলে আসেননি আদৌ।

—তা মনে হলো কেন?

—হোটেলে আমি দেখলাম সব জিনিস বেশ ভাল ও শৌখিন। কিন্তু দস্তানা জোড়া পুরোনো ও তা কম দামী। আর একটা জিনিস, দুটো দস্তানাই ছিল ডান হাতের।

—সে কি!

—হ্যাঁ। তাই ভাবলাম যে, নিশ্চয় যে লোক ঐ হোটেলে এসেছিল মিঃ শর্মার নাম নিয়ে তার বাঁ হাত নেই। বোধহয় কাটা বাঁ হাতটা জামা সমেত সে পকেটে

রেখেছিল বলে ম্যানেজারও তা খেয়াল করে দেখেনি।

—তা সম্ভব।

তারপর মণিকা দেবী বললেন যে, তাঁর বাবা ভাল সেতার বাজান। সেতার যে বাজায় তার দুটি হাতই থাকবে। তাই নয় কি? তাই যে ব্যক্তি ডান হাতের দুটি দস্তানা নিয়ে এসেছিলো হোটেলে সে নিশ্চয় অন্য লোক।

—আচ্ছা, আপনি তাহলে ঐ ভাবেই বর্ণনা দেন দীনদয়ালের?

—ঠিক তাই। কেবল বাঁ হাতটা কাটা, এটা জুড়ে দিলাম।

—বুঝেছি।

—আসল কথা—হীরাগুলো চুরি করার জন্যেই ওরা এই প্ল্যান করেছিল। কিন্তু সেগুলো ত পাওয়া গেল না ঐ আড্ডায়। কারণ ড্রাগন তা নিয়ে আগেই উধাও হয়েছে। আর দীনদয়ালের দল পেয়েছে মাত্র হাজার পাঁচেক টাকা।

—কিভাবে ওরা হীরালালবাবুকে লোপাট করল মনে করেন?

—সেটা উনি সুস্থ হলেই জানা যাবে। আমার যা অনুমান তা বলছি শুনুন। বোধহয় দীনদয়ালের দুজন সহকারী ছিল মিঃ শর্মার সহযাত্রী। এটা ওরা প্ল্যান করে করেছিল। তারপর ট্রেনে খাবার বা পানীয়ের সঙ্গে কিছু খাইয়ে হীরালালবাবুকে অজ্ঞান করে ফেলে। হাওড়ায় নেমে তাঁকে নিয়ে যায় পার্ক সার্কাসে নিজেদের আড্ডায়। টাকা দিয়ে সাহায্য করে ওদের ড্রাগন।

—তারপর?

—পরে দীনদয়াল একটা ট্যাক্সি করে মিঃ শর্মার মালপত্র নিয়ে যায় বেলিভিউ হোটেলে। সেগুলো রেখে সেই সঙ্গে দস্তানা দুটিও ফেলে যায়। হয়ত তা ভুল করেই ফেলে যায়। সুটকেশ থেকে হীরাগুলো সব আগেই সরিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু তুচ্ছ ঐ দস্তানা যে কি বিরাট সূত্রের কাজ করবে তা ওরা ভাবতে পারেনি। পারলে এমন ভুল করত না। এই ভুল হত না—যদি ড্রাগন নিজে একাজ করত। বলে হাসল দীপক।

মিঃ সেন বললেন—ভবিষ্যতেও কিন্তু আবার হয়ত এক নূতনরূপে দেখা দেবে ড্রাগন।

দীপক বললে—ড্রাগনকে না ধরলে হীরাগুলো উদ্ধারের আর কোনও পথ নেই। আমার মনে হয়, অপহৃত হীরাগুলোর দাম মোট তিন চার লক্ষ টাকা। এগুলো যেমন করেই হোক উদ্ধার না করলে মিঃ শর্মার জীবন আতষ্ঠ হয়ে উঠবে। ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তিনি।

মিঃ সেন বললেন—ঠিক বলেছেন, এখন ড্রাগনকে ধরাই আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য। ড্রাগন ধরা না পড়লে সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি ফিরে আসতে পারে

না কিছুতেই।

দীপক বললে—রাইট ইউ আর!

মিঃ সেনকে চিন্তিত দেখায়।

।। ছয় ।।

ভয়াবহ ডাকাতি

দিন দুই পরের কথা।

সেদিন সকালের কাগজখানা খুলে দীপক চম্‌কে উঠল। তাতে যা খবর বের হয়েছিল তা যেমন বিচিত্র তেমনি রহস্যপূর্ণ। তাতে লেখা ছিল ঃ

আবার দস্যু ড্রাগন!

বাগবাজারে ধরণীবাবুর বাড়িতে ডাকাতি!

প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা ও গহণা সহ প্রস্থান!

ধরণীধরের ভাই ডাকাতদের হাতে নিহত!

তার নিচে ছোট ছোট অক্ষরে যা ছাপা হয়েছিল তা পড়তে লাগল দীপক।

তাতে লেখা ছিল ঃ অনেকদিন হলো দস্যু ড্রাগনের কোন খোঁজখবর জানতাম না আমরা। জনসাধারণ মনে করেছিল যে দস্যুটি বোধহয় কোলকাতা শহর থেকে বিদায় নিয়ে গেছে চিরদিনের মতো।

কিন্তু ধারণাটা যে ভুল তা প্রমাণিত হলো। বাগবাজারে ধরণীবাবুর বাড়িতে কাল রাত প্রায় একটার সময় চারজন দস্যু প্রবেশ করে।

কিভাবে যে তারা দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল তা জানা যায়নি!

ধরণীবাবু বাড়িতে ছিলেন না। তিনি জমি পরিদর্শন করতে গেছেন মুর্শিদাবাদে। দস্যুরা ধরণীধরবাবুর ভাইকে সিন্দুকের চাবি দিতে বলে। তিনি তা না দিলে একজন তাঁর মাথায় আঘাত করে। তিনি জ্ঞান হারান। দস্যুরা চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে নগদ ও গহণা সহ প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার মাল নিয়ে প্রস্থান করেছে।

ধরণীধরণবাবুর ভাই আহত হয়েছিলেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর জ্ঞান আর ফিরে আসেনি।

ঘরের মধ্যে ড্রাগন চিহ্নিত একটি কার্ড পাওয়া গেছে—তাই মনে হয়, এটা ড্রাগনের কীর্তি।

জোর পুলিশী তদন্ত চলছে—তবে এ পর্যন্ত কাউকে ধরা যায়নি।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে দীপক বললে—এ খবরটা তুই কি পড়েছিস্

রতন?

—পড়েছি।

—তোর কি মনে হয়?

—মনে হয়, ধরণীধরকে হত্যা করতেই গিয়েছিল ওরা। তাকে না পেয়ে ডাকাতি করে টাকাকড়ি নিয়ে গেছে।

—আমারও তাই মনে হয়। ব্যাপারটা যে রীতিমতো জটিল তাতে সন্দেহ নেই।

—কিন্তু গতবারে ত দেখেছি ড্রাগন নিজে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়নি। সে গোপনে অন্য দলের সাহায্যে কাজ করে চলেছে। তা এবারেও কি তাই হয়েছিল, না ড্রাগন নিজেই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল?

—তা জানা যাচ্ছে না।

দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল। এমন সময় হঠাৎ ঘন ঘন টেলিফোন বেজে উঠল।

ফোন তুলল দীপক।

—হ্যালো, কে?

—আমি মিঃ সেন কথা বলছি লালবাজার থেকে।

—নমস্কার! আমি আপনাকে ফোন করব ভাবছিলাম, এমন সময় আপনার ফোন পেলাম।

—হ্যাঁ। দস্যু ড্রাগনের খবর বের হয়েছে আজকের সংবাদপত্রে। দেখেছেন ত?

—দেখেছি। তাই আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলব ভাবছিলাম। কোনও সূত্র পেয়েছেন কি?

—না, তবে একটা চিঠি পেয়েছি?

—চিঠি?

—হ্যাঁ। আজই এসেছে। সেই একঘেয়ে দম্ভ আর অহংকারপূর্ণ চিঠি। চিঠিটা পড়ছি—আপনি শুনুন।

মিঃ সেন চিঠিটা পড়ে তাকে শোনাতে লাগলেন। দীপক শুনতে লাগল। প্রিয় মিঃ সেন,

মিঃ শর্মার বহুমূল্য হীরাগুলো নিয়ে গা ঢেকে থাকার পর আবার আমি আবির্ভূত হলাম স্বরূপে। যদি ক্ষমতা থাকে পুলিশ বিভাগের বা গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জির, তাহলে আমাকে বাধা দেবেন।

আপনাদের পুলিশ বিভাগের সব দর্পচূর্ণ করবার জন্য আমি গতকাল রাত্রে

ধরণীধরের বাড়ি থেকে মোটা টাকা আত্মসাৎ করেছি। মিঃ শর্মার হীরাগুলোও আপনারা উদ্ধার করতে পারবেন না। দীপক চ্যাটার্জিকে জানাবেন—তার দিন শেষ হয়ে এসেছে। মৃত্যু সন্নিকট।

ইতি—

ড্রাগন

চিঠিটা শুনল দীপক। তারপর বললে—এ ত সেই একঘেয়ে ভয় দেখানো চিঠি। তবে ড্রাগনের এ দম্ভ বেশি দিন থাকবে না। কারণ ড্রাগন নিজেকে যত বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করবে ততই আমাদের সুবিধা। বেশি দর্পই মানুষকে অন্ধ করে দেয়। ফলে তার পতন ঘটে।

—তা বটে। বললেন মিঃ সেন—আপনি কি কোনও উপায়ে ড্রাগনকে ধরার চেষ্টা করেছেন?

—তা করেছি। তবে এবারে সে আগের চেয়ে অনেক সাবধান হয়ে গেছে।

—তা ত হবেই।

দীপক আর কোনও কথা বললো না।

মিঃ সেন নমস্কার জানিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

।। সাত ।।

ভয়ঙ্কর জালিয়াতি

দিন সাতেক কেটে গেছে।

এই সাতটি দিন ধরে দীপক অবিরাম চেষ্টা করেছে ড্রাগনের বিষয়ে খোঁজখবর নেবার জন্যে, তবে সফল হয়নি। দীপকের মনে তখন চিন্তায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। সে ভাবে ড্রাগন কি তাহলে আবার কোলকাতা থেকে পালিয়ে গেল নাকি?

এইভাবে সাতদিন কেটে গেল। আটদিনের দিন সকালবেলা হঠাৎ মিঃ সেনকে আসতে দেখে দীপক তাঁকে যথোচিত সম্মানের সঙ্গে বসালো। তারপর বললে—কি খবর মিঃ সেন?

মিঃ সেন যেন হাঁপাচ্ছিলেন। তিনি বললেন—একটু পরে বলছি।

দীপক তখন ভজহরিকে চা ও খাবার আনতে বললে।

কিছু খাবার ও চা খেয়ে মিঃ সেন একটু সুস্থ হলেন।

তারপর বললেন—আবার মহা ঝামেলার মধ্যে পড়েছি দীপকবাবু।

—কেন?

—এ ঘটনা বোধহয় ড্রাগনের ঘটনার চেয়েও অনেক বেশি ভয়াবহ।

—কেন?

—কারণ এতে সরকারের মহা ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। সারা দেশ জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে এই ঘটনার জন্যে।

—হঠাৎ সারা দেশ জুড়ে তোলপাড়? কি ব্যাপার?

—ব্যাপারটা খুব সাধারণ নয়! সারাদেশে এখন যে পরিমাণ কারেন্সী নোট চলছে, তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার জাল নোট চলতে শুরু করেছে। কিন্তু এই সব জাল নোট এমন নিখুঁতভাবে জাল করা হচ্ছে যে, কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে ওগুলো জাল নোট। জাল নোটের সঙ্গে আসলের কোনও পার্থক্য নেই।

—এত নিখুঁত ভাবে জাল করা কি এদেশে সম্ভব?

—হ্যাঁ, এদেশেই তা সম্ভব হয়েছে! আমি যদি আপনাকে একটি নোট দিই—আপনি বুঝতে পারবেন না যে, সেটি জাল। এই রকম হাজার হাজার জাল নোট বাজার ছেয়ে গেছে। বাজারে পূর্ণ মূল্যেই এই নোট চলছে—কিন্তু এতে সরকারী কারেন্সীর ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। হয়ত এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে পড়তে পারে।

—তাও কি সম্ভব?

—হ্যাঁ। বিশ্বাস না হয়, প্রমাণ করে দেখাতে পারি।

—এগুলো যে জাল নোট তা প্রমাণ হলো কিভাবে?

—প্রমাণ হলো নোটের নম্বর থেকে। আপনি বোধহয় জানেন দীপকবাবু যে প্রত্যেকটি নোটের উপর একটা নম্বর থাকে। একই নম্বরের মাত্র একটি করে নোট ছাপা হয়—কোন নোটের নম্বরের সঙ্গে অন্য কোনটা মিলবে না।

—তা জানি।

—কিন্তু হুবহু একই নম্বরের দশখানা নোট দেখা গেলে বোঝা যাবে যে নিশ্চয় সেগুলো সব জাল নোট।

—তা বটে।

—অথচ নম্বর বাদে বাকী সব এমন নিখুঁত যে তা জাল বলে বোঝা যায় না।

—এ বিষয়ে আপনারা কোনও অনুসন্ধান করেছেন কি?

—করেছি।

—তাতে কি জানা গেছে?

—জানা গেছে এই যে, কোলকাতা শহরের দু'তিনটি ব্যাঙ্ক থেকে পাইকারী হারে এই সব নোট ছাড়া হয়েছে। অবশ্য এখন দোকানে বাজারে সব জায়গায় এসব নোট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সর্বপ্রথম শুধু কয়েকটা ব্যাঙ্ক থেকে এই নোট ছাড়া হয়েছিল।

—ব্যাঙ্কগুলির নাম জানেন?

—জানি। মিঃ সেন একটা কাগজ টেনে নিয়ে তাতে তিনটি ব্যাঙ্কের নাম লিখে দিলেন।

তারপর বললেন—এবার এ ব্যাপারে তদন্তের ভার আপনার উপর।

—ঠিক আছে।

এমন সময় বাইরে কলিং বেল বেজে উঠল।

দীপক বললে—একটু বসুন মিঃ সেন, আমি ঘুরে আসি।

—আচ্ছা।

দীপক বাইরে বেরিয়ে এলো। এসে দেখে, একটা ছোকরা সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছে।

দীপক বললে—কি চাই?

—মিঃ সেন আছেন?

—হ্যাঁ।

—আমি তাঁরই বাড়ি থেকে আসছি। এই চিঠিটা তাঁকে দেবেন।

—আচ্ছা।

ছোকরা সাইকেলে উঠে গেল। দীপক খাম শুদ্ধ চিঠিটা এনে দিল মিঃ সেনকে। বললে—এটা আপনার বাড়ি থেকে এসেছে।

—বাড়ি থেকে?

—হ্যাঁ।

—দেখি।

মিঃ সেন খাম খুলে পড়তে লাগলেন।

তাতে লেখা ঃ

প্রিয় মিঃ সেন,

আপনি যে ব্যাপারে তদন্তের জন্যে আমাদের প্রিয় গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, সেটাও আমার নবতম কীর্তি বলে জানবেন।

বাজারে মোট পঞ্চাশটি নম্বর দিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার এক টাকা, দু' টাকা, পাঁচ টাকা ও দশ টাকার নোট আমিই ছেড়েছি। পুলিশ বিভাগের এমন কারও ক্ষমতা নেই যে জাল ও আসল চিনতে পারে।

এবারে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে আমার ব্রেণ কত বেশি তীক্ষ্ণ।

প্রীতি জানবেন। ইতি—

ড্রাগন।

চিঠিটা পড়ে মিঃ সেনের চোখ দুটি যেন ঠিকরে কপালে উঠল।

বললেন—উঃ, এখানেও ড্রাগন।

—তাই ত দেখছি।

—সর্বনাশ! লোকটা যেন আমাকে পাগল করে ছাড়বে।

—তা বটে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল দীপক। বললে—না, লোকটা জ্বালিয়ে খেল দেখছি।

—সত্যি।

দীপক একটু চিন্তা করল। তারপর বললে—আমার মনে হয় যে, এইসব ব্যাঙ্কের সঙ্গে ওদের কোনও যোগাযোগ আছে।

—আচ্ছা, সবচেয়ে বেশি নোট কোন্ ব্যাঙ্কের থেকে চালু হয়েছে?

—ওই গ্রাফিক ব্যাঙ্ক থেকে।

ঠিকানাটা লিখে নিয়ে দীপক বেরিয়ে পড়ল।

।। আট ।।

সন্দেশের দোকান

রসা রোডের উপর গ্রাফিক ব্যাঙ্ক।

দীপক ঠিক বেলা এগারোটায় গিয়ে উপস্থিত হলো ব্যাঙ্কে।

ম্যানেজার মিঃ আয়ারের কাছে কার্ড পাঠাল দীপক। একটু পরেই ডাক এলো।

সুইং ডোর ঠেলে দীপক ভেতরে প্রবেশ করল ধীর পায়ে।

—নমস্কার মিঃ চ্যাটার্জী।

—নমস্কার।

—বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি?

—আমি একটা বিশেষ কথা জানতে চাই আপনার কাছে।

—বলুন।

আপনার ব্যাঙ্ক থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার জাল নোট বাজারে ছাড়া হয়েছে জানেন?

—শুনেছি সে কথা স্যার!

—কি ভাবে তা সম্ভব হলো?

—তা বলা খুব কঠিন। কারণ নোটগুলি এত নিখুঁত যে ধরাই যায় না।

—তা ঠিক। তা আপনার কি ধারণা এই যে, কোন লোক এইসব টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছে?

—তা অসম্ভব নয়।

—আচ্ছা, গত ছ'মাসের নতুন এ্যাকাউণ্ট খুলেছে কত লোক?

—তা প্রায় হাজার খানেক হবে।

—ওরা কত টাকা জমা দিয়েছিল?

—ব্যাঙ্কের ছাতার মত হঠাৎ যেন অনেক ধনী লোক গজিয়ে উঠেছিল। তারা মোটা টাকা জমা দিয়েছিল। শুধু এ ব্যাঙ্কে নয়—সব ব্যাঙ্কেই।

—তাদের নোট পরীক্ষা করা হয়েছিল?

—তা হয়েছিল।

—কাউণ্টার ক্লার্ক কেউ এতে জড়িত নেই ত মিঃ আয়ার?

—তা মনে হয় না। তারা প্রায় সকলেই খুব বিশ্বাসী লোক।

—বুঝেছি। আচ্ছা, এই সব লোক যে হঠাৎ টাকা জমা রাখল, তাদের টাকা এখন নেই?

—আছে। তাদের হয়ত বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা কি দুই এক লক্ষ টাকা জমা পড়েছিল, এখন হয়ত সামান্য দু' পাঁচশো পড়ে আছে।

—বাকি টাকা তুলে নিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—তবে ত এরা সন্দেহভাজন ব্যক্তি।

—তা বটে। সব ব্যাঙ্কেই এই রকম কাণ্ড ঘটে গেছে।

—কিন্তু সে সব ব্যাঙ্ক থেকেও এ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অনেক বেশি জাল নোট চালু হয়েছে।

—তা হতে পারে। আমি ও বিষয়ে ঠিক বলতে পারব না।

—তা বটে। আচ্ছা, ব্যাঙ্কের টাকা থাকে কোথায়?

—সেফ্‌ভল্টে।

—সেটি কি সুরক্ষিত?

নিশ্চয়। তাছাড়া সেফ্‌ভল্ট্ থেকে নোট পাল্টে দিতে গেলে তো তালা ভাঙতে হবে।

—তা ত হবেই।

—কিন্তু কখনো তো তালা অবস্থায় দেখা যায়নি দীপকবাবু।

—তা ঠিক।

—তাই আমার ধারণা এই যে, এভাবে নোট পাল্টানো হয়নি।

—আচ্ছা, সেফ্‌ভল্টটা ত ব্যাঙ্কের তেতলায়, তাই না?

—হ্যাঁ।

—কোন্ দিকে?

—একেবারে পশ্চিম কোণে।

—তার পাশে কোনও বাড়ি আছে।

—হ্যাঁ, একটা দোকান আছে।

—কিসের দোকান?

—মিষ্টির দোকান ছিল একটা। কিছুদিন হলো সেটা উঠে গেছে।

—কতদিন হবে?

—তা প্রায় একমাস কি তারও কিছু বেশি।

—ঠিক আছে আর কিছু আমার জানবার নেই। তাহলে উঠি।

—ঠিক আছে। নমস্কার।

দীপক উঠে দাঁড়ায়।

দীপক সোজা নেমে আসে নিচে। দেখে, সত্যিই ব্যাঙ্কের পশ্চিম কোণে একটা দোকান বন্ধ হয়ে আছে।

দীপক জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যে, ঐ দোকানটা প্রায় দেড় মাস বন্ধ আছে। যারা ঐ দোকান করেছিল তারা উঠে গেছে ঘর ছেড়ে দিয়ে।

দীপক একজন স্থানীয় লোককে ডাকল। বলল—এ বাড়ির বাড়িওয়ালার নাম কি?

—রমেন সেনগুপ্ত। তিনি এ বাড়িরই দোতলায় থাকেন।

দীপক উপরে উঠে গেল। রমেনবাবুর কাছে নিজের কার্ড পাঠাল।

রমেনবাবু এগিয়ে আসেন।

—আসুন মিঃ চ্যাটার্জী। হঠাৎ কি মনে করে?

—কয়েকটা কথা জানতে চাই আপনার কাছে।

—বলুন।

—আপনার বাড়ির একতলায় দোকান হয়েছিল?

—হ্যাঁ স্যার।

—কতদিন আগে?

—তা প্রায় মাস সাত-আষ্টেক আগে ওরা ঐ ঘর ভাড়া নিয়ে দোকান করেছিল। দোকান মন্দ চলছিল না। তারপর হঠাৎ তারা একদিন মালপত্র সস্তায় বিক্রি করে উধাও হয়ে চলে যায়।

ওদের দোকানে কারা থাকত জানেন?

—দু'জন কারিগর থাকত। তাদের নাম হলো রাম আর অজিত। তারা দোকান বন্ধ করেই চলে গেছে। দোকানের মালিককে আমরা কখনো দেখিনি স্যার।

—একটা কথা, ঐ খালি ঘরটা একবার আমাকে দেখাবেন?

—এটা দেখে কি হবে?

—দেখি, যদি কোনও সূত্র পাওয়া যায়।

—ঠিক আছে।

রমেনবাবু নেমে এলেন দীপকের সঙ্গে। ঘরটা খুলে দেখালেন।

দীপক ভাল করে দেখল। তারপর বললে—আচ্ছা, পাশের ব্যাঙ্কটা ত এদিকে। তাই না?

—তা ঠিক।

দীপক ভাল করে দেওয়ালটা পরীক্ষা করল। তারপর বললে—ওই ত দেখা যাচ্ছে ওখানে একটা দাগ রয়েছে।

—তাই ত! এর কারণ কি?

—তার মানে হলো, এটা ভেঙে ওই স্থান দিয়ে পাশের বাড়ির ব্যাঙ্কের সেফ্‌ভল্ট থেকে নোট বের করে তার বদলে জাল নোট রেখে আসা হয়েছিল। তারপর এই অংশটি মেরামত করে দেওয়া হয়।

চিন্তা করতে লাগল দীপক। সব কথা মিঃ সেনকে জানানো উচিত।

দীপক তৎক্ষণাৎ রওনা হলো লালবাজারে পুলিশ হেড কোয়ার্টারের দিকে।

একটু পরে দীপক মিঃ সেনের সঙ্গে দেখা করে সব কথা তাঁকে বললে।

মিঃ সেন বললেন—এ ত ভয়াবহ ব্যাপার!

তা ঠিক।

—এখন কি করা কর্তব্য?

—মিঃ সেন, এক্ষুণি রামু আর অজিতের খোঁজ করুন।

—কোথায় তাদের পাওয়া যাবে?

—বিভিন্ন মিষ্টির দোকান খোঁজ করলেই তাদের পাবেন।

—তা বটে। হয়ত পাওয়া যেতে পারে।

—তা যদি পাওয়া যায়, তবে নিশ্চয় ড্রাগনের ঠিকানা তাদের কাছ থেকে পাওয়া অসম্ভব নয়।

দীপক উঠে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে ফিরল গৃহের দিকে। তবে তার মন গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

।। নয়।।

সফল সন্ধান

পরদিন সকালবেলা।

ঘুম থেকে উঠে দীপক বাইরে বের হয়ে পরবর্তী কি কি কাজ করবে তা চিন্তা করছে, এমন সময় ভজহরি প্রবেশ করল কতগুলো চিঠি নিয়ে।

দীপক দেখল, ড্রাগন আবার তাকে চিঠি দিয়েছে একটা।

ছোট্ট চিঠি ঃ

প্রিয় গোয়েন্দাপ্রবর,

তুমি অনেকদূর অবধি এগিয়ে গিয়েছ তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এত বেশি এগুনো আমি পছন্দ করি না তা তুমি জানো। তাই অবিলম্বে যদি তোমার কাজ-কর্ম বন্ধ না কর তবে তোমার জীবন বাঁচাবার কোনও আশা নেই।

আমার এ চিঠিকে বহ্বারম্ভ বলে মনে ক'রো না—তাহলে বিপদে পড়বে।

ইতি—

ড্রাগন

চিঠিটা কয়েকবার পড়ল দীপক। তারপর রতনকে ডেকে সেটা দেখিয়ে বললে—এটা পড়ে তোর কি মনে হয় রতন?

রতন বললে—তুই যে ঠিক পথেই এগিয়ে চলেছিস তা বুঝতে পারছি। তাই ওরা তোর প্রতি এতটা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

—তা বটে। যাক, আমি শুধু একটা খবরের জন্যে প্রতীক্ষা করছি।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল ঘন ঘন—ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং—

রিসিভার তুলে দীপক বললে—হ্যালো, মিঃ সেন নাকি?

—হ্যাঁ দীপকবাবু। ঐ দুটো লোকের খবর জানতে পারা গেছে। ঐ দু'জন রামু আর অজিত আগের দোকানটি উঠে যাবার পর বর্তমানে কৈলাস বোস স্ট্রীটের একটা দোকানে কাজ করছিল। তাদের ধরে এনেছি লালবাজারে।

—ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি এক্ষুণি।

—ধন্যবাদ!

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখল। তারপর পোশাক পরে চলল লালবাজার অভিমুখে।

রামু আর অজিতকে ভাল করে দেখল দীপক।

রামু দোহারা চেহারা, মাঝবয়েসী। আর অজিত আঠারো-উনিশ বছরের

একজন ছোকরা।

তারা জানাল যে, তারা এ বিষয়ের কিছুই জানে না। তারা মালিকের অধীনে কাজ করত। খাবার তৈরী করত নানারকম।

—তোমার মলিকদের নাম কি?

—তাঁকে আমরা মিঃ বাজপেয়ী বলে জানতাম।

—ঠিকানা?

—আগে থাকতেন ২৬নং রসা রোডে। বর্তমানে কোথায় থাকেন জানি না—কারণ চাকরি চলে যাবার পর আমরা বেকার হয়ে অন্যত্র কাজ নিয়েছি।

—মাঝখানে কি তোমাদের দোকান ভাঙা হয়েছিল?

—তা হয়েছিল।

—ক'দিন বন্ধ ছিল দোকান?

—সাত-আট দিন হবে।

দীপক কোনও উত্তর দিল না। সে বুঝতে পারল, আর কোনও খবর জানা যাবে না।

সে বিদায় নিল।

রামু আর অজিতকে জামিনে মুক্তি দিলেন মিঃ সেন।

তারপর মিঃ সেন দীপকের বাড়ি এলেন দেখা করতে।

বললেন—কেসটা কেমন বুঝছেন?

—বোধ হয় শিগ্‌গীরই ফয়সালা হয়ে যাবে। তবে ড্রাগনকে পাওয়া যাবে কিনা জানি না।

মিঃ সেন নমস্কার জানিয়ে চিন্তিতভাবে নেমে এলেন।

।। দশ।।

গোপন বৈঠকে হানা

ছোট্ট একটা ঘর।

সে ঘরে বসেছিল ড্রাগনের দলের গোপন একটি বৈঠক।

ড্রাগনের দলের মধ্যে যারা ছিল, তাদের অনেকেই আগে ধরা পড়ায় ড্রাগন নতুন করে দল গঠন করেছিল। এ দলের প্রতিটি লোক নতুন। প্রতিটি কর্ম ধারাও চলেছিল নব-পদ্ধতিতে।

আজকে নতুন দলের কয়েকজন ও পুরোনো দলের কয়েকজন লোক একসঙ্গে

এসে জমা হয়েছিল ড্রাগনের আমন্ত্রণে।

তারা সকলে আসন গ্রহণ করে অপেক্ষা করছিল তাদের দলপতির জন্যে।

এ ঘরেও একপাশে দেখা গেল একটা হলুদ কাপড়ের উপরে ড্রাগনের মূর্তি আঁকা। তার সামনে বসেছিল দু'জন লোক।

হঠাৎ দপ্ দপ্ করে তিনবার লাল আলো জ্বলে উঠে নিভে গেল।

কিন্তু ড্রাগনের দলপতিকে দেখা গেল না। সে দলের সামনে এসে দাঁড়ায়নি। দলের নতুন লোকদের বোধহয় সে বিশ্বাস করে না।

ঘরের ঠিক মাঝে ছিল একটি মাইক্রোফানের চোঙা। তার মাঝ দিয়ে ড্রাগন দলপতির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ধীরে ধীরে।

পাশের ঘরে বসে ড্রাগনের দলপতি ভাষণ দিয়ে যাচ্ছিল।

ধীরকণ্ঠে কথা বলছিল সে। কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল এ ঘরে।

গম্ভীর স্বর।

সবাই চুপচাপ বসে বসে শুনতে লাগল একমনে ড্রাগনের কথা ঃ

বন্ধুগণ,

বহুদিন পরে আবার তোমাদের ডাক দিয়েছি আমি বিশেষ কাজে।

আমি ইতিমধ্যে প্রায় দশ-বারো লক্ষ টাকা লাভ করেছি তোমাদের সহযোগিতায়। তোমরাও তার ন্যায্য অংশ পেয়েছ।

আমি আরও নানা পথে আমার কর্মধারাকে ধীরে ধীরে বিস্তৃত করতে চাই। কিন্তু তা আমি পারছি না মাত্র একজন লোকের জন্য।

সে লোকটি হলো গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী। তাকে শেষ না করতে পারলে আমার নিস্তার নেই। যতক্ষণ সে বেঁচে থাকবে, ততক্ষণ আমি সদা বিপন্ন।

সে মারা গেলে, আমি জানি, এ দুনিয়ায় কেউ আমাকে বাধা দেবার নেই। কেউ বাধা দিতেও পারবে না কখনো। তা অসম্ভব।

তাই তোমাদের আমি আহ্বান জানিয়েছি।

তোমাদের মধ্যে যে দীপক চ্যাটার্জীকে মৃত বা জীবন্ত ধরে আনতে পারবে তাকে আমি দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবো।

এই ঘোষণাটি তোমাদের শোনাবার জন্যেই তোমাদের আহ্বান করেছি।

জেনে রাখ, দীপক চ্যাটার্জীর মাথার মূল্য নগদ দশ হাজার টাকা। যে তাকে শেষ করবে, সে-ই তা পাবে।

এর বেশি আর কিছু বলবার নেই। আমার এই ঘোষণা এখানেই শেষ।

ড্রাগনের কথা শেষ হলো। তিনবার দপ্ দপ্ করে আবার জ্বলে উঠল লাল আলো। সবাই বুঝল ড্রাগন কখনো কথার খেলাপ করে না।

কিন্তু সে চলে গেলেও সবার মধ্যে উত্তেজনা লক্ষ্য করা গেল। নগদ দশ হাজার টাকা! ড্রাগন কখনো কথার খেলাপ করে না।

সকলে উঠে দাঁড়াল।

প্রত্যেকের ভঙ্গির মধ্যে ফুটে উঠল উত্তেজনা।

ইতিমধ্যে রামু ও অজিতের কথামত দীপক বুঝতে পারে কোথায় ড্রাগন তার নতুন আস্তানা তৈরি করেছে।

সে হানা দেয় ছদ্মবেশে ঐ অঞ্চলে। তারপর ধীরে ধীরে জেনে নেয় সেই বাড়িতে ড্রাগন আর তার দলবল যাতায়াত করে কিনা।

দীপক নিশ্চিন্ত হয়। ঠিক ঐ ঠিকানাতেই ড্রাগন থাকে। তার দলবলের যাতায়াতও সে গোপনে লক্ষ্য করে।

তখন সে দেখা করে মিঃ সেনের সঙ্গে। তাঁকে বলে সব কথা। তিনি তৎক্ষণাৎ একটা ওয়ারেণ্ট বের করে সেই বাড়ি সার্চের জন্যে।

তারপর যথারীতি তিনি পুলিশদল নিয়ে এবং সঙ্গে দীপক ও রতনকে নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে সেই বাড়িতে হানা দেবার জন্যে তৈরি হন।

তাঁরা সদলে যে সময়ে ঐ বাড়িতে হানা দেয়, ঠিক সেই সময়েই চলছিল সেখানে ড্রাগনের দলের গোপন মিটিং।

মিঃ সেন, দীপক, রতন ও একজন সার্জেণ্ট এগিয়ে যান।

পুলিশ ভ্যান ও জীপে ছিল আরও পুলিশ, সার্জেণ্ট ও অফিসার।

তারা ধীরে ধীরে সারা বাড়িটা ঘিরে ফেলে।

মিঃ সেন গিয়ে দরজার কড়া নাড়েন। কিন্তু তিনি বা দীপক জানতেন না যে ঐ সময়েই ঐ বাড়িতে চলেছিল ড্রাগন ও তার দলবলের গোপন বৈঠক।

।। এগারো ।।

সংঘর্ষ

ড্রাগন তার মিটিং শেষ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়নি তখনো।

তার দলবল সকলে তার বক্তৃতা শুনে উঠে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল।

এমন সময় হঠাৎ একজন অনুচর ঘরের মধ্যে ঢুকে ড্রাগনকে বললে—সর্বনাশ হুজুর!

—কি হয়েছে?

—পুলিশ!

—পুলিশ? কি করে তারা এ বাড়ির ঠিকানা পেল?

—জানি না। দেখলাম, সঙ্গে আছে ঐ টিকটিকি—দীপক চ্যাটার্জী আর রতন।

—সর্বনাশ!

ড্রাগন চিন্তিত হয়। সে তৎক্ষণাৎ মাইকের কাছে গিয়ে বলে—বন্ধুগণ, এ বাড়ি হঠাৎ পুলিশবাহিনী এসে ঘেরাও করছে। তোমরা আমরন সংগ্রাম করবে—ধরা দেবে না। আর যার যার সঙ্গে পিস্তল আছে, গুলি চালাও।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশবাহিনীকে লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চলতে লাগল।

গুড়ুম! গুড়ুম!

বাতাস ভারী হয়ে উঠল যেন এ শব্দে। বারুদের গন্ধে ভরে গেল চারদিক।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশবাহিনী পিছনে সরে গেল। তারাও পাল্টা গুলি চালাতে লাগল।

দু'পক্ষে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেল।

মিঃ সেন বললেন—কি ব্যাপার?

দীপক বললে—ড্রাগনও ঠিক তৈরি ছিল স্যার! তার দলের লোকেরাও গুলি চালাচ্ছে।

একজন পুলিশ ছদ্মবেশে পেছন দিক দিয়ে বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করল দরজা খুলে দেবার জন্যে। কিন্তু ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে একটি ছোরার আঘাতে সে ধরাশায়ী হলো। আচমকা তাকে হত্যা করল ড্রাগন।

কিছুক্ষণ কেটে গেল।

দীপক বললে—ড্রাগনের দলবল নিশ্চয়ই ছিল এ সময় ঐ বাড়িতে। তাই তারা গুলি চালাচ্ছে।

—তাহলে উপায়?

লড়াই করে ওদের সরানো যাবে না। তার চেয়ে এক কাজ করুন।

—বলুন?

—আরও পুলিশ কল্ করুন। প্রয়োজন হলে এ বাড়ি ভেঙে টুকরো টুকরো করতে হবে।

—ও কে.!

মিঃ সেন ওয়ারলেস ভ্যানে ফিরে গেলেন। তারপর তিনি আরও পুলিশে কল করলেন।

একটু পরে লালবাজার থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে গেল পুলিশ।

ছ'টি পুলিশ ভ্যান এলো। সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারশো সশস্ত্র পুলিশ।

গুলি চলতে লাগল।

কিন্তু বিপরীত দিক থেকে কোনও উত্তর পাওয়া গেল না আর।

একটু পরে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

কয়েক মিনিট কাটল।

পুলিশবাহিনী ভেতরে প্রবেশ করল দলে দলে উদ্যত রাইফেল হাতে।

ভেতরে দেখা গেল ড্রাগনের চারজন সহকর্মী আহত হয়ে পড়ে আছে।

তারা ভেতরে প্রবেশ করল। আরও ক'জন আহত লোককে তারা গ্রেপ্তার করল।

মোট আটজন লোককে পাওয়া গেল সেই বাড়িটার ভেতরে আহত বা অক্ষত অবস্থায়।

কিন্তু ড্রাগনের দলপতিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

দীপক বললে—কি ব্যাপার বলুন তো মিঃ সেন?

মিঃ সেন বললেন—নিশ্চয় কোনও গোপন পথে পালিয়েছে ড্রাগন ও তার সঙ্গীরা।

—কোন্ পথে?

—সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। কিন্তু কোনও গোপন পথ পাওয়া গেল না।

পুলিশবাহিনী গেল দোতলায়।

দোতলায় গিয়ে মিঃ সেন বললেন—ঐ দেখুন, ঐ ঘরের মধ্যে একটা গোপন সুড়ঙ্গ পথ।

—মনে হয় ঐ পথেই ড্রাগন পালিয়ে গেছে।

—কিন্তু কিভাবে?

তারা এগিয়ে গেল। দেখল, সুড়ঙ্গ পথ লম্বাভাবে চলে গেছে বহুদূর। অনেকটা দূরে গিয়ে কোথাও শেষ হয়েছে হয়ত।

—কি ব্যাপার?

—ড্রাগন তার দলবলকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়ে নিজে কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর সহ এই পেছন দিকের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে পলায়ন করেছে এ বাড়ি থেকে। সমস্ত টাকা-পয়সা ও হীরালাল শর্মার মূল্যবান হীরাগুলি নিয়ে সে এভাবে পালিয়েছে।

সবাই নিশ্চুপ।

মিঃ সেন বললেন—এবারে সে যে কি বেশে আবির্ভূত হবে তা কে জানে।

দীপক কোনও উত্তর দিল না।

আকাশ-পথে ড্রাগন

।। এক।।

এরোপ্লেনে রহস্যময়ী নারী

দমদম থেকে প্লেনখানা উড়ল আকাশে।

প্লেনটা সোজা যাবে এখান থেকে একেবারে বোম্বে হয়ে কায়রো। তারপর সেখান থেকে সোজা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে।

প্লেনে অনেক যাত্রী। যারা বোম্বের যাত্রী তাদের বোম্বের টিকিট কাটা। যারা বিদেশের যাত্রী তাদের প্লেনের টিকিট দেখে তারপর বিদেশযাত্রার পাসপোর্ট চেক করা হয়েছে।

ঠিক বেলা দশটায় প্লেন ছাড়বে। ন'টা থেকেই এরোড্রোমে প্রবল ভিড়। বহু লোক এসেছে সেখানে তাদের বিদেশগামী আত্মীয় বা বন্ধুদের সী অফ্ করার জন্যে।

প্রত্যেকের মালপত্র সার্চ করা হলো তারপর সে ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো। একে একে তারা প্লেনে গিয়ে উঠল।

প্লেনে দেশী-বিদেশী দুই ধরনের যাত্রীদেরই দেখা গেল।

প্লেনের আরোহীদের মধ্যে বসে থাকতে দেখা গেল দীপক ও রতনকে। তারা বিশেষ একটা কাজে বোম্বাই যাচ্ছে কয়েকদিনের জন্যে বোম্বের পুলিশ সাহেবের আহ্বানে।

প্লেনের একটি কোণে বসেছিল একটি দীর্ঘাঙ্গী ও স্বাস্থ্যবতী নারী। তাকে দেখে বিদেশিনী বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। তবে তার পেটটা যেন খুব উঁচু। তা দেখে ধারণা হয় যে, সে হয়ত আসন্নপ্রসবা।

একটু পরে প্লেন আকাশের বুকে উড়ল। চক্রাকারে একটু উড়ে তা চলতে লাগল পশ্চিমমুখে ধীর গতিতে। কিছুদূর ধীরে ধীরে গিয়ে তারপর ক্রমে প্লেনের গতি বাড়বে।

সকলে যে যার আসনে বসে আছে। দীপক আর রতন নিচের দিকে তাকিয়ে দেখছিল প্রকৃতির দৃশ্য।

রতন বলছিল—উপর থেকে প্রতিটি গ্রামকেই শুধু সবুজ বলে মনে হয়—তাই না?

—সেটাই ত স্বাভাবিক—গাছপালা, ঘাস, সব কিছু যেন মিলেমিশে একাকার

হয়ে যায়।

এইসব নানা কথা বলতে বলতে দীপক হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে অবাক হলো।

একেবারে সামনের সীটে আসন্নপ্রসবা যে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী বিদেশিনী নারীটি বসেছিল, সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে প্লেনের মাঝ-বরাবর এগিয়ে এলো। তার হাতে দেখা গেল একটা পিস্তল।

মেয়েটিকে হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে উঠে পিস্তল বের করতে দেখে প্লেন শুদ্ধ লোকেরা ঘাবড়ে গেল। সবাই চমকে উঠল—কি ব্যাপার?

যাত্রীরা অনেকে ভয় পেলো। অনেকে বিস্মিত হলো।

মেয়েটি বললে—আপনাদের কারও কোন ভয় নেই—আমি কারও বিন্দুমাত্র ক্ষতি করবো না জানবেন। তবে আমাকে যে ধরতে চেষ্টা করবে। তাকে গুলি করতে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবো না।

মেয়েটিকে এভাবে দাঁড়াতে দেখে রতন দীপককে বললে—মেয়েটাকে ধরবার চেষ্টা কর তো! ওরকম করছে কেন? মাতাল নাকি?

দীপক বললে—না, মাতাল মনে হচ্ছে না—তবে মনে হয় কোন কু-মতলব আছে ওর মনে।

—তার মানে?

—মানে যে কি, তা ও কি করে, তা না দেখলে বোঝা যাবে না। তবে এটাও ঠিক, ওকে ধরতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ও গুলি করবে।

মেয়েটি তীব্রকণ্ঠে বললে—হ্যাঁ, আমি যা বলেছি, তা ঠিকই বলেছি। কেউ একটু উঠে দাঁড়ালেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে তার মাথাটা ছাতু করে দেব। আমার কাজ শেষ হলেই আমি চুপ করব, তার আগে নয়।

প্লেনের বাঁ পাশের সারিতে একটা লোক চুপচাপ বসেছিল। পরনে স্যুট।

তার হাতে ছিল একটা চামড়ার পোর্টফোলিও ব্যাগ। মেয়েটি হঠাৎ তার হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে বললে—এই যে ধীরেনবাবু! আপনি ত বেশ সরকারকে ফাঁকি দিয়ে, কাস্টমস্‌কে ফাঁকি দিয়ে মোটা টাকা নিয়ে চলেছেন বিদেশে, কিন্তু আমার নজরকে ফাঁকি দিতে পারেননি।

ধীরেনবাবু নামধারী লোকটি উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। বললে—ব্যাগটা দিন।

মেয়েটি বললে—না। এই ব্যাগে আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা। ও টাকা তুমি কোথায় পেলে—আর কোথায় নিয়ে চলেছ?

—তাতে তোমার দরকার কি?

—দরকার এই যে, তুমি বে-আইনী কাজ করেছ, তার শাস্তি তোমায় পেতে হবে।

বলে মেয়েটি ধীরেনবাবু নামধারী লোকটিকে এত জোরে ধাক্কা দিল যে সে সীটে বসে পড়ল চুপচাপ।

মেয়েটি বললে—এ টাকা নিয়ে আমি নেমে যাব। বুঝলে? আর আপনারা যে যেমন আসনে বসে আছেন তেমনি থাকুন। আমার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে এসে লাভ নেই। জেনে রাখুন, বিশ্বের সেরা মেয়ে কুস্তিগীরের চেয়ে আমার দেহে শক্তি কম নয়। এই দেখুন।

বলেই মেয়েটি দু'বার শূন্যে পিস্তল ফায়ার করল। শব্দ হলো—গুড়ুম! গুড়ুম!

তারপরেই সে এগিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে এরোপ্লেনের জানালার শক্ত মোটা কাঁচে দুবার আঘাত করল।

সঙ্গে সঙ্গে জানালাটা ভেঙ্গে গেল। মেয়েটি তার পেটের সঙ্গে সংলগ্ন প্যারাসুট বের করল। এবারে বোঝা গেল, মেয়েটি মোটেই গর্ভবতী নয়—আসলে ওটা একটা গুপ্ত প্যারাসুট।

মেয়েটি আচমকা জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ল শূন্যে।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল প্যারাসুট। কিন্তু প্লেনের যাত্রীরা দেখতে পেল না।

রতন বললে—মেয়েটি নিচে পড়লে ত তার দেহটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তাই না?

দীপক বললে—তা ঠিক। কিন্তু তা হবে না।

—কেন?

—ওর সঙ্গে প্যারাসুট ছিল। ও তৈরী হয়েই ত প্লেনে উঠেছে।

—তাই নাকি? আশ্চর্য ত! এমন মেয়ে ত দুনিয়া জয় করতে পারে।

—তা ত পারেই। মেয়েটা এত অল্প সময়ে কি কাণ্ড করে গেল!

যাত্রীদের মধ্যে তখন গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। কেউ বললে—যাদু জানে! কেউ বললে—মেয়েটা দেবী, না দানবী?

কেউ বললে মেয়েটা পাগল নয় ত? এসব কি কাণ্ড করল সে?

দীপক এগিয়ে গেল ধীরেনবাবু নামধারী লোকটির কাছে।

বললে—মেয়েটা কে জানেন?

—আগে বলুন, আপনি কে?

—আমি রহস্য অনুসন্ধানী দীপক চ্যাটার্জি।

—ওঃ! আপনার নাম শুনেছি। নমস্কার! দেখুন ত, মেয়েটা আমার টাকাগুলো কিভাবে—

দীপক বাধা দিল। বললে—মেয়েটি কি ক'রে জানল যে, আপনার কাছে এত

টাকা আছে?

—তা ত জানি না।

—আর মেয়েটা নিচে নেমে গেল যেভাবে, তাতে মনে হয় যে, এ কাজের জন্যে তৈরী হয়েই সে এসেছিল।

—তা বটে। ও নিশ্চয়ই নিচে পড়ে মারা যাবে না। কি বলেন?

—কক্ষণো না। সে এসব কাজে পটু। প্যারাসুট নিয়েই প্লেনে উঠেছিল।

—বলেন কি? আমার টাকাটা উদ্ধার করে দিন দীপকবাবু!

—কিন্তু তার আগে একটা প্রশ্ন করি, আপনি এত টাকা নিয়ে প্লেনে উঠলেন কেন? এটা ত বে-আইনী।

—বিদেশে টাকা কাজে লাগবে ভেবে—

—মিথ্যা কথা! সেখানে ভারতীয় টাকা চলবে না কোনখানেই।

—বিদেশী ব্যাঙ্কে ওটা চেঞ্জ করে নেওয়া ত যেত?

—তা বটে। আপনি কি আর না জেনে এভাবে গোপনে টাকা নিয়েছিলেন সঙ্গে? যাক, প্লেন ত এবারে নামবে। দেখি কি করতে পারি।

।। দুই ।।

অনুসরণ

যাত্রীদের কোলাহল, হৈ চৈ, প্লেনের মধ্যে গুলির শব্দ, মেয়েটির পলায়ন—এসব দেখে প্লেনের পাইলটরা বুঝেছিল যে, কিছু একটা অঘটন ঘটেছে।

তারপর প্লেন নামাতে অনুরোধ করল যাত্রীরা। দীপকও অনুরোধ করল প্লেন নামাতে।

পাইলট একটা ফাঁকা মাঠ দেখে প্লেন নামাতে লাগল। চক্রাকারে কয়েকবার ঘুরে প্লেন নিচে নেমে এলো।

একটু পরে প্লেনটা ল্যাণ্ড করল। প্লেন থেকে নামল দীপক, রতন আর ধীরেনবাবু। অন্য যাত্রীরা নামতে রাজী হল না।

দীপক পাইলটকে বললে—আপনি একটা বিবৃতি লিখে দিন—আমি সেটা স্থানীয় থানায় নিয়ে যাব। তারপর আপনি প্লেন নিয়ে চলে যাবেন গন্তব্য-পথে। আর দেরী করতে হবে না।

—ঠিক আছে।

পাইলট নিজের বক্তব্য লিখে দিল কাগজে। সেটা প্লেন কোম্পানীর কাগজ।

সেটা নিয়ে রতন ও ধীরেনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে দীপক চলল থানার দিকে।

থানা সেখান থেকে প্রায় দুমাইলের পথ তা দীপক স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল।

জায়গাটা হলো বীরভূম জেলার একটা গ্রাম অঞ্চল। দীপক স্থানীয় লোকের কাছ থেকে থানার ঠিকানা জেনে নিল।

থানায় গিয়ে দেখা করল ও, সি,-র সঙ্গে জানাল সব কথা। পাইলটের লেখাটাও দেখাল।

ও, সি, বললেন—এখন তা হলে কি করতে বলেন?

দীপক বললে—আমার মনে হয়, মেয়েটি হয় সাংঘাতিক কোনও অপরাধী—কিংবা কোনও দুর্ধর্ষ নারী-দস্যু।

—তা সম্ভব নয়।

—যেখানে সে নেমেছে—সে জায়গাটা এখান থেকে বড়জোর এক মাইল দূরে। প্যারাসুটের সাহায্যে নেমে গেছে সেই নারীমূর্তি। আমাদের এক্ষুণি গিয়ে তাকে ধরতে হবে। যদি ধরতে না পারি, তবুও তার সন্ধান নিতে হবে আমাদের।

ও, সি, দীপকের নাম শুনে বললেন—আপনি স্বয়ং যখন এ ব্যাপারে আছেন, তখন চিন্তার কোন কারণ নেই।

—তা হয়ত নেই। কিন্তু তবু সঙ্গে কিছু পুলিশ নিয়ে যাওয়া ভাল।

—তা ঠিক। কি পরিমাণ পুলিশ চাই?

—অন্ততঃ দু'জন আর্মড পুলিশ ও একজন অফিসার হলে ভাল হয়।

—বেশ, তবে তাই হোক। আমি নিজে যাচ্ছি পুলিশ নিয়ে।

তক্ষুণি একটা জীপে করে দীপকরা সদলে চলল মেয়েটি যেখানে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল সেইদিকে।

দীপক বললে এখান থেকে পূর্বদিকে গাড়ি চালান। বড়জোর এক মাইল দূরেই তার দেখা পাব আমরা।

জোরে পুলিশ ভ্যান ছুটে চলল।

প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে গিয়ে একটা বনজঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম্য পরিবেশে ভ্যানটা গিয়ে দাঁড়াল।

ভ্যান থেকে নামল দীপক ও সঙ্গীরা। তারা দেখতে পেল দূরে কতকগুলি কৃষকের কুটির রয়েছে। তারা সেদিকে এগিয়ে গেল।

একটা পুকুরের পাড়ে দেখা গেল ছোট ছোট কুটির।

দীপক একটা কুটিরের দাওয়ায় তিন-চারজন লোককে বসে থাকতে দেখল।

দীপক ঐ অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষা জানত। সে গ্রাম্য ভাষায় প্রশ্ন করলে—

আপনাদের কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? দলবল নিয়ে আমরা একজনের খোঁজে এসেছি। একটি মেয়েলোক।

—মেয়েলোক? কিরকম?

—প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে একটা প্লেন কি এখানকার আকাশ দিয়ে উড়ে গেছিল?

—রোজই ত ওড়ে এই সময়ে।

—আজ কোন মেয়ে কি প্লেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল?

—ঐ একটা দৈত্য মেয়ের কথা বলছেন ত আপনারা, হুজুর?

—হ্যাঁ।

—মেয়েটা সাক্ষাৎ দৈত্য। একটা ছাতা মাথায় ধরে ঝুলতে ঝুলতে নেমে এলো। পড়েছিল ঐ জঙ্গলে। আমরা সব দেখতে গেলাম।

—কতটা দূরে পড়েছিল?

—এখান থেকে প্রায় তিন রশি মত দূরে আর কি।

দীপক বুঝল, প্রায় দু'ফার্লং কি কিছুটা দূরে মেয়েটা পড়েছিল।

বললে—তারপর?

—তারপর মেয়েটা গেল ঐ গ্রামের প্রান্তরে পোড়ো জমিদার বাড়িতে।

—পোড়ো জমিদার বাড়ি?

—হ্যাঁ। সেখানে এখন কেউ থাকে না। কেবল ভূত-পেত্নীদের আড্ডা। আমরা কেউ ভয়ে সেদিকে গেলাম না। তাছাড়া মেয়েটার হাতে একটা ছোট্ট বন্দুক ছিল।

দীপক বললে—মেয়েটা ডাকাত। আমরা তার খোঁজেই এদিকে এসেছি।

—আমরা জানতাম না ত! জানলে সবাই মিলে—না হয় লাঠি সড়কি নিয়ে তাকে ধরতে যেতাম।

দীপক আর কথা বাড়াল না।

সে ও, সি, মিঃ সান্যালকে বললে—তাহলে চলুন, জমিদার-বাড়িটা রেড্ করা যাক।

—হ্যাঁ, তাই করতে হবে।

দীপক তখন গ্রাম্য লোকটিকে বললে—একটা কথা ছিল ভাই!

—বলুন।

—একজন যাবে জমিদার বাড়িটা দেখিয়ে দিতে?

—বেশ ত, যাব।

—আর এর জন্যে তোমাকে আমরা দশ টাকা পুরস্কার দেবো।

পুরস্কারের কথা শুনে লোকটি আনন্দে নেচে উঠল।

সে তক্ষুণি নিয়ে চলল দীপকদের পথ দেখিয়ে। দীপকরা তার সঙ্গে পায়ে এগিয়ে চলল জমিদার বাড়ির রহস্য-সন্ধানের অভিযান।

।। তিন।।

এ মেয়ে ত মেয়ে নয়

বিরাট একটা জঙ্গলের পাশে পোড়ো জমিদার বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।

যেন বিরাট একটা প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ।

বাড়ির চারদিকে অসংখ্য জংলা গাছের জটলা। কুল, আম, জাম থেকে আস্‌শেওড়া, কাঁটানটে সব জাতের গাছই আছে।

জমিদার-বাড়ি যে এককালে বিরাট ছিল তা বুঝতে পারা যায়। তবে এখন ইটগুলো সব দাঁত বের করে আছে। পলেস্তারা নানা জায়গায় খসে পড়তে শুরু করেছে।

মিঃ সান্যাল বললেন—এ বাড়ির নামে যে ভৌতিক কুখ্যাতি থাকবে তা আশ্চর্য নয়।

—তা বটে। বললে দীপক।

—সেটাই ত স্বাভাবিক। নিশ্চয় কোথায় নামছে তা সে ভাল করে জানত। এখানে হয়ত আগেই তার অনুচরবর্গ জমায়েত হয়ে ছিল।

—কিন্তু এই বাড়িতে?

—হ্যাঁ। এ বাড়িতে কোন লোক সাহস করে বা কৌতূহলী হয়ে ঢুকবে না। দস্যুর আড্ডার জন্যে ত এমনি বাড়িই চাই। তাই না?

—তা বটে।

—তাছাড়া এতগুলো টাকা নিয়ে যে প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়ল, সে নিরাপদে আশ্রয় আগেই ঠিক করে রাখবে।

—তাহলে এখন কি করা যায়?

—মনে হয় জমিদার বাড়িটার বাইরে এমনি ভাঙা হলেও ভেতরে দু'চারটে ঘর ভাল আছে। সেইখানেই ওরা আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের ভেতরটা একবার অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।

—তা ত বটেই।

ওরা এগোল।

ধীর পায়ে এগিয়ে চলল জমিদার বাড়ির দিকে।

আচমকা শোনা গেল বন্দুকের গর্জন—গুড়ুম—গুড়ুম।

দীপক বললে—সাবধান। জমিদার-বাড়ি থেকে গুলি ছুটে আসছে।

—তাই ত দেখছি। আর ওই গুলি ছোট কোনও রিভলবার বা পিস্তলের গুলি নয়। এ রীতিমত বন্দুকের গুলি।

—তা বটে। এ গুলি খুব সাধারণ কোনও বন্দুক থেকে ছোঁড়া হচ্ছে না। মনে হয়, স্টেন্‌গান জাতীয় বন্দুক হবে।

একটু চিন্তা করল দীপক। বললে—আগেই ওদের দলের লোক তাহলে ভেতরে ছিল।

মিঃ সান্যাল বললেন—বাপরে বাপ! এ মেয়ে ত মেয়ে নয়—মনে হয়, কোনও পুরুষ-দস্যুর বাবা এ মেয়ে।

—ও কি তাহলে মেয়ের পোষাক পরে প্লেনে উঠেছিল?

—তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়।

ভেতর থেকে গুলি বর্ষণ হতেই লাগল।

দীপক বললে—তাহলে আমাদেরও বোধহয় গুলি চালাতে হবে।

—তা ত বটেই।

সঙ্গে সঙ্গে দীপকরাও গুলি চালাতে লাগল। থর থর করে কেঁপে উঠল সমস্ত পরিবেশটা।

দীপক বললে—এগিয়ে চলুন।

পুলিশবাহিনী গুলি চালাতে চালাতে এগিয়ে চলল।

জমিদার বাড়ি থেকে গুলি চালানো বন্ধ হয়ে গেল একটু পরে।

কিছুক্ষণ কাটল....

ওরা এগিয়ে গিয়ে দেখল দরজা বন্ধ। একজন শক্তিশালী কনস্টেবল জোরে জোরে লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলল।

ভেতরে প্রবেশ করল পুলিশবাহিনী। কিন্তু ভেতরে গিয়ে কাউকে পাওয়া গেল না।

দীপক বললে—এটা তাহলে দস্যু ড্রাগনেরই একটা ঘাঁটি।

—তাই ত দেখছি দীপকবাবু!

—আর ঐ মেয়েটা সাধারণ মেয়ে নয়।

—তাই মনে হয়। এতক্ষণে সব বোঝা গেল।

—কিন্তু ওরা গেল কোথায়?

—তাই ত ভাবছি।

—বোধহয় বাড়ির পেছনদিকে কোনও গোপন-পথ আছে।

—চলুন দেখা যাক।

খুঁজতে খুঁজতে ওরা বাড়ির পেছনদিকে গিয়ে দেখে, একটা সরু পথ চলে গেছে। পথটা স্যাঁতসেঁতে। তাতে দেখা গেল কয়েক জোড়া জুতোর ছাপ।

দীপক বললে—এই পথ দিয়েই তাহলে গেছে ওরা—তাই না?

—হ্যাঁ।

—গুলি চালিয়ে আমাদের আটকে রেখে এখান দিয়ে ড্রাগন পালিয়েছে সদলে।

—উঃ, কি সর্বনেশে লোক।

—আর এমন কাণ্ড করল যে—আশ্চর্য!

ওরা পেছনদিকেও অনেক খুঁজল। কিন্তু ড্রাগন যে কোন্ দিক দিয়ে হঠাৎ কোথায় চলে গেল দলবল নিয়ে, তার কোনও হদিশ পাওয়া গেল না।

।। চার।।

আবার ডাকাতি

ড্রাগনকে ধরতে ব্যর্থ হয়ে ভেবেছিল, সে আবার ফিরে যাবে কোলকাতায়। সেখান থেকে আবার নতুন করে বোম্বে যাত্রা করবে সে। কারণ বোম্বের পুলিশ-সুপার বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করেছেন তাকে তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে।

দীপক চিন্তিত হলো।

ও, সি, মিঃ সান্যাল দীপককে অনুরোধ করলেন অন্ততঃ আরও একটি দিন থাকার জন্যে।

তিনি বললেন—আপনি যদি সঙ্গে সঙ্গে রওনা হন, তাহলে এদিকে, আমাদের বিপদ। ড্রাগন সদলে যদিও জমিদার-বাড়ি থেকে চলে গেছে, তবুও সে এই সব অঞ্চলেই আছে। কখন যে কোথায় সে হঠাৎ কি বেশে আবির্ভূত হবে তা কেউ জানে না। আর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বিভাগকেও নাস্তানাবুদ হতে হবে।

দীপক একটু চিন্তা করে বললে—তাহলে রতন, তুই দু'চারদিন এখানে থেকে যা বরং।

রতন হেসে বললে—ড্রাগনের মত ভয়াবহ দস্যুর বিরুদ্ধে মিঃ সান্যালও যা আমিও তাই, আমিও এমন কিছু সফলতা অর্জন করতে পারব না।

দীপক বললে—বেশ, তবে দু'একটা দিন দেখি, কি হয়।

কিন্তু পরদিনই আবার এমন একটা ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেল যে, দীপকের

আর কোলকাতায় ফিরে যাওয়া হলো না।

পরদিন সকাল ন'টা।

হন্তদন্ত হয়ে একজন লোক এসে ঢুকল থানায়। তার মাথার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। চোখ-মুখ শুকনো। সারা মুখে আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তার ছায়া। মাঝবয়েসী লোক, মাথায় টাক।

সে এসে ও, সি, মিঃ সান্যালকে বললে—স্যার, গতকাল বীরপুর গ্রামে আমার বাড়িতে এবং পাশের বাড়িতে ভয়াবহ ডাকাতি হয়েছে।

দীপকও থানায় ছিল। সে বললে—আপনার নাম?

—কালীপদ বাগচি।

—পেশা?

—আজ্ঞে, মহাজনী কারবার। সুদে টাকা খাটনোই আমার পেশা।

—কতদিন এ কাজ করছেন আপনি?

—তা প্রায় বিশ বছর। আমাদের পৈতৃক কারবার।

—আপনার পাশের যে বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে, তার মালিকের নাম কি?

—হরিহর সামন্ত। ডাকাতরা তার ঘরে ঢুকে তাকে বেঁধে ফেলে। তার স্ত্রী মৃত, ছেলেমেয়ে কেউ নেই। সে একা থাকে। তার বাড়িতে অবশ্য টাকা-পয়সা বেশি কিছু পায়নি দস্যুরা। লোকটা খুব ধনী নয়।

—তাই বুঝি তিনি আসেননি?

—তা হবে।

—আপনার কত টাকা গেছে?

—তা নগদ ও সোনায় মিলে প্রায় বিশ হাজার টাকা।

—গ্রামের লোক দস্যুদের ধরতে পারেনি?

—আজ্ঞে ভয়ে কেউ বের হয়নি—কারণ দস্যুদের সঙ্গে পিস্তল ছিল।

—পিস্তল—মানে বন্দুক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাদের কাউকে চিনতে পেরেছেন?

—না। সবার মুখে কালো কাপড় বাঁধা ছিল স্যার। তবে তারা স্থানীয় লোক বলে মনে হয় না—মনে হয় বাইরের লোক। ডাকাতি করে চলে যাবার সময় তারা একটা কাগজ ফেলে রেখে যায়। একটা চিঠির মত। সেটাও এনেছি।

—আপনার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কেন মিঃ বাগচি?

—ডাকাতরা আমার ঘরে ঢুকতেই আমি লাঠি নিয়ে বাধা দিতে গিয়েছিলাম। তাই ওদের একজন আমার মাথায় আঘাত করে। আমি আহত হয়ে পড়ে যাই। তারপর দস্যুরা আমাকে বেঁধে ফেলে।

—কই দেখি চিঠিটা।

চিঠিটা নিয়ে দীপক সেটা খুলেই চমকে উঠল। কারণ, তাতে একটা ড্রাগনের ছবি মনোগ্রাম করা ছিল।

তার নিচে লেখা ঃ

প্রিয় গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জি এবং ও, সি, মিঃ সান্যাল,

আপনারা যে আমাকে অনুসরণ করে পোড়ে জমিদার-বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলেন, তা দেখে আমি আপনাদের বুদ্ধির প্রশংসা করছি। তবে জানেন ত অত সহজে ড্রাগনকে ধরা যায় না। কথাটা মনে রাখবেন।

ভাল কথা, আপনাদের কাছে আমার উপস্থিতি জানিয়ে দেবার জন্যে আবার একটা ছোট্ট ডাকাতি করতে হলো। এর থেকে বুঝবেন, আমি কখনই কাজ ছাড়া থাকতে পারি না।

আশা করি, ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে। ইতি—

ড্রাগন।

দীপক কালীপদ বাগচির দিকে চেয়ে বললে—এ চিঠিতে কি লেখা ছিল তা কি জানতেন আপনি?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ, আমরা পড়েছি। তারপর এটা আপনাদের কাছে দেখাতে এনেছি।

—ঠিক আছে, আপনি যান। আমরা শীগ্‌গিরই ঘটনাস্থলে যাব। কাজে আমরা অবহেলা করি না। আশা করি, দস্যুদের ধরতে পারব।

—আচ্ছা, একটা কথা—

—বলুন।

—এরাই কি সেই কুখ্যাত দস্যু ড্রাগনের দল যাদের কথা আমরা কাগজে পড়ি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা এরা এই গ্রামের বুকে এলো কেন?

—তা জানি না। তবে কর্মগতিতে এরা এসে পড়েছে এদিকে। এদের বিষয়ে সব কথা পরে জানতে পারবেন।

—আচ্ছা, নমস্কার।

মিঃ বাগচি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। দীপক বললে—মিঃ সান্যাল, চলুন ঘটনাস্থলটা একটু পরিদর্শন করে আসি।

—হ্যাঁ চলুন।

—সেটা এখান থেকে কত মাইল?

—প্রায় তিন-চার মাইল ত বটেই।

—ঠিক আছে, দেখা যাক। কিন্তু ভাবছি, খুব তাড়াতাড়ি বোধহয় আমার ফিরে যাওয়া হলো না।

মিঃ সান্যাল হেসে বললেন—তা বটে।

।। পাঁচ ।।

সূত্র আবিষ্কারে

ঘণ্টাখানেক পরে মিঃ সান্যাল, রতন আর দু'জন আর্মড কনস্টেবল নিয়ে দীপক সোজা চলল পুলিশের গাড়িতে চড়ে বীরপুর গ্রামের দিকে।

গ্রামে পৌঁছতে দেরী হলো না। দীপক যে থানা থেকে আসছে তা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে গেল স্থানীয় লোকদের।

দীপকের নির্দেশে পুলিশ দল ভিড় সরিয়ে পাতলা করে দিল। পুলিশের তাড়ায় তারা সব ধীরে ধীরে বিদায় নিলেও, কিছুটা দূরে গিয়ে আবার ভিড় জমাল।

এদিকে দীপক মিঃ বাগচির বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজল। কিন্তু কোনও সূত্র আবিষ্কার করতে পারল না সে।

হঠাৎ একদিকে দীপকের নজর গেল।

পাশের বাড়ি আর এ-বাড়ির মাঝখানে একটা সামান্য উঁচু প্রাচীর। অতি সহজেই প্রাচীর টপকে ও-বাড়ি থেকে এ-বাড়িতে আসা যায়।

দীপক বললে—পাশের বাড়ির ভদ্রলোক হরিহর সামন্ত কি বাড়িতে আছেন বাগচিবাবু?

—আছেন।

—তাঁকে ডেকে দিন ত।

—দিচ্ছি!

একটু পরেই হরিহর এসে দাঁড়াল।

দীপক তার দিকে চেয়ে বললে—কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব আপনাকে সঠিক উত্তর দেবেন।

—বলুন।

—কাল রাতে দস্যুরা ঠিক ক'টায় আপনার বাড়িতে হানা দেয়?

—রাত তখন প্রায় একটা।

—প্রথমে তারা আপনার বাড়িতে আসে—তাই না?

—হ্যাঁ।

—আপনাকে বেঁধে তারপর তারা দেখে কিছু নেই। তখন তারা প্রাচীর বেয়ে এ-বাড়িতে আসে। এ-বাড়ির গেট দুর্ভেদ্য বলে তারা এ-বাড়িতে আগে আসেনি। তাই না সামন্তবাবু?

—তা হবে।

—আপনার বাড়ির গেটও ত কম মজবুত নয়—তারা তা ভাঙ্গল না কেন?

—হয়ত কোনও রকমে খুলেছিল।

—না, খোলেনি। আপনি সেটা খোলা রেখেছিলেন, মিঃ সামন্ত।

—তার মানে?

—মানে আপনার সহায়তায় ওরা এ-বাড়িতে প্রবেশ করে। তা না হলে এত সহজে এ ডাকাতি হতো না।

—বলেন কি? আমাকে যে ওরা বেঁধেছিল।

—তা বেঁধেছিল, আপনি যে নিজের বাড়ির দরজা খুলে রেখেছিলেন তাতে আপনার উপর সন্দেহ আসতে পারে—তাই আপনাকে বেঁধে ফেলে—যাতে কেউ সন্দেহ না করে। কেমন, আমি ঠিক বলছি না?

—এটা মিথ্যা কথা।

—না, মিথ্যা কথা নয়। ড্রাগন কত টাকা দিয়েছিল আপনাকে?

—কিছুই না—এসব ডাহা মিথ্যা।

—বেশ, চলুন, আপনার বাড়ি সার্চ করব।

পুলিশবাহিনী মিঃ সামন্তকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়িটা সার্চ করল।

একটি বাক্সের মধ্যে প্রায় চারশো টাকা পাওয়া গেল।

দীপক বললে—কাল ডাকাত পড়ল বাড়িতে, তারা একটা টাকাও নিল না আবার এ টাকা কোত্থেকে এলো?

মিঃ সামন্ত নিশ্চুপ।

দীপকের নির্দেশে সামন্তকে গ্রেপ্তার করলেন মিঃ সান্যাল, দস্যুদের সাহায্য করার অপরাধে।

দীপক বললে—আর তদন্ত করে কোনও লাভ নেই, মিঃ সান্যাল। ড্রাগনকে ত আর এখানে পাওয়া যাবে না।

থানায় এসে মারের ভয়ে সব কথা স্বীকার করল সামন্ত।

সে বললে—ডাকাতি হবার দিন সকালে সে গিয়েছিল হাটে। সেখানে একটি অচেনা লোক তাকে বলে, সে কিছু টাকা চায় কিনা?

সামন্ত গরীব। টাকার লোভ ছাড়তে পারেনি।

লোকটি তাকে বলে—আপনি ত গরীব—আপনার তা টাকা পয়সা কিছুই নেই। যদি আপনি আজ রাতে আপনার বাড়ির দরজা খোলা রাখেন তাহলে আপনাকে তিনশো টাকা দেওয়া হবে।

সামন্ত চারশো টাকা চায়। ওরা তাই দিয়ে চলে যায়। কিন্তু সামন্ত তখনও জানত না, ওদের মধ্যে এত প্যাঁচ ছিল।

দীপক বললে—আপনার কথা সত্যি বলেই মনে হয়। তবু আপাততঃ আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। শীগ্‌গিরই হয়ত মুক্তি পাবেন।

সামন্ত কোনও উত্তর দেয় না।

।। ছয়।।

নারীহত্যা

দুটো দিন ধরে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই ড্রাগনের সন্ধান পায় না বা ও-কেসটার কোনও কিনারা করতে পারে না দীপক।

কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ পাশের একটা গ্রামে ঘটে গেল আর একটা অদ্ভুত ঘটনা। ঠিক রেলওয়ে স্টেশনের কাছে রেল লাইনের উপরে ঘটে গেছে ঘটনাটা। সেই ঘটনার কথাই বলছি।

ট্রেনের ইঞ্জিনের রেগুলেটারটা বেশ স্পীডে তুলে দিয়ে নেশার ঝোঁকে ঝিমুচ্ছিল ট্রেনের প্রৌঢ় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাইভার জনসন।

নেশাটা তার আজ বেশি হয়েছিল একটু। শীতটা খুব কড়া পড়েছিল বলেই তাকে নেশার মাত্রাটা বাড়াতে হয়েছিল।

বেয়ারাকে দিয়ে আরও একটা বোতল সে আনিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেটাও প্রায় খালি হয়ে এলো।

আর গোটা পাঁচেক স্টেশন পার হলেই গন্তব্যস্থল। এটুকু ফায়ারম্যান রামশংকরই ম্যানেজ করে নিতে পারবে। সত্যিই চালাক ছোকরা রামশংকর, এটুকু বয়সে সব কাজ চটপট শিখে নিচ্ছে। মনে হয় ছোকরা শীগ্‌গিরই মাস্টারের পদে প্রমোশন পাবে।

জনসন ভাবে নিজের ছেলে ইয়ং মরিসনের কথা। একটা ধাড়ি গাধা—এক কড়া মুরোদ নেই তার। চাকরি গেছে দিন পনেরো—অনেক চেষ্টা করেও সে তাকে ফিরে লাগাতে পারছে না কাজে। দিনরাত যা তা খাবে আর প্রেম করবে গার্ডের হাড়গুলি মেয়েটার সঙ্গে।

হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকানি। গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। জনসনের চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। মাথাটা প্রচণ্ড জোরে ঠুকে গেছে।

তাকিয়ে দেখল, এমার্জেন্সি ব্রেকের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে রামশংকর। তার অতি-সতর্ক চোখে অবিরাম অতন্দ্র দৃষ্টি।

—কি হলো রামশংকর?

—নেমে আসুন মাষ্টার। দেখতে পাবেন।

—হোয়াটস্ দি রঙ? নেশাটা ছুটে যাবার জন্যে খেঁকিয়ে ওঠেন জনসন।

—আইয়ে মাষ্টার, দেখিয়ে। বলে, একটা টর্চ নিয়ে নেমে পড়ল রামশংকর।

সঙ্গে সঙ্গে নামল জনসনও।

খালাসীটা বুঝতে না পারলেও নামল।

বাইরে নিশ্ছিদ্র আঁধার। ইঞ্জিনের হেড লাইটের আলোয় সামনেটা আলোকিত।

গালাগালি করতে করতে জনসন এগিয়ে গেল। দেখতে পেল দৃশ্যটা। সঙ্গে সঙ্গে জনসনের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। শীতের জন্যে নয়, ভয়ের জন্যে। রীতিমত ঘামতে শুরু করল সে।

রামশংকরও দেখেছিল। তার মুখ দিয়ে বের হলো একটা কথা—আউরৎ।

লাইনের উপরে উপুড় হয়ে শুয়েছিল মেয়েটা—মাঝে পড়েছিল মেয়েটার দেহ। সময়মত ইঞ্জিন ব্রেক কষায় মেয়েটির দেহ চেপ্টে যায়নি। মাথার চুল এগিয়ে আছে। যেন নিশ্চিন্তে সে ঘুমিয়ে রয়েছে।

জনসন বললে—উঃ, সময়মত ব্রেক না কষলে চটকে যেতো দেহটা।

রামশংকর খালাসীটাকে বললে—তুম জলদি গার্ডসাব্‌কো বোলাও।

—আচ্ছা, সাব্।

খালাসীটা ছুটে যায়। একটু পরে গার্ড সব দেখে ছুটে যায় স্টেশনে, থানায় ফোন করে ঘটনাটা জানাতে।

গার্ড বুঝতে পারে যে, কেউ মেয়েটাকে হত্যা করে লাইনে ফেলে দিয়ে গেছে। ভেবেছে, রেলে কাটা পড়লে সবাই ভাববে মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে। কেউ আর এটা মার্ডার বলে ভাবতে পারবে না।

কিন্তু রামশংকরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির জন্যে তা হয়নি—ধরা পড়ে গেছে খুনীর জারিজুরি।

একটু আগের ঘটনা।

হুলুস্থূল পড়ে গেছে মদনহাটি গ্রামের অপরেশ সেনের বাড়িতে। বিমলাকে পাওয়া যাচ্ছে না। বিমলা হলো অপরেশের স্ত্রী।

নদীর ওপারে একটা গজিয়ে ওঠা বড় কারখানায় কাজ করে অপরেশ সেন।

সারাদিন তার হাড়ভাঙা খাটুনি—তাই রাতে একটু সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে সে শুয়ে পড়ে।

সেদিনও তাই করেছিল। পাশের বিছানায় দশ মাসের ছোট্ট বাচ্চাটাকে নিয়ে শুয়েছিল বিমলা। হঠাৎ বাচ্চার কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় পাশের ঘরে শুয়ে-থাকা অপরেশের মার। বুড়িটা চোখে মোটেই দেখতে পায় না। তাই ঘর থেকে ডাকে—বৌমা—ও বৌমা! কি পোড়া ঘুম বাবা তোমাদের। একটু ওঠ বাপু। বাচ্চাটাকে নাও!

কারও সাড়া পায় না বুড়ি। অগত্যা নিজেই সে ওঠে। দেওয়াল ধরে দাঁড়ায়। ডাকে—অপরেশ, ও বাবা অপরেশ!

একটু পরে অপরেশের ঘুম-জড়ানো কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—মা তুমি কখন এলে? কি হয়েছে?

—বলিহারি ঘুম তোদের! ছেলেটা কেঁদে কেঁদে সারা হলো, আর তার মায়েরই বা কেমন ঘুম!

লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দেয় অপরেশ। বলে—একি! মা, বিমলা কোথায়?

—বিছানায় শুয়ে নেই?

—না ত!

—তবে কোথায় গেল? বোধহয় পায়খানা কিংবা কুয়োর ধারে।

অপরেশ উঠে সব তন্নতন্ন করে খুঁজল—কিন্তু পাওয়া গেল না বিমলাকে।

মুহূর্তের মধ্যে অপরেশের মার কান্নার ধ্বনিতে সারা পাড়াতে রটে গেল কথাটা। ঘুম-ভাঙা চোখে দু'চারজন প্রতিবেশী এসে হাজির হলো। ক'জন ছুটল আশপাশের বাড়িতে খুঁজতে। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না বিমলাকে।

দু'একজন বললে—থানায় খবর দাও অপরেশ।

অপরেশ বললে—এত রাতে কে যাবে?

—আমরাই যাব।

পাড়ার দু'তিনটি সাহসী ছেলে চলল থানার উদ্দেশ্যে। উত্তেজনার খোরাক মিলেছে—শীতের ভয় করলে কি চলে?

কিন্তু অপরেশের জ্ঞান-ভাই হরিপদ গেল না কোথাও। সে সান্ত্বনা দিচ্ছিল অপরেশ আর তার মাকে।

অপরেশের জ্ঞাতি-ভাই হরিপদ একটা বাড়ির পরেই থাকে। সংসারে সে একা। বিয়ে-থা সে এখনো করেনি। বাপ-মা কেউ নেই; দূর-সম্পর্কের এই বৌদি অর্থাৎ অপরেশের স্ত্রী বিমলার কাছেই সে পেতো মাতৃস্নেহ।

আজকাল হরিপদ এ-বাড়িতে বিশেষ আসতো না—কারণ অপরেশের সঙ্গে

তার একটু মন কষাকষি চলছিল। কিন্তু সে আজ না এসে থাকতে পারল না এখানে—এই চরম বিপদের দিনে।

বাচ্চাটা বুকে করে একপাশে বসেছিল সে, চোখ দিয়ে অঝোর ধারে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু। ভাবছিল, কোথায় গেল বিমলা বৌদি? অপরেশদা তো কিছু বলছেন না—খালি ঝিম মেরে আছেন। বুড়ি জেঠিমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সেও কেঁদে উঠল হঠাৎ।

।। সাত ।।

আকস্মিক গ্রেপ্তার

বড্ড বিপদে পড়ে গেছে মদনহাটির অপেরা পার্টির সব সদস্যরা।

সরস্বতী পূজার আর মাত্র দ' তিন দিন দেরী আছে। সব ঠিকঠাক।

এবারে বিখ্যাত বই "মাটির ঘর" করবে তারা।

বই রিহার্স্যাল শুরু হবে—এমন সময় কিনা বিগড়ে বসল হরিপদ।

তাহলে রমেশের পার্টটা কে করবে? আর হরিপদ ছাড়া এ পার্ট কেউ জমাতে পারবে না। সুদর্শন, সুন্দর, তরুণ নায়ক হরিপদই যে ক্লাবের আশা ভরসা!

সে গোঁ ধরে বসেছে, সে অভিনয় করবে না। মনটা খুব খারাপ।

একপাশে চুপচাপ বসেছিল হরিপদ মনমরা হয়ে। একেবারে নির্বাক স্পন্দনহীন।

ক্লাবের কে কি কথা বলছে তা তার কানে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে না মোটেই।

কারও কথার কোনও জবাবও দিচ্ছে না সে।

ক্লাবের ডিরেক্টর অমর তার দুটি হাত ধরে অনুরোধ জানাল।

—শুনছিস্! এবারের মত আমাদের উদ্ধার করে দে ভাই! আর কখনো এমন করে বলব না। তা না হলে বইটাই মাটি। লক্ষ্মী ভাই, আমাদের ডোবাসনে এমন করে। শোন—

—কি করব?

—পাঁর্টটা করবি। লাইট, ড্রেস সব বায়না হয়ে গেছে। তুই না করলে যে সব মাটি। আমাদের মুখটা যাবে একেবারে পুড়ে। আর সম্মান থাকবে না।

হরিপদ নির্বাক।

যাত্রার দলে ওদের ভাল বাঁয়া তবলা বাজায় কেষ্ট। অবশ্য একটু কিছু তরল দ্রব্য পেটে পড়ে তার নিয়মিত—না হলে ভাল বাজাতে পারে না।

আজও বুঝি সে কিছু টেনে এসেছিল। তাই সুর করে বললে—

'অভিমান নয় আর রাধে।
মান ভাঙি এসো মোর সাথে।
না ভাঙিলে মান ভাঙাইতে হবে—
ধরি দুটি রাঙা পায়ে।'

তারপর বললে—উঃ, চেহারার গর্বে যে একেবারে পা পড়ে না মাটিতে। এত লোক সাধছে—তবু কোনোও সাড়াশব্দ নেই! তখনই জানি, এমন একটা কিছু ঘটবে। 'বৌদি বৌদি' বলে অত আসা-যাওয়া। রাতদিন দু'জনে এত মেলামেশা। আর অপরেশটাও কিনা তেমনি। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে বসল বৌটা।

হঠাৎ কি যেন হলো হরিপদর। এতক্ষণ সে চুপচাপ বসেছিল, এবার সে বাঘের মত লাফ দিয়ে পড়ল কেষ্টর উপরে।

সকলে ছুটে এলো।

—হরিপদ, কি হচ্ছে?

সবাই মিলে অনেক কষ্টে নিবৃত্ত করল হরিপদকে। কিন্তু তাকে যেন কেউ ধরে রাখতে পারছে না। তার দেহে যেন মত্ত হস্তীর বল।

পাগলের মত সে কেষ্টর গলা ধরে চীৎকার করে উঠল—বল্, আর কখনো এমন কথা বলবি?

—না-না, ছাড়।

তবুও ছাড়তে চায় না হরিপদ।

এমন সময়—

হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন থানার ও, সি, মিঃ সান্যাল। বললেন—হরিপদ কার নাম?

সবাই চমকে উঠল।

—কি ব্যাপার? প্রশ্ন করল অমর।

হরিপদ তখন কেষ্টকে ছেড়ে দিয়ে ঘন ঘন হাঁপাচ্ছিল। আর কেষ্ট বোকার মত মুখ করে হাত বুলিয়ে চলেছিল গলায়।

হরিপদই প্রথমে নীরবতা ভেঙে কথা বললে। তীব্র কণ্ঠে উদ্ধতভাবে বললেন—কেন কি ব্যাপার? আমারই নাম হরিপদ।

—আপনি?

—হ্যাঁ।

—ইউ আর আণ্ডার অ্যারেষ্ট!

—কেন?

—বিমলা দেবীকে হত্যার অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ভরত সিং,

হাতকড়া লাগাও!

—তার মানে? আমি হত্যা করেছি বৌদিকে?

—হ্যাঁ, তাই আমাদের সন্দেহ।

এতক্ষণ পরে কান্নায় ভেঙে পড়ল হরিপদ। বললে—বিমলা বৌদি খুন হয়েছে? আর আমি হত্যা করেছি তাকে? বলেন কি দারোগাবাবু, বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানি না।

সবাই বিস্মিত, হতভম্ব, নির্বাক।

একি অবিশ্বাস্য কথা শুনছে তারা? অপরেশের বৌটা তাহলে আত্মহত্যা করেনি? সে খুন হয়েছে—আর তাকে খুন করেছে এই হরিপদ?

—যা প্রমাণ পেয়েছি, তার উপর নির্ভর করে আপনাকে অ্যারেষ্ট করলাম। বিমলাদেবীর স্বামী অপরেশবাবু আপনাকে তার সঙ্গে মিশতে নিষেধ করেছিলেন। তাই না?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—কারণ, তাঁর ধারণা, আমি কু-উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিশতাম।

—আপনি ও-বাড়িতে যেতেন না আজকাল?

—না।

—বুঝেছি।

বিজ্ঞের হাসি হাসেন মিঃ সান্যাল। হরিপদকে নিয়ে চলেন থানার দিকে।

দীপকের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল মিঃ সান্যালের এই কেসটা নিয়ে। মিঃ সান্যাল বললেন—ঐ হরিপদই হিংসার জ্বালায় বৌটাকে হত্যা করে লাইনের উপর ফেলে রেখেছিল যাতে আত্মহত্যা বলে মনে হয়। গলা টিপে হত্যা করা হয়েছিল, কিন্তু ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান ব্যাপারটা দেখে ফেলে বলেই বোঝা যায় এটা খুন। ইঞ্জিনের চাকা দেহের উপর দিয়ে চলে যায়নি। পোষ্টমর্টেমের রিপোর্টও বলছে, এটা খুন।

—কিন্তু হরিপদর যে মেয়েটির সঙ্গে ইলিসিট কানেকশন ছিল তার কোনোও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে?

—আছে, ঘটনার কয়েকদিন আগে ঐ ব্যাপার নিয়ে দুই ভাইয়ে মন কষাকষি হয়েছিল।

—কিন্তু হরিপদর খুন করার কি মোটিভ থাকতে পারে, মিঃ সান্যাল?

—নিশ্চয়ই কিছু একটা ছিল। ঠিক ধরা যাচ্ছে না। তাছাড়া জেলাসীও হতে পারে।

—তা পারে। কিন্তু আপনি ডিরেক্ট প্রমাণ ছাড়া ত এ কেস দাঁড় করাতে পারবেন না।

—সে চেষ্টাই ত করতে হবে।

মিঃ সান্যাল সিগারেট ধরালেন একটা।

।। আট ।।

ঘটনাচক্র

শোকের ছায়া নেমে এসেছে অপরেশের সংসারে। স্ত্রী মারা গেছে তার—আবার ছোট বাচ্চাটারও প্রাণসংশয়।

রাতদিন খালি কাঁদছে অপরেশ। তার বুড়ি মা যেন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে তাকে সামলাতে। কার কাছে এখন বাচ্চাটা থাকবে? শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কোনওকালে কোনোও সম্পর্ক রাখেনি অপরেশ—তাই তাদের কাছেও বাচ্চাটাকে রেখে আসতে পারছে না।

ভেবে ভেবে অপরেশ প্রায় আধমরা হবার উপক্রম বলা যায়। ক'দিন থেকে কাজেও সে বের হতে পারছে না। দিনরাত সে বসে থাকে চুপচাপ। কথাবার্তাও বিশেষ বলে না কারও সঙ্গে।

সেদিনও তাই হয়েছিল। সে বসে বুঝি ভাবছিল নিজের দুর্ভাগ্যের কথা। কোলে ছিল বাচ্চাটা। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল একসময়।

বুড়ি মা ডাক দিল—অপরেশ! একটু কিছু মুখে দিবি আয়। এমনি করে কতদিন আর থাকবি বল ত? শরীরের দিকে একটু চেয়ে দেখতে হবে ত। খোকাকে বাঁচাতে হবে। তুই এমনি ভেঙে পড়লে আমি কোথায় যাব বল দেখি?

অপরেশ উত্তর দেয় না। একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে তার বুক ভেদ করে।

হরিপদ দুদিন পরেই ছাড়া পেয়ে গেল। জামিনে খালাস হলো সে। কি করে যে এটা সম্ভব হলো তা কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছিল না। তার না আছে লোকবল—না আছে টাকার জোর, গাঁয়ের সকলেই আজ তার বিরুদ্ধে। সে খুনী।

কিন্তু হরিপদ ভাবে, খুনী ত সে নয়। তা হলে খুন করল কে?

বিমলা বৌদিকে খুন করার উদ্দেশ্য থাকতে পারে কার? কি সে উদ্দেশ্য? কার এমন জঘন্য কাজ?

কোনও লোকেরই তার উপরে রাগ বা হিংসা থাকার কারণ নেই। তবে? এই প্রশ্নটার মীমাংসা হরিপদ করতে পারে না কিছুতেই।

থানা থেকে বেরিয়ে সে ধীর পায়ে বাড়ির পথ ধরল।

বাড়িতে এসেই সে চমকে উঠল। থানা থেকে ফিরে এসেই এমন দৃশ্য যে দেখতে হবে, তা ভাবতেও পারেনি হরিপদ।

সে দেখল, অপরেশদাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন পুলিশ। দারোগাবাবু মিঃ সান্যালও সঙ্গে আছেন।

কি ব্যাপার, তা সে বোঝে না।

অপরেশের মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছে। হাতে হাতকড়ি কোমরে দড়ি। ধীর পায়ে সে হাঁটছে।

হরিপদ কি যেন বলতে গেল—কিন্তু তার গলা দিয়ে স্বর বের হলো না।

নিশ্চল, নির্বাক সে।

—অপরেশদা, তুমিই বৌদিকে—

আর কোনও কথা বেরুলো না তার মুখ দিয়ে।

মিঃ সান্যাল বললেন—শুধু তাই নয়—ইনি দীর্ঘদিন ধরে গোপনে ড্রাগনের দলে কাজকর্ম করছেন, সে প্রমাণও পেয়েছি। দস্যু ড্রাগনের কাছে তিন চার বছর ধরে ইনি কাজ করছেন তার ফলেই শেষ পর্যন্ত এই অবস্থা।

—কেন?

—ড্রাগনের কাছে ইনি এক সময় মোটা টাকা নেন। অগ্রিম হিসাবে। কিন্তু তারপর দল ছেড়ে দেন। ড্রাগন ভয় দেখায়, শিগ্‌গীর টাকা ফেরত না দিলে মেরে ফেলবে সে তাকে। হত্যা করতে তার হাত কাঁপে না। তাই বাধ্য হয়ে—

—কিন্তু বিমলা বৌদির সঙ্গে টাকার কি সম্পর্ক?

—আছে। বিমলাদেবীর সঙ্গে ওর জয়েণ্ট লাইফ-ইন্সিওরেন্স ছিল। সেই টাকাটা অর্থাৎ দশ হাজার টাকার লোভ কি ইনি এত সহজে সামলাতে পারেন?

—তা ত জানি না। বললে হরিপদ।

—জানবেন কি করে? এ সবই ত এতদিন গোপন ছিল। এখন জানা গেছে, কারণ ইনি ধরা পড়েছেন।

হরিপদ কোনও উত্তর দিতে পারে না।

।। নয়।।

ড্রাগনের পশ্চাতে

থানায় বসে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে দীপক বললে—কেসটা খুবই সোজা। কেস হিস্ট্রীটা ভাল করে স্টাডি করলে আর অপরেশের চেহারা দেখলেই তা আন্দাজ করা যায়। এটা আসলে কোনও জটিল কেস নয় মিঃ সান্যাল।

মিঃ সান্যাল বললেন—আমি কিন্তু এটা মোটেই ভাবতে পারিনি। অপরেশকে সন্দেহ করার মতো কোন কারণই খুঁজে পাইনি আমি। তাছাড়া লোকটা যে রকম ভেঙে পড়েছিল, তা দেখে রীতিমত দুঃখই হয়েছিল আমার। ও নিজে স্বীকার না করলে হয়তো বিশ্বাস হতো না আমার।

—তা সত্যি। ঘাড় নেড়ে সায় দেয় দীপক। কিন্তু একটা কথা কি জানেন—মানুষের মন সত্যিই বিচিত্র ও জটিল। তাই নয়?

—তা বটে।

—মানুষের মনের মধ্যে আছে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, তেমনি আছে একটা ভয়াবহ নির্জনতার প্রস্তুতি। সেটা অদ্ভুত। সেটা বেড়ে গেলে মানুষ সব করতে পারে। তাছাড়া লোকটা ড্রাগনের দলে কাজ করার সময় যে টাকাটা আত্মসাৎ করেছিল তা ফিরিয়ে দিতে হবে, তা যখন ভেবেছিল তখন তার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের ডেস্‌পারেট ভাব জেগেছিল নিশ্চয়।

একটু থেমে দীপক বললে—তারপর ধরুন তার চরিত্র। ছেলেবেলায় সে পেয়েছে কেবল বঞ্চনা আর নির্যাতন। তারপর সে বিয়ে করে স্ত্রীকে ভালবাসল, কিন্তু তার মধ্যেও সে পেল কেবল অবিশ্বাস আর স্ত্রীর অবাধ্যতা। বিমলাদেবী হরিপদকে প্রেমিকের মত ভালবাসত না ঠিকই—সে কিন্তু তাই মনে করত।

অপরেশ নিজে সুপুরুষ ছিল না। বৌটি ছিল সুশ্রী, তরুণী, সুন্দরী। চেহারার ব্যাপারে মনে মনে ক্ষোভ ছিল অপরেশের। তার বাড়িতে সুপুরুষ হরিপদর যাতায়াত সে তাই পছন্দ করত না। কিন্তু তার বৌ হরিপদকে ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসত। তাই সে স্বামীর নির্দেশ মেনে নিতে পারেনি।

একদিন অপরেশ দেখল, বিমলাদেবী গোপনে হরিপদর সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলছে। তার সন্দিগ্ধ মনটা উঠল বিষিয়ে। তারপর ওদিকে দিতে হবে ড্রাগনের পাওনা টাকা। স্ত্রী মারা গেলে তার নামে ইন্সিওর করা টাকা সে পাবে। তাই তার মনটা টাকার লোভে মেতে উঠল।

সে ভাবল, বৌকে হত্যা করবে। কিন্তু তা এমনভাবে করবে যে, কেউ জানতে পারবে না।

সেদিনই রাতে সে বৌকে গলা টিপে মেরে লাইনে ফেলে রেখে এলো। ডাবল ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট বলে সবাই মনে করবে।

বাড়ি ফিরে দেখে বাচ্চাটা কাঁদছে। তার অন্ধ মা এ ঘরে এসে তাকে ডাকছে।

সে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের ভান করে উত্তর দিল। তার মা বুঝতে পারল না যে, সে ইতিমধ্যে এত কুকাজ করে এসেছে।

—এটা আমাদের মাথায় আসেনি। মিঃ সান্যাল বললেন।

—যা হোক—এখন চেষ্টা করুন, যাতে ওর কাছ থেকে ড্রাগনের ঠিকানাটা পাওয়া যায়।

—তা ত করতেই হবে।

দীপক তার বক্তব্য শেষ করল।

বন্দী অপরেশকে আনা হলো ঘরের মধ্যে। সেখানে বসেছিল দীপক, রতন ও মিঃ সান্যাল।

দীপক প্রশ্ন করল—ড্রাগন আপনার কাছে পাওনা টাকা দাবী করেছিল। সেটা কোথায় দেবার কথা ছিল?

—তার আড্ডায়।

—কোথায় আড্ডা?

—কোলকাতা শহরে রিজেন্ট স্ট্রীটের দশ নম্বর বাড়িতে।

—ঠিক ত?

—নিশ্চয়। সে আমার শত্রু। এতদিন তাকে ভয় করতাম। আজ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আর ভয় করি না।

—বেশ। দীপক বলল—তাহলে আমাকে আজই যেতে হবে কোলকাতায়।

মিঃ সান্যাল বললেন—হ্যাঁ, তা না হলে হয়ত সে পালাবে।

—তা ত বটেই।

দীপক উঠে দাঁড়াল।

রতনকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে তক্ষুনি চলল ষ্টেশনের দিকে। আজই তাকে কোলকাতায় যেতে হবে।

।। দশ।।

মুখোমুখী

কোলকাতা শহরের একটা নামকরা রাস্তা রিজেন্ট ষ্ট্রীট। এখানেই সেদিন সন্ধ্যাবেলা এসে দাঁড়াল দীপক একা।

সে বুঝতে পেরেছিল যে, পুলিশবাহিনী এলে হয়ত ড্রাগন পালিয়ে যাবে। তাই সে একা লুকিয়ে খুবই গোপনে উপস্থিত হলো সেখানে। অবশ্য সে রতনকে বলে এসেছিল যে, সে এখানে উপস্থিত হবেই। রতনও তাই তাকে অনুসরণ করেছিল বহুদূর থেকে।

দীপক দেখতে পেল, সারা বাড়িটা যেন নিঝুম হয়ে আছে—যেন ঘুমিয়ে আছে নিথর এক নিদ্রার কোলে।

দীপক বাড়ির দরজাটা বন্ধ দেখতে পেল। সে গেলে পেছন দিকে।

দেখে, পেছন দিকের দরজাও বন্ধ। তবে একটা মাঝারি উঁচু প্রাচীর আছে।

পেছনের গলিটা খুব অন্ধকার—খুব নির্জন।

দীপক ভাবতে লাগল গলির মধ্যে প্রবেশ করলেও বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করা উচিত হবে কিনা।

সে একটু ভেবে অনেক কষ্টে প্রাচীরটার উপরে উঠে প্রাচীর টপ্‌কে ভেতরে প্রবেশ করলে।

অন্ধকার বাড়িটার বারান্দা। দোতলায় আলো জ্বলছে টিম্‌টিম্ করে। দীপক একতলার সব ঘর দেখল। দুটো ঘর বন্ধ—তালা দেওয়া। একটা ঘর খোলা—তবে তা রীতিমত অন্ধকার।

দীপক সে ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করল। ছোট্ট একটা টর্চ জ্বেলে দেখতে পেল ঘরটার কোণে অনেকগুলো কাঠের বাক্স।

দীপক সেই বাক্সগুলোর গন্ধ শুঁকে বুঝল তাতে কোকেন, আফিম বা ঐ জাতীয় নানা মাদকদ্রব্য জমা আছে।

দীপক চিন্তিত হলো। এসব মাল যে গোপন চোরাই মাল তা সে বুঝতে পারল ভালভাবেই।

দীপক বাইরে বেরিয়ে এলো! সে নিশ্চিন্ত হলো যে, এখানে যারা থাকে তারা ভাল লোক নয়। যা হোক, নিশ্চিন্ত হয়ে সে ফিরে চলল। ভাবল, এবারে পুলিশ রেড করতে হবে এ-বাড়ির উপরে।

দীপক প্রাচীরে উঠতে যাবে ভাবছিল।

পেছন থেকে কে যেন হেসে উঠল—আট্টহাসি।

—কে?

—মাথার উপরে হাত তুলে দাঁড়াও।

দীপক দেখল, উদ্যত পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন মুখোশধারী লোক।

—কে তুমি? দীপক দৃঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

—যার সন্ধ্যানে তুমি এসেছ, আমি সেই লোক—আমি ড্রাগনের দলপতি।

—তুমি ড্রাগন-সর্দার!

—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ। নড়বার চেষ্টা করলেই আমি গুলি করব।

সঙ্গে সঙ্গে সে একটা হুইসেল দিল।

সে শব্দ পেয়ে দোতলা থেকে দু' তিনজন লোক একসঙ্গে নেমে এলো।

ড্রাগনের দলপতি গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ দিল—বেঁধে ফেলো একে!

কথাটা শুনেই দু'জন লোক এগিয়ে গিয়ে বন্দী করল দীপককে।

দীপক চিন্তিত হলো।

রতন নিশ্চয় এতক্ষণ তার প্রতীক্ষা করে বসে আছে।

বন্দী দীপককে দোতলায় নিয়ে যাওয়া হলো সঙ্গে সঙ্গে।

ড্রাগন উজ্জ্বল আলোয় তাকে দেখে হো-হো করে হেসে উঠল।

বললে—একি, তুমি স্বয়ং দীপক চ্যাটার্জী যে!

—হ্যাঁ।

—চমৎকার! আমি তোমার কথা ভাবছি—আর তুমি আমার বাড়িতে অতিথি?

—তা ত বটেই।

—কিন্তু আর বেশিক্ষণ তোমার আয়ু নেই। আর কয়েক মিনিট! তার পরেই তোমার ভবলীলা শেষ করা হবে।

একজন সঙ্গী বললে—হুজুর, এ কি এখানে বন্দী থাকবে?

—হ্যাঁ!

—কতক্ষণ?

—যতক্ষণ না ওকে শেষ করা হয়। বড়জোর দু' ঘণ্টা। ততক্ষণ আমি কয়েকটা কাজ সেরে ফিরে আসি। আমি চাই, নিজের হাতে ওকে হত্যা করতে।

—আচ্ছা স্যার।

দীপক নির্ভীকভাবে বলল—মৃত্যুকে আমি ভয় করি না জেনো।

—আচ্ছা সে দেখা যাবে।

দীপককে রেখে তারা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দরজা বন্ধ করা হলো।

দীপক বন্দী অবস্থায় বসে নিজ অদৃষ্টের কথা চিন্তা করতে লাগাল।

।। এগারো।।

মুক্তির পথে

ড্রাগনের দল বেরিয়ে গেলেও দীপক কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিল না। সে চেষ্টা করছিল, কি করে এই মরণ ফাঁদ থেকে মুক্তির পথ পাওয়া যায়।

কিন্তু কোনও উপায় ছিল না তার সামনে। এমনভাবে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং এমন পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, সেই মৃত্যুফাঁদ থেকে বের হবার কোনও উপায়ই খোলা নেই দীপকের সামনে।

ওদিকে রতনলাল বসেছিল দীপকের প্রতীক্ষায়। বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও সে দীপককে ফিরতে দেখল না। তখন সে ভাবল, দীপক নিশ্চয়ই শত্রুর ফাঁদে ধরা পড়েছে।

রতন ভাবতে লাগল।

এখন কি করা তার কর্তব্য?

একটু চিন্তা করে সে স্থির করল, যে রিজেন্ট স্ট্রীটের যে বাড়িতে দীপক হানা দিয়েছে তার চারপাশটা একবার সে ঘুরে আসবে।

কোনও দিন ভয় কাকে বলে তা জানে না। চিরদিনই সে দুঃসাহসী—নির্ভীক।

রতন তাই এগিয়ে চলল নির্দিষ্ট বাড়িটার দিকে ধীর পায়ে—চিন্তিত মনে।

নির্দিষ্ট বাড়িটার চারদিকে ঘুরে-ফিরে ভাল করে দেখবে, এই ছিল রতনের ইচ্ছা।

কিন্তু তার ইচ্ছা ফলবতী হলো না। কারণ সে বাড়িটার কাছে গিয়ে পৌঁছবার আগেই দেখতে পেল, চার-পাঁচজন লোক বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসছে।

এর মধ্যে ছিল ড্রাগন ও তার দলবল। রতন ড্রাগনকে না চিনলেও বুঝতে পারল যে ড্রাগন বা তার দলবল কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যাত্রা করছে। তাদের সামনে পড়লে সে ধরা পড়ে যেতে বাধ্য।

রতন তাই সন্তর্পণে পোস্টের আড়ালে আত্মগোপন করল।

কয়েক মিনিট.....

ড্রাগনের দল চলে গেল। রতন তবু অপেক্ষা করতে লাগল।

রতন তখন ভাবল, বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করবে কিনা। একটু চিন্তা করল সে।

বুঝতে পারল যে, বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করলে তার বিপদ বৃদ্ধি পাবে। এখন দীপককে মুক্ত করাই তার প্রধান কর্তব্য। আর ড্রাগনকে ধরতে যদি সে বাড়িটার মধ্যে ঢোকে এবং আটকে যায় তাহলে সে দীপককে মুক্ত করতে পারবে না।

রতন তাই ফিরে চলল।

রিজেন্ট ষ্ট্রীট থেকে কিছুটা দূরে বড় রাস্তার উপরে ছিল একটা ডাক্তারখানা। তার সামনে লেখা ছিল—'সারা দিনরাত খোলা থাকে'।

রতন দেখল, সেখানে টেলিফোন আছে। সে ভিতরে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বললে—একটা ফোন করতে চাই।

—কত লাগবে?

—বেশ ত, করুন।

—আপনার কিছুই লাগবে না।

রতন তৎক্ষণাৎ ফোনে লালবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল।

মিঃ গুপ্তকে সে টেলিফোন ধরতে অনুরোধ জানালা একজন অফিসারের মাধ্যমে। মিঃ গুপ্ত ফোন ধরলে রতন তাঁকে তক্ষুণি সদলে রিজেন্ট ষ্ট্রীটে আসতে বলল।

মিঃ গুপ্ত রাজী হলেন।

রতন টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল পরবর্তী ঘটনাবলীর জন্যে।

প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল।

রতন আড়াল থেকে দেখতে পেল ড্রাগন ও তার দলবল এসে গেছে।

কিন্তু মিঃ গুপ্ত তখনো আসেন নি।

রতন চিন্তিত হলো। মিঃ গুপ্ত কি তবে কোনও বিপদে পড়েছেন?

আরও আধঘণ্টা কাটল।

হঠাৎ শোনা গেল পুলিশ ভ্যানের শব্দ। মিঃ গুপ্ত এসে গেছেন।

রতন বললে—আপনারা রেডি?

—হ্যাঁ।

—তাহলে ঐ বাড়ি রেড করুন।

—দীপকবাবু?

—তিনি বোধহয় ঐ বাড়িতে বন্দী হয়ে আছেন।

—সেকি?

—সত্যিই বলছি।

—তবে ত ঐ বাড়ি রেড করা কর্তব্য।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশবাহিনী প্রস্তুত হয়ে নিল। তারা বাড়িটা ঘিরে ফেলল। তারপর চারপাশে ভাল করে ঘিরে রেখে তারা কড়া ধরে নাড়ল।

খট্ খট্ খট্

কড়া ঝাঁকালো ওরা। কিন্তু কোন উত্তর নেই। শুধু ভেতর থেকে ভেসে এলো পিস্তলের গর্জন।

রতন দৃঢ়কণ্ঠে বললে—ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবেন না—এগিয়ে চলুন।

পুলিশবাহিনী তখন এগিয়ে গিয়ে গুলি ছুঁড়তে লাগল।

দস্যু ড্রাগন কোনও উপায় না দেখে তার গোপন কাজের প্রধান সহকারিণীকে নিয়ে কোন সুড়ঙ্গ-পথে যে পালাল, তা বোঝা গেল না।

তবে পুলিশবাহিনী এগিয়ে চলল। তারা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

দলে দলে পুলিশ প্রতিটি ঘর সন্ধান করে ফিরল—কিন্তু কোনও হদিশ মিলল না।

তারপর পুলিশবাহিনী একটা ঘরে গিয়ে দীপককে মুক্ত করল।

দীপক বললে—একি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

রতন হাসল। বললে—না, এটা বাস্তব।

—তাই ত! তবে কি করে এটা হলো?

রতন সব বললে।

তারপর সারা বাড়ি খুঁজে দেখা হলো। ড্রাগনের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। সে এবং তার প্রধান মহিলা সহকারিণীটি যেন কোথায় উধাও হয়েছে।

দীপক বললে—নিশ্চয় কোনও গুপ্তপথে ওরা পালিয়েছে।

মিঃ গুপ্ত বললেন—ঠিক।

—তাহলে উপায়?

—দেখতে হবে কোন্ পথ দিয়ে ওরা পালাতে পারে। চলুন, দেখা যাক।

সারা বাড়িটা তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো। কিন্তু তবু ড্রাগনকে পাওয়া গেল না।

।। বারো।।

আবার আকাশ-পথে

অবশেষে একতলার একটি কক্ষে এসে দীপক আবিষ্কার করল একটা সুড়ঙ্গ পথ। দীপক ও মিঃ গুপ্ত টর্চ ফেলে ফেলে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে এগোল। তাদের পেছনে পেছনে চলল পাঁচ ছ'জন পুলিশ।

সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তারা দেখতে পেল একটা ফাঁকা জায়গায় তারা পৌঁচেছে। একটা বেশ বড় মাঠের মত।

এমন সময়—

আকাশের বুকে শোনা গেল প্লেনের গর্জন।

দীপকরা দেখতে পেল মাঠের মত জায়গাতে আছে একটা রানওয়ে।

রানওয়েতে দু'টি প্লেন পাশাপাশি দাঁড় করানো ছিল। দু'টি প্লেনেই মেশিনগান ও হালকা কামান ফিট করা।

দীপক বললে—এ দু'টো নিশ্চয়ই চোরাই প্লেন। দস্যু ড্রাগন চুরি করে এখানে প্লেন রেডি করে রেখেছিল তার পালাবার পথ প্রশস্ত করে রাখার জন্যে। এবারে দু'টির মধ্যে একটিতে করে সে পলায়ন করল।

মিঃ গুপ্ত বললেন—এখন উপায়?

—উপায় হলো আমরা ওদের ফলো করব।

—এত রাতে?

—তাছাড়া উপায় কি?

—তা বটে।

সঙ্গে সঙ্গে দীপক ও মিঃ গুপ্ত প্লেনে উঠে বসল। দু'জন পুলিশ ও রতন চলল সঙ্গে।

দেখতে দেখতে দীপকদের প্লেন ছুটল আকাশ-পথে ড্রাগনকে অনুসরণ করে।

দু'টি প্লেন একটু পরেই মুখোমুখি এসে পড়ল। মুখোমুখি আসতেই ড্রাগনের প্লেন থেকে গুলি ছুটে আসতে লাগল।

খটা খট্—খটা খট্—

তীব্রবেগে দু'টি প্লেন থেকেই গুলি ছুটতে লাগল তারপর। বৃষ্টির ধারার মত গুলি বৃষ্টি হতে লাগল।

দীপক মিঃ গুপ্তের হাতে প্লেন চালাবার ভার দিয়ে নিজেই মেসিনগান ফায়ার করছিল।

অকস্মাৎ—

একটা গুলি গিয়ে ড্রাগনের প্লেনে এমনভাবে লাগল যে, সঙ্গে সঙ্গে তাতে আগুন ধরে গেল।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল।

দীপক বললে—আর বেশিক্ষণ ওদের মেয়াদ নেই।

এমন সময়—

হঠাৎ দেখা গেল দুটি মূর্তি যেন শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে।

দীপক দেখতে পেল একটা প্যারাসুট থেকে ড্রাগন শূন্যে লাফ দিয়েছে জ্বলন্ত প্লেন থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে।

আর ড্রাগনকে জড়িয়ে ধরে একই সঙ্গে নেমে যাচ্ছে তার প্রধান সহকর্মিণী।

নিচে গভীর জঙ্গল—ঝোপঝাড়।

দীপক বললে—ড্রাগন ঐ জঙ্গলে পড়লেই পালিয়ে যাবে। ওকে ধরতেই হবে।

দীপকও পিস্তল হাতে শূন্যে লাফ দিয়ে পড়ল।

ড্রাগনের প্লেনটা জ্বলতে জ্বলতে পুড়ে গিয়ে পড়ল অনেকটা দূরে একটা মাঠে।

দীপক, মিঃ গুপ্ত ও পুলিশবাহিনী তন্নতন্ন করে ড্রাগন ও তার সহকর্মিণীর সন্ধান করল।

কিন্তু তাদের কোথাও পাওয়া গেল না।

দীপক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—এত চেষ্টা করেও ড্রাগনকে পাওয়া গেল না, এটা বড়ই দুঃখের কথা।

মিঃ গুপ্ত কোনও উত্তর দিলেন না।*

ছদ্মবেশী ড্রাগন

।। এক।।

স্প্রে মেশিনের রহস্য

—খুব ভোরে উঠেই দীপক লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে হানা দিয়েছিল।

পুলিশ অফিসার আগে থেকে সব কিছু তৈরি করে রেখেছিলেন। তিনি বললেন—আপনি যা যা প্ল্যান করেছেন মিঃ চ্যাটার্জী, তা ঠিক কার্যকরী হবে ত? দেখবেন, শেষ মুহূর্তে যেন সব গোলমাল না হয়ে যায়?

দীপক হেসে বললে—না গোলমাল কিছু হবে না—হতে পারে না। রতনলাল ছদ্মবেশে বাড়ির ভেতরে বসে আছে। আমরা এগিয়ে গেলেই সে সিগ্‌ন্যাল দিয়ে আমাদের জানাবে।

—ঠিক আছে।

পুলিশ অফিসার মিঃ সেন, দীপকের কর্ম-পদ্ধতিতে খুশী হলেন।

পুলিশবাহিনী চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল। সময় কেটে চলল।

একটু পরে পর পর তিনবার জ্বলে উঠল লাল সেলোফোন লাগানো টর্চটা। দীপক বললে—ঐ সেই সিগন্যাল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশবাহিনী সদলবলে ঢুকে পড়ল মিঃ সান্যালের ঘরের

মধ্যে।

মিঃ সান্যাল তখন স্ত্রীর গলায় ওষুধ স্প্রে করবার জন্যে ওষুধ ভরছিলেন।

দীপক দৃঢ়কণ্ঠে বলল—এক্সকিউজ মি, মিঃ সান্যাল, ফর মাই বিহেভিয়ার। আপনি স্প্রে করবেন না। আর আপনার হাতের ঐ মেশিনটা আমরা সীজ করছি। আমরা ওটা টেস্ট করে দেখব।

মিঃ সান্যাল হাত থেকে মেশিনটা ফেলে দেবার চেষ্টা করলে, দীপক বললে—সাবধান, ওটা ফেলে দেবার চেষ্টা করলে গুলি চালাতে বাধ্য হবো। আর ওটা পরীক্ষা না করা পর্যন্ত, আপনি এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালাবার চেষ্টা করবেন না। এ বাড়িতে পুলিশ পাহারা থাকবে। পালাবার চেষ্টা করলেই পুলিশ অ্যারেস্ট করবে আপনাকে।

একজন কনস্টেবল এগিয়ে মিঃ সান্যালের হাত থেকে মেশিনটা কেড়ে নিল। হঠাৎ এভাবে পুলিশের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মিঃ সান্যাল যেন হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। এবার নিজেকে যেন ফিরে পেলেন। ধীরকণ্ঠে বললেন—কোন্ অধিকারে আপনারা এ বাড়িতে এসেছেন জানি না। দয়া করে চলে যান এ বাড়ি থেকে। আমার স্ত্রী অসুস্থ। আপনারা তাঁকে ডিসটার্ব করবেন তা আমি চাই না।

মিঃ সেন বললেন—জানি মিঃ সান্যাল, আপনি যে কিছুদিন বিলেতে ছিলেন—ব্যারিস্টারী পড়েছিলেন, কিন্তু আমরাও আইন নিয়ে নাড়াচাড়া করি। বে-আইনী কাজ আমরা করব কেন? এই দেখুন আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।

—ওয়ারেণ্ট?—ভ্রূ কুঁচকে বললেন মিঃ সান্যাল।

—হ্যাঁ। এতে আমাদের যা যা করবার অধিকার দেওয়া আছে, তাই আমরা করব। যাই হোক, আমরা এখন যাচ্ছি—আপনি পালাবার চেষ্টা করবেন না। পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করে থাকবে। পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করবে।

জুতোর আওয়াজ তুলে দীপক ও মিঃ সেন চলে গেলেন সেই স্প্রে মেশিনটা হাতে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তারা চাকরবেশী রতনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল—যাতে সান্যাল এই অ্যারেস্টের ব্যাপারে তার কোনও যোগসাজস আছে বলে সন্দেহ করতে না পারেন।

রতনের নাম ছিল এখানে বিলাস। বিলাস বললে—আমাকে গ্রেপ্তার করছেন কেন?

—কারণ, তুমি তোমার মনিবকে সহায়তা করেছ, সন্দেহ করা হচ্ছে।

দীপককে এই ঘটনা প্রথম যে লোকটি বলে, তার নাম হলো বিজয় দাস। বিজয় নানা কারণে জড়িয়ে পড়েছিল জটিল ঘটনাচক্রের মধ্যে।

সে-ই ত কৌতূহলবশে জড়িয়ে পড়ে একটি খুনের কেসের তদন্তে। অবশেষে সে মিঃ সান্যালের বাড়িতে সামান্য চাকরের কাজ পর্যন্ত নেয়।

মিঃ সান্যাল যে একজন সাংঘাতিক ক্রিমিন্যাল, তা বিজয় ভাল করেই জানতে পারে। সে তখন বাধ্য হয়ে দীপকের সাহায্য নেয়। দীপক তখন তার সহকারী রতনলালকে ছদবেশে বিজয়ের স্থলে চাকরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করে।

রতন ধীরে ধীরে তার তদন্তে এগিয়ে যায়। তার ফলে ক্রমশঃ সমস্ত ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যায়।

বিজয় এই ঘটনার প্রথম অংশের প্রধান সাক্ষী। একজন ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট, একজন পুলিশ সুপার ও দীপক ইত্যাদি বিশিষ্ঠ অফিসারদের সামনে যে স্টেটমেণ্ট লিপিবদ্ধ করিয়েছিল, তা এখানে হুবহু দেওয়া হলো। তা থেকেই ঘটনার প্রথম অংশটা পাঠক বুঝতে পারবেন—কি করে বিজয় সাধারণ একটি মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী হয়েও একটি খুনের কেসের তদন্তে জড়িয়ে পড়েছিল।

আর বিজয় যদি এই কাহিনীর মধ্যে জড়িয়ে না পড়ত। তাহলে হয়ত এ রহস্য ভেদ হতো না। দুটি নিরীহ নারীহত্যা ও আর একটি নারীহত্যার প্রচেষ্টা চিরদিনই থেকে যেতো রহস্যে আবৃত।

।। দুই।।

রহস্যজনক নারীহত্যা

বিজয়ের স্টেটমেণ্ট ঃ

—আমার নাম বিজয় দাস। আমার তিন কুলে কেউ নেই। মা-বাবা ছেলেবেলায় মারা গেছেন। আমি ছিলাম তাঁদের একমাত্র সন্তান । মামার বাড়িতে আমি মানুষ, মামাও মারা গেছেন।

মামা বেঁচে থাকতেই ম্যাট্রিক পাশ করি। তারপরে তিনি মারা গেলে, নানাভাবে কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকি। কখনো মুটেগিরি করে, কখনো চাকরি, কখনো খবরের কাগজ বিক্রি করে, কখনো বা জিনিস ফেরি করে, রেস্টুরেণ্টে কাজ করে ইত্যাদি নানাভাবে পয়সা রোজগারের চেষ্টা করতে হয় আমাকে।

এর মাঝে পড়াশুনাও চালাতে থাকি। ধীরে ধীরে আমি কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করি।

তারপর কোলকাতায় একটা মার্কেণ্টাইল ফার্মে শ-আড়াই টাকা মাইনের কেরানীর চাকরি যোগাড় করে নিই। মোটামুটি ভালভাবেই দিন কাটতে থাকে।

মধ্য কোলকাতায় একটা রাস্তার উপরে একটা মেসবাড়ির ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতাম। খাওয়া-দাওয়া ওখানেই করতাম। নিজের প্রয়োজনীয় খরচ চালিয়েও কিছু টাকা আমার উদ্বৃত্ত থাকত। সে টাকা দিয়ে আমি নানারকম খেয়াল

মেটাতাম। তাই দিন ভালই কাটছিল বলা যায়।

আমার মেসবাড়ির পাশ দিয়ে একটা ছোট্ট রাস্তা চলে গেছে। তার উল্টোদিকে একটা তিনতলা বাড়ি। তবে সে বাড়িটা মেসবাড়ির চেয়েও চকচকে, ঝকঝকে। আমি তেতালার যে ঘরে থাকতাম, তার ঠিক উল্টোদিকে ঐ বাড়িতেও একটা ঘর ছিল। জানালার ব্যবস্থা এমন যে, আমার ঘরটা থেকে ঐ ঘরের ভেতরের অনেক কিছুই দেখা যায়। তবে ও ঘর থেকে আমার ঘরের কিছু দেখা যায় না—বিশেষ করে জানালাটা একটু ভেজিয়ে রাখলে।

শুনেছিলাম ও বাড়িটা একটা ফ্ল্যাটবাড়ি। বিভিন্ন ঘর ভাড়া নিয়ে বিভিন্ন ঘর ভাড়া নিয়ে বিভিন্ন লোক থাকে ও-বাড়িতে।

প্রথম যেদিন আমি মেসের ঘরটা ভাড়া নিয়ে বাস করতে শুরু করলাম, সেদিনই ও-ঘরের দিকে নজর গেল। ও-ঘরের জানালার পর্দাটা সরানো ছিল। দেখলাম ঘরে একটি যুবতী চলাফেরা করছে। বয়স তার পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর হবে।

ওদিকে চোখে পড়তেই আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। তবে অকপটে বলছি, বেশ ভালও লাগল মেয়েটিকে। নিজের দুর্বলতার কথা কিছু বাদ দিয়ে বলব না—তাহলে ওই ঘটনাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আমার ঘরটা নির্জন। তা ছাড়া ও-ঘর থেকে আমার ঘরের ভিতরকার কিছু দেখা যায় না, তা আগেই বলেছি। তাই যুবতীটির লক্ষ্য করার কোন হেতু ছিল না। কয়েকদিন কাটলে আমি বুঝতে পারলাম যে, ও-ঘরে যুবতীটি একাই থাকে—আর কেউ থাকে না।

মেয়েটিকে খুব সুন্দরী বলা যায় না। তবে বেশ লাবণ্যময়ী। তার ওপরে স্বাস্থ্যও বেশ ভাল তার।

প্রথম দিন থেকেই কেন যেন আমার ভাল লাগলে মেয়েটিকে। শুধু ভালবাসা নয়—একটা দুর্নিবার আকর্ষণও অনুভব করলাম তার প্রতি। ঠিক প্রেম নয় বা কু-অভিপ্রায় কিছু নয়—মনে মনে তাকে যেন আমার অন্তরের বান্ধবীর আসনে বরণ করলাম।

তারপর এমন হলো যে, অফিসের কাজ সারা হয়ে গেলে, বাইরের কাজ শেষ করে মেসে ফিরে যতক্ষণ ঘরে থাকি ততক্ষণই ওর কাজকর্ম, চলাফেরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। আমি বুঝলাম যে, মেয়েটিও কোনও অফিসে চাকরি করে—হোটেলে খায়, রান্নাবান্না সে করে না।

পরিষ্কার সব দেখা যায় বলে, মনে কি খেয়াল হলো—একটা বাইনোকুলার কিনে আনলাম। মাঝে মাঝে তা দিয়ে মেয়েটিকে দেখতাম। তার দৈনন্দিন রুটিনও

যেন আমার মুখস্থ হয়ে গেল। কখন সে খেতে যায়, কখন লেখে বা পড়ে, কতক্ষণ বাইরের দিকে আনমনে তাকিয়ে থাকে সব জানতে পারলাম। হয়ত আমার কাজ অশালীন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমি যা করেছিলাম সব স্বীকার করছি।

তবে আমি ওর সঙ্গে আলাপ করিনি বা সে চেষ্টাও কখনো করিনি। ভাবতাম আমার এই বিশ্রী চেহারা নিয়ে কোনও সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে আলাপ করতে যাওয়াও বিসদৃশ।

আমি রোজ বিকেলে অফিস থেকে কিছু খাবার কিনে এনে মেসে চা-সহযোগে খেতাম। কিন্তু কখনো তাকে ঘরে কিছু খেতে দেখিনি। বুঝতাম অফিস শেষে সে খেয়ে বাড়ি ফেরে। আবার রাত্রে খেতে যায়। রোজ সন্ধ্যায় ফিরে ওর ঘর গুছিয়ে, প্রসাধন সেরে টেবিলে সে বসে কিছু লিখত বা পড়ত। তারপর ঠিক আটটায় বেরিয়ে যেতো।

মাঝে মাঝে আমি নিজেই তার উদ্দেশে চিঠি লিখতাম—আবার তা পরে ছিঁড়ে ফেলতাম।

একদিন বিকেলে হঠাৎ দেখলাম তার ঘরে একটি সুন্দর, ফিটফাট যুবক বসে আছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে যুবতী হেসে হেসে কথা বলছে।

মেয়েটির নাম আমি জানতাম না, কিন্তু আমার দুঃখময় জীবনে সে চাঁপা ফুলের সুবাস এনে দিয়েছে বলে, তাকে চম্পা বলে মনে মনে ডাকতাম। আমার দেওয়া ঐ নামেই তার কথা আমি বলছি।

যুবকটি চম্পার সঙ্গে অনেকক্ষণ কি যেন কথা বলল। হাত-পা নেড়ে কি যেন বোঝাল। তারপর চলে গেল।

সেদিন চম্পার উদ্দেশে আমার লেখা একটা চিঠি আমার ডায়েরীতে আছে। তা কাজে লাগবে বলে হুবহু তুলে দিচ্ছি।

প্রিয় বান্ধবী চম্পা,

"আজ তোমার যাওয়ার পথের ধারে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। তুমি একবার আমাকে দেখলে, তারপরে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত চলে গেলে। কাল তোমার ঘরে একজন যুবককে দেখলাম। জানি না সে তোমার কে? তোমাকে দেখে, তুমি যে আমার একান্ত চেনা হয়ে গেছো, তা ত জান না। তোমার গলার নিচে তিল, ডান হাতের জড়ুল চিহ্ন, এমন কি, তোমার হাতের লাল চুনীপাথর বসানো আংটিটা, সবই আমার একান্ত চেনাশোনা।"

এইটুকু থেকেই বুঝতে পারবে তখনকার আমার মনের অবস্থা।

থাক সেসব কথা, আসল কথায় আসি। এর ঠিক কয়েকদিন পরেই আমি সাতদিনের জন্যে চন্দননগরে বদলী হলাম। কোম্পানীর একটা বিশেষ কাজে

আমাকে যেতে হলো সেখানে।

সে সাতটা দিন চম্পাকে না দেখে যে, কি করে দিন আমার কাটল, তা ভগবান জানেন।

সাতদিন পরে চন্দননগর থেকে ফিরে এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে পাশের ঘরের দিকে চেয়ে দেখি, চম্পা সেখানে নেই। তার বদলে একজন বর্ষীয়সী মহিলা সেখানে আছেন। তাঁর সঙ্গে দু'টি ছেলে মেয়ে। চম্পার সেসব আসবাবপত্রও সে-ঘরে নেই। তার বদলে অন্য সব জিনিস।

বুঝতে পারলাম চম্পা ও-ঘর ছেড়ে চলে গেছে—নতুন কোনও ভাড়াটে এসেছে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

হয়ত ধীরে ধীরে এসব ঘটনা ভুলে যেতাম। কিন্তু পরদিন কাগজে এমন একটা সংবাদ দেখলাম যাতে সব কথা আমার মনে পড়ে গেল।

পরদিন কাগজের একটি কোণে খবরটা বের হয়েছিল ঃ—

"গতকাল ব্যাণ্ডেল স্টেশনে একটি খালি কামরার মধ্যে (ফার্স্টক্লাসে) দু'জন যাত্রী উঠে একটি পরিত্যক্ত পুঁটলি দেখতে পায়। কোনও যাত্রী সেটা ফেলে গেছে মনে করে, তারা স্টেশন কর্মচারীকে ডেকে সেটা দেখায়। পুঁটলিটি খুলে সকলে অবাক! সেটা একটা যুবতী নারীর ডান হাত—কাঁধ থেকে কাটা। সকলে আতঙ্কিত হল! হাতে একটি লাল জড়ুল চিহ্ন আছে—আর আছে আঙুলে একটা লাল পাথর বসানো আংটি। ঐ কামরাটা মিঃ ও মিসেস দত্ত এই নামে রিজার্ভ করা ছিল। রাস্তার মধ্যে তাঁরা যে কোথায় নেমে গেলেন কেউ জানে না—পুলিশের মতে, এটা একটা হত্যাকাণ্ড।"

এই খবরটার নিচে ছিল পুলিশের একটা বিজ্ঞপ্তি—"যদি কেউ হাতখানি সনাক্ত করতে পারেন, তিনি যেন তা ব্যাণ্ডেল পুলিশ স্টেশনে দয়া করে জানান।"

সংবাদটা পড়ে আমার মাথাটা যেন ঝিম-ঝিম করতে লাগল। এ নিশ্চয় চম্পার হাত। কিন্তু কে তাকে এভাবে হত্যা করল?

তক্ষুণি কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। অফিসে গিয়ে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে তিন দিনের ছুটি চাইলাম।

তিনি বললেন—হঠাৎ ছুটি কেন?

—আমার এক নিকট-আত্মীয় মারা গেছেন।

ম্যানেজার সহানুভূতি জানিয়ে ছুটি দিলেন। আমি চললাম ব্যাণ্ডেলের দিকে।

।। তিন।।

সেই কাটা হাতটা

ব্যাণ্ডেলে যে দৃশ্যটির সামনে আমাকে পড়তে হলো, তা যে কতটা মর্মান্তিক, তা ভাষায় অবর্ণনীয়।

একটা বিরাট কাঁচের জারের মধ্যে ফর্ম্যালডিহাইড দিয়ে ডোবানো ছিল সেই হাতটা— যে হাতটা দেখার জন্যে কতদিন বাইনোকুলার নিয়ে প্রতীক্ষা করে থাকতাম। আর দেখতে পাবনা ওই হাতের অধিকারিণী চম্পাকে।

চোখ দিয়ে অশ্রুবারি গড়িয়ে পড়ল। পুলিশ অফিসার বললেন—মহিলাটি খুব স্নেহের পাত্রী ছিলেন বোধ হয়?

কোনও মতে অশ্রু গোপন করে বললাম—হ্যাঁ।

—আপনি একে চিনতে পেরেছেন?

—হুঁ।

—তাহলে নাম-ধাম সব বলুন।

এবার আমি চিন্তিত হলাম। কি বলব? একটু চিন্তা করে বললাম—এর নাম আমি জানি না—আত্মীয়াও নয় আমার—তবে ভালভাবেই চিনতাম।

—সে কি কথা! যে রকম কেঁদে ফেললেন, তাতে তো মনে হয় না। ঠিকমত বলুন, লুকোবেন না কিছু।

—ঠিকই বলছি। এই তরুণী সেদিনও আমার সামনে চলাফেরা করেছে, আজ সে মৃতা—একথা ভেবে চোখে জল এলো। আমি নাম না জানলেও, যে বাড়িতে উনি থাকতেন, তা দেখিয়ে দিতে পারব।

—বেশ, সব কথা খুলে বলুন তাহলে।

সংক্ষেপে সব কথা বললুম তাঁকে। তবু অফিসার বললেন—আলাপ নেই, অথচ হাতটা দেখেই চিনতে পারলেন?

—আমার ঘরে গেলে সব বুঝতে পারবেন। এ হাত যে রোজ আমি দেখতাম।

কোলকাতা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি কোলকাতায় এলেন। আমি আমার ঘর বাইনোকুলার সব দেখিয়ে সকল কথা খুলে বললাম।

তিনি বললেন—ছিঃ ছিঃ! বিয়ে-থা করেননি—বাইনোকুলার দিয়ে অপরিচিতা মেয়েছেলে দেখেন? যাক সেকথা, আপনি দেখতেন বলেই তদন্তের সূত্র পেলাম। কিন্তু এরকম আর করবেন না। চলুন ও বাড়িতে যদি কিছু সূত্র মেলে।

লোকে সত্যিই আমার এই আচরণকে বিশ্রী ভাবতে পারে। কিন্তু কোন রকম হ্যাংলামি বা কু-উদ্দেশ্য যে ছিল না আমার তা কে বুঝবে? হয়ত তার সঙ্গে

আমার পূর্বজন্মের কোন সম্পর্ক ছিল—কে জানে?

পুলিশ অফিসার পাশের বাড়িতে গেলেন। পুলিশ দেখে বাড়িওয়ালা ঘাবড়ে গেলেন। তবে তিনি সব শুনে আশ্বস্ত হলেন। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন যে, মেয়েটি একটি অফিসে চাকরি করত। সে প্রায় তিন বছর ঐ ঘরটা ভাড়া নিয়ে বাস করছিল। বাড়ির অন্য ভাড়াটে বা বাড়িওয়ালার সঙ্গে কখনো আলাপ করত না। বাড়ির কারও সঙ্গে বেশি মিশতও না। তবে দু'চার মাস পর পর একজন যুবক তার কাছে আসত, তাছাড়া আর কেউ আসত না। যুবকটিও দু'এক ঘণ্টা থেকে চলে যেতো।

মেয়েটির নাম বিনীতা ঘোষ—এই নামেই সে ভাড়া দিত। সে নিয়মিত ভাড়া দিত। বাড়ি ছেড়ে দেবার দিন দশেক আগে জানিয়েছিল যে, সে চলে যাবে। একথা শুনে বাড়িওয়ালা নতুন ভাড়াটে ঠিক করে ফেললেন।

নির্দিষ্ট দিনের আগের নামিয়ে তাতে তোলে। যুবকটি ঠেলাওয়ালাকে বলেছিল হাওড়া স্টেশনে যেতে—এটুকু বাড়িওয়ালা শুনেছেন।

পরদিন মেয়েটি একাই চলে যায়। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে সে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেয়। সে যে কোথায় যাচ্ছে তা বলেনি—বাড়িওয়ালা ও বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসাও করেননি। সে চলে যাবার পর, ঘরে চুনকাম করা হয়—নতুন ভাড়াটে আসে।

সব শুনে অফিসার বললেন—নতুন ভাড়াটে যখন এসে গেছে তখন ঘর থেকে কোন সূত্র আর মিলবে না নিশ্চয়।

আমি বললাম—তবু ঘরটা দেখা দরকার।

নতুন ভাড়াটের অনুমতি নিয়ে ঘরটা দেখলাম। প্রশ্ন করলাম—এ ঘরে কোনও কাগজপত্র বা চিঠিপত্র পাওয়া যায় নি?

—কি জানি—চাকর ঘর ঝাঁট দিয়ে সব ফেলে দেয় ঐ ঝুড়িতে। থাকতেও পারে কিছু পেলাম না আমরা। দেখে মনে হলো, ঐ দুটো টেবিল পাতা ছিল। আর কিছুই মিলল না।

পুলিশ অফিসার আমার দিকে চেয়ে ঠাট্টা করে বললেন—নিয়ে যান। এ দুটো। এতে হয়ত তাঁর হাতের পরশ পাবেন।

লজ্জা পেলেও কাগজ দুটো ফেললাম না। ভাঁজ করে নিয়ে এলাম বাড়িতে। এনে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

সারা দুনিয়াটা যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হলো আমার। ঘরে ফিরে ঐ কাগজ দুটো আপন মনেই নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

হঠাৎ কাগজের ভাঁজের মধ্য থেকে একটা পোস্টাল খাম টুপ করে আমার

সামনে পড়ল। খামটা তুলে নিয়ে দেখলাম, তার মুখটা আটকানো। বুঝতে পারলাম ভেতরে চিঠি আছে। উপরে ঠিকানা লেখা—কিন্তু তা ডাকে দেওয়া হয়নি।

ঠিকানা লেখা ঃ শ্রীঅনিমেষ সান্যাল। C/O পোস্টমাস্টার, ভদ্রা; জেলা মুঙ্গের, বিহার।

উত্তেজনা ও কৌতূহলে মন পূর্ণ হলেও চিঠিটা নিয়ে কি করব ভাবতে লাগলাম।

চিঠির সূত্র ধরে রহস্য হয়ত বের হতে পারে। তাই সেটা টেবিলে রেখে ভাবতে লাগলাম, কি করি। অনেক ভেবে জল দিয়ে আঠাটা ভিজিয়ে চিঠিটা খুললাম। খুলে দেখি নিচে সই—তোমারই বিনীতা।

চিঠিটা পড়ে অনেক কিছু জানতে পারলাম। প্রথমেই সম্বোধন ঃ—প্রিয়তমেষু অনিমেষ,—

সবটা পড়ে বুঝলাম বিনীতা বিবাহিতা, তবে সেই বিবাহ বোধ হয় অসামাজিক ছিল—কারণ বিনীতার উপাধি ঘোষ, সে কায়স্থ। তার স্বামী সান্যাল, সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণ। স্বামী কোনও স্থানে অজ্ঞাতবাস করছিলেন—চিঠি যথাস্থানে পৌঁছত পোস্টমাস্টার মাধ্যমে।

বিনীতা ঠিকানা জানে না—জানলে নিশ্চয় যেতো। সে অনুনয় করে লিখেছে—তাতে ছিল হৃদয়ের আকুতি মাখানো।

বুঝতে পারলাম, চিঠিটা পোস্ট করার আগেই স্বামী এসেছিলেন—তাই সেটা পোস্ট করা আর হয়নি। সেটা টেবিলের নিচে কাগজের ভাঁজে রেখে দিয়ে ছিল।

।। চার ।।

ভদ্রায় তদন্ত

চিঠিটা হাতে নিয়ে আমি আকাশ-পাতাল ভাবতে শুরু করে দিলাম। কি করি? কিভাবে এ কেসে আমি এগোব? তার চেয়ে পুলিশকে চিঠিটা দেওয়াই ভাল।

কিন্তু পুলিশ আগ্রহ নিয়ে তদন্ত করবে কেন? কি তাদের স্বার্থ? তারা ভদ্রার পোস্টমাস্টারকে প্রশ্ন করলে তিনি হয়ত বলবেন, অনিমেষ সান্যালকে চেনেন না। ব্যস্—সব শেষ।

মনে হলো চম্পা এসে যেন দাঁড়িয়েছে আমার ঠিক সামনে। মৃত্যুপাণ্ডুর মুখে আমার দিকে চেয়ে সে যেন কি মিনতি জানাচ্ছে। সকরুণ একটা আকুতি।

মনে মনে ঠিক করলাম, অপরাধীকে যেমন করেই হোক ধরতেই হবে।

অনেক চিন্তা করলাম। সারারাত ভেবে একটা প্ল্যান ঠিক করলাম। অনেক ঝঞ্ঝাটের পর আমি ভদ্রা গ্রামের উদ্দেশে রওনা হলাম।

স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে যেতে হয় প্রায় ছয় মাইল পথ। বিহারের গ্রাম্য পথের ধুলোয় আমার সারা অঙ্গ ধূসর হয়ে উঠল। তবু আমি দৃঢ় সংকল্প অটুট। যে করেই হোক, ভদ্রা পোস্ট অফিসে আমায় হাজির হতেই হবে।

আমার হাতে ছিল একটা রেডিও কোম্পানীর টাইপ করা চিঠি। তাতে লেখা ছিল ঃ—

মিল্টন রেডিও মার্ট
১৬/২২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা।

সবিনয় নিবেদন,

প্রিয় মিঃ সান্যাল, আপনার স্ত্রী বিনীতা দেবী দিন কুড়ি আগে আমাদের দোকানে এসে একটা স্পেশাল সেট (ইলেকট্রিক ও ট্রানজিস্টার কম্বাইণ্ড সেট) রেডিও তৈরির অর্ডার প্লেস করেন। তিনি পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম দেন। ঐ সেট তৈরি হয়ে গেছে। তৈরি হলে তিনি আপনার ঠিকানায় চিঠি লিখতে বলেছিলেন। আপনি অনুগ্রহ করে চারশো টাকা দিয়ে মাল ডেলিভারী নেবেন। ইতি—

নীচে ছিল একটা হিজিবিজি সই। খামটার মুখ খোলাই ছিল। চিঠিখানা পোস্টমাস্টারকে দিয়ে বললাম—অনুগ্রহ করে বলবেন এই চিঠির মালিকের বাড়ি কোন্ দিকে? চিঠিটা খুব জরুরী।

পোস্টমাস্টার আমার মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাইলেন। তারপর বললেন—এ চিঠি কে পাঠাল?

বুঝলাম, এ ধরনের চিঠি যাতায়াত হলেও চিঠি হাতে লোক এই প্রথম এলো।

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম—আমাদের কোম্পানী পাঠিয়েছে। তাঁর একটা অর্ডারের জবাব এই চিঠি।

পোস্টমাস্টার একটু ভেবে বললেন—মিঃ সান্যাল কোথায় থাকেন তা জানি না। চিঠিপত্র এলে তিনি নিজে এসেই তা নিয়ে যান।

—তিনি কি রোজ আসেন এখানে?

—সেটা তাঁর ইচ্ছা। সাধারণতঃ দু'তিন দিন পর পর আসেন।

—খুব জরুরী থাকলে কি হয়?

—লোক পাঠানো হয়। —বলেই তিনি নিজেকে সংযত করে বললেন—তাঁর জরুরী তিনি বোঝেন। যেদিন তিনি আসবেন, এটা পাবেন। না এলে পড়ে থাকবে।

—তবে ত আমার আসাই নিরর্থক হলো।

—তা ত বটেই। ডাকে এলেও যা, লোক এলেই তাই। যাক, চিঠি রেখে যান।

তিনি যেদিন আসবেন, তাঁকে আপনার কথা বলে চিঠি দেব। পোস্টমাস্টার এবার তাঁর নিজের কাজে মন দিলেন। আমি নমস্কার করে বেরিয়ে এলাম।

পোস্টমাস্টার নিজের অজ্ঞাতেই বলেছিলেন, লোক পাঠানো হয়—তা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। লোক নিশ্চয় পাঠানো হবে। তাই পোস্ট-অফিসের উল্টোদিকে একটা খাবারের দোকানে ঢুকে, হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসলাম।

চেয়ারে বসে জলযোগ করতে করতেও নজর আমার ছিল পোস্টমাস্টারের জানালার দিকেই। চারটে বড় বড় রসগোল্লা ও দুটো লেডিকিনি খেয়ে জল খেলাম। তারপর সিগারেট টানতে লাগলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা লোক ঢুকল পোস্ট অফিসে। সে পোস্টমাস্টারের জানালায় গেল। তিনি তাকে চিঠিটা দিয়ে কি সব বললেন। লোকটা চিঠিটা নিয়ে বেরিয়ে এলো। আমিও খাবারের দাম মিটিয়ে দিয়ে কাঁধে আমার ছোট ঝোলটা নিয়ে লোকটাকে ফলো করলাম।

লোকটা বাজার পার হয়ে গ্রামের পথ ধরল।

লোকটা চলতেই লাগল। আমি একটু আগে প্রায় ছয় মাইল হেঁটে এসেছি—আবার হাঁটা! ক্লান্ত হয়ে পড়লাম খুব। প্রায় তিন মাইল পথ চলার পর একটা ছোট মহকুমা শহরে পৌঁছলাম। সেই শহরের অনেক পথ পার হয়ে, একটা নির্জন গলিতে একটা পুরানো বাড়ির সামনে সে দাঁড়াল।

সদর দরজা বন্ধ ছিল। লোকটা কড়া নাড়তে লাগল। একটু পরে দোতলার জানালা খুলে একটি যুবক তাকে দেখল। তারপর নিচে নেমে এসে দরজাটা খুলে দিল।

আমি ততক্ষণে পাশের বাড়ির রোয়াকে দাঁড়িয়ে, অন্যমনস্কতার ভান করে সব লক্ষ্য করতে লাগলাম।

যে যুবকটিকে আমি দোতলায় দেখলাম তাকে দেখেই চিনলাম। এ-ই বিনীতার স্বামী; একে আমি চিনি।

যুবকটি দরজাটা খুলে বললে—এটা যে এনেছে, সে কোথায় গেল।

লোকটা বললে—মাস্টারসাহেব তাকে ভাগিয়ে দিয়েছেন অনেকক্ষণ। বলে দিয়েছেন, আমি মিঃ সান্যালের বাড়ি চিনি না। তিনি নিজে এসে চিঠি নিয়ে যান।

—ভালই হয়েছে। এই নাও বকশিশ। মাস্টারসাহেবের পাওনা আমি গিয়ে দিয়ে আসব।

চিঠিটা পড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে, সে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। একটু পরে সাইকেল নিয়ে আবার যেন কোথায় বেরিয়ে গেল সে।

সে চলে গেলে একটি যুবতী এসে দরজা বন্ধ করে দিল। যুবতীর কপালে দেখলাম সিঁদুর। তাহলে সে বিবাহিতা। ও কি তবে অনিমেষ সান্যালের দ্বিতীয়া স্ত্রী! আশ্চর্য!

।। পাঁচ।।

সরল সন্ধান

আমার প্রাথমিক তদন্ত এখানেই শেষ হলো।

তারপর আমি চলে এলাম কোলকাতায়। মোটামুটি যে-ক'টি বিষয় জানতে পারলাম, তা থেকে মনে হলো এই যে, বিনীতা হত্যার রহস্য লুকিয়ে আছে ঐ অনিমেষ সান্যালকে ঘিরে। আমি তখন প্ল্যান ঠিক করে অফিসে দু'মাসের ছুটি নিলাম। নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সেই ভদ্রা শহরের উদ্দেশ্যে।

আমার মুখের দাড়ি কাটা হয়নি। পরনে সস্তা ধুতি ও হাফশার্ট। পায়ে টায়ারের স্যাণ্ডেল। চেহারার সঙ্গে পোশাক ঠিক মানিয়ে গেল। সান্যালের বাড়ি এসে কড়া নাড়লাম।

একটু পরেই সান্যাল নিজে দরজা খুলে দিল। ভাল করে দেখলাম, লোকটা বেশ চালবাজ—তার ওপরে সুপুরুষ। প্রশ্ন করল—কি চাই?

নমস্কার জানিয়ে বললাম—আমাকে চাকর রাখবেন?

—রাখতে পারি। দেশ কোথায়?

—হুগলী জেলার বীরপুর গ্রাম। নাম বিজয় দাস।

—এদিককার কোনও লোককে চেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। চাকরির খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি। কোলকাতায় অনেক বাড়িতে চাকরি করেছি। কোলকাতার একজন ভদ্রলোক এখন এই শহরে থাকেন। তিনি আমাকে চেনেন। বলা বাহুল্য ঐ শহরের একজন ভদ্রলোককে আমি আগেই বলে রেখেছিলাম।

—কি কি কাজ জান?

—সব কাজ। রান্নাবান্না অবধি জানি।

—আমার স্ত্রী অসুস্থ—সব কাজ চালাতে পারবে তুমি। দুজন মাত্র লোক।

—নিশ্চয়ই পারব বাবু।

—কত টাকা মাইনে চাও?

—যা হয় দেবেন।

—যদি কুড়ি টাকা আর খাওয়া দিই?

—তাই দেবেন।

ভেতরে গেল সান্যাল। স্ত্রীকে ডাক দিল—রমা। এদিকে এসো দেখো এ সব কাজ পারবে কিনা?

রমা বেরিয়ে এলো। বললে—কাজ জানে যখন, তখন পারবে নিশ্চয়।

কাজে লেগে গেলাম। আমি কোলকাতা ইউনিভারসিটির এম. এ. পাশ হয়ে, করতে লাগলাম সামান্য চাকরের কাজ। ভাবলাম, সবই অদৃষ্ট।

আমি দিনে দিনে ওদের খুব বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠলাম। বাজারের হিসাব পাই-পয়সা পর্যন্ত মিটিয়ে দিই। কর্ত্রী রান্নাঘরে বা বাথরুমে গয়না ফেলে গেলে, আমি তা খুঁজে এনে দিতাম। আমার কাজকর্মে এরা খুব সন্তুষ্ট হলো।

প্রথম প্রথম শোবার ঘরে যেতে দিত না—পরে সে ঘরে যেতাম। সেখানে ক'টি জিনিস দেখেই অবাক হলাম। চিনতে পারলাম, সেগুলো বিনীতার জিনিস। একটা ট্রাঙ্ক, একটা খাট আর একটা সেতার—সব বিনীতার।

কর্তা বাড়ি থেকে বেশি বের হন না—কিন্তু যেদিন যান, তিন-চার দিন ফেরেন না।

রমা বলে—ব্যবসা দেখাশোনা করতে যান তিনি।

একদিন কর্তা না থাকলে রমাকে বললাম—বৌদি, এটা সেতার না?

—হ্যাঁ।

—এর আওয়াজ খুব মিষ্টি। কোলকাতায় এক বাড়িতে কাজ করতাম। দিদিমণি বাজাতেন, আপনি বাজান না?

—আমি বাজাতে জানি না, গানও জানি না।

—তবে কি বাবু গান করেন?

—না। এটা আমাদের জিনিস নয়। গত দু'মাস হলো এসেছে। বাবুর এক দিদি ছিলেন, তিনি মারা গেছেন। এটা তাঁর জিনিস ছিল। ঐ খাট, ট্রাঙ্কও তাঁর।

—বাবুর দিদি তাহলে সৌখিন ছিলেন খুব?

—হ্যাঁ। তাই ত শুনেছি, টাকাপয়সা ছিল, গয়নাও ছিল অনেক।

আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে, হয় সান্যাল নিজে না হয় তার লোক বিনীতাকে খুন করেছে, সুপরিকল্পিত খুন। তাকে নিয়ে আসবে বলে, আগে সব জিনিসপত্র 'বুক' করে দিয়েছে। তারপর ট্রেনে তাকে খুন করেছে।

কিন্তু কেন খুন করল? রমা ত বিনীতার চেয়ে সুন্দরী নয়। তা ছাড়া সে অশিক্ষিত' -গরীবের মেয়ে। তাহলে বিনীতা থাকতে সান্যাল রমাকে বিয়ে করল কেন রমার বাবার কাছে সে বেশি কিছু নেয়নি। তিনি বাংলার এক জেলার ন্য স্কুল মাস্টার। ট্রেনে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। সান্যাল বিনা পণে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করে দয়াপরবশ হয়ে।

বুঝলাম রহস্যের মূল আরো গভীরে।

তবে হাল ছাড়লাম না।

সন্ধান চালাতে লাগলাম। মন বলল—একদিন-না একদিন ঠিক সব বের

করতে পারব। কিন্তু যদি তা বের করি পুলিশে যাব না। যাব এমন একজনের কাছে, যিনি সব শুনে প্রকৃত তদন্তে হাত দেবেন।

এই সন্ধানের ভেতর দিয়েই এগিয়ে চলল দিনগুলি।

।। ছয়।।

আর একটি হত্যার প্রচেষ্টা

ইতিমধে হঠাৎ রমার একদিন জ্বল হলো। শহরের একজন নামকরা ডাক্তারকে ডাকা হলো। নাম তাঁর বিনায়ক শর্মা। তিনি রুগী দেখে বললেন—ঠাণ্ডা লেগে জ্বর। ইনফ্লুয়েঞ্জা উইথ ব্রঙ্কাইটিস।

সান্যাল খুব উদ্বিগ্ন হয়ে বললো—তবে ত খুব সাংঘাতিক রোগ।

ডাঃ শর্মা হেসে বললেন—না, রোগ কিছু কঠিন নয়! তবে যে কোনও রোগেরই ত কমপ্লিকেশন হতে পারে।

ঔষধের প্রেসক্রিপশন নিয়ে তিনি চলে গেলেন। আমি রোজ ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ আনতাম। খাওয়ানো হতো রোগিণীকে।

ক'দিনেই জ্বর ছেড়ে গেল।

কিন্তু দিন তিন-চার পরে হঠাৎ একদিন রমা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

ডাক্তার এলেন। ভাল করে তিনি রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, তাই ত, হার্ট বড় দুর্বল। ওষুধ ঠিক করে দিচ্ছি।

সান্যাল দেখলাম রোগীর খুব সেবা করে।

ক'দিন কাটল। উন্নতি হলো না। ডাঃ শর্মা তখন বললেন—একজন হার্ট স্পেশালিস্টকে দেখালে ভাল হয়—তাই না?

আমি মাঝে মাঝে পথ্য বা নানা জিনিস নিয়ে রোগীর ঘরে আসি।

একদিন দেখি সান্যাল তাকে দুটো ওষুধের পুরিয়া খেতে বলছে।

রমা বললে—না, খাব না। এটা খেলে অসুখ বাড়ে।

পরদিন দেখলাম, পুরিয়াটা দেবার আগে সান্যাল একটা শিশি থেকে কিসের যেন বড়ি বের করে পুরিয়াটার সঙ্গে ওষুধটা মিশিয়ে দেয়। একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলাম সে বড়ির শিশির গায়ে লেখা—ডিজিটক্সিন।

আশ্চর্য হলাম। এরকম ওষুধ ত আমি আনি না কখনো, ডাক্তারবাবুও দেননি।

এদিকে হার্ট স্পেশালিস্ট এসেছেন দু'জনে মিলে পরীক্ষা করে ওষুধ দিলেন।

তবুও রোগী সেরে উঠছে না। তবে কি সান্যাল রমাকেও শেষ করতে চায়? কিন্তু কেন? কি তার স্বার্থ?

পরদিন ওষুধ আনতে গিয়ে ডাঃ শর্মাকে প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ডিজিটক্সিন কি হার্টের ওষুধ?

ডাঃ শর্মা বললেন—তা বটে, তবে সবক্ষেত্রে তা নয়। কিন্তু একথা কেন?

আমি লজ্জিতভাবে বললাম—আমাদের পাড়ার এক হাতুড়ে ডাক্তার বৌদির হার্টের রোগ আছে শুনে বললেন—রোগিণীকে ডিজিটক্সিন দেওয়া হচ্ছে কিনা?

ডাঃ শর্মা বললেন—তোমার বৌদির যে অসুখ তাতে ও ওষুধ খেলে রোগ বেড়ে যাবে, মরে যেতেও পারে। এটা হার্টের রেট কমিয়ে দেয়। হার্টের রেট বেড়ে গেলে আমরা এ ওষুধ দিই। কিন্তু তোমার বৌদির হার্টের গতি এমনিতেই মৃদু—ও খেলে সর্বনাশ হবে।

—না না, চিকিৎসা আপনি করছেন, আমরা অন্যের কথা শুনব কেন? আচ্ছা, সুস্থ কোনও লোক যদি এটা খায় তবে কি হবে?

—তা খেলে হার্টের গতি মৃদু হয়ে যাবে। এসব তুমি বুঝবে না, তবে সুস্থ লোকের পক্ষেও এটা বিষ।

ডাক্তারখানা থেকে ফেরবার পথে ভাবলাম—আর একটা মানুষ মারার চেষ্টা হচ্ছে বোধ হয়। কিন্তু রমা মরলে সান্যালের কি লাভ? বিনীতা হত্যা-রহস্য উদ্ঘাটন করতে এসে একি সমস্যায় পড়লাম।

বড় ডাক্তার এসে দেখার পর ধীরে ধীরে রমা যেন অনেকটা ভাল হয়ে উঠল।

দু'দিন আগে একটা চিঠি এসেছিল—পোস্ট অফিসের মাধ্যমে। দেখলাম সান্যাল সেটা নিয়ে যেন খুব উদ্বিগ্ন। ইতিমধ্যে আমি তার খুব প্রিয় ও বিশ্বাসী হয়ে উঠেছি।

আমি তাই গোপনে একদিন বললাম—আচ্ছা বাবু ক'দিন থেকে আপনি যেন কি একটা বিষয়ে চিন্তা করছেন।

—ব্যাপারটা হলো কি, হঠাৎ বিনীতা লটারীতে পনেরো হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছে। দু'দিন হলো চিঠি পেয়েছি। আমার কেয়ারে ঠিকানা দেওয়া ছিল।

—বিনীতা কে বাবু?

—সে ছিল আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। অফিসে কাজ করত। আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়। তার কিছুদিন পরে সে মারা যায়। রমা অবশ্য এসব জানে না। লটারীর টিকিট কেনার পরে সে মারা গেছে শুনেছি। এখন এই টাকাটার কি করা যায় ভাবছি।

—তাঁর টিকিটটা নেই?

—না। এমন কি কোথায় রাখে তাও জানি না যে, টিকিটের খোঁজ করব।

আমি বললাম—আমি সামান্য লোক। দেখি, ভেবে চিন্তে কোনও উপায় বের করা যায় কিনা।

—আমি লক্ষ্য করেছি, তুমি খুব বুদ্ধিমান। দেখ ত, কোনও পথ বের করতে পার কিনা।

ভেবে-চিন্তে মনে মনে প্ল্যান ঠিক করলাম। এবার সান্যালের প্রিয়-পাত্র ও বিশ্বাসী হওয়া যাবে—আর সব ব্যাপারটা যথাস্থানে জানাব।

পরদিন প্ল্যানটা তাঁকে বললাম। তিনি সব শুনে বললেন—বাঃ খাসা প্ল্যান।

আমি বললাম—এতে দুই হাজার টাকার কাছাকাছি খরচ হবে। বাকী টাকাটা বেরিয়ে আসবে। আপনি যদি বিশ্বাস করে, দু'হাজার টাকা আর একশো টাকা রাহাখরচ দেন, আমি ব্যবস্থা করতে পারি।

সান্যাল টাকা ও ছুটি দিল। আমি বেরিয়ে পড়লাম কোলকাতার দিকে।

কোলকাতায় এসে আমি আমার এক পরিচিত সহকর্মীর বাসায় উঠলাম। বললাম যে, বর্তমানে আমি বিহারে চাকরি করছি। মনিবের স্ত্রী মারা গেছে। তার নামে লটারীর টিকিট উঠেছে, টিকিটটা পাওয়া যাচ্ছে না। এখন কিছু টাকা পেয়ে তার স্ত্রীকে যদি বিনীতা ঘোষের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে টাকা ক্লেম করা যায়, তা হলে লটারী কোম্পানী নোটিশ দেবে। টাকাটা অন্য কেউ দাবি করবে না—কারণ সত্যিই ত বিনীতা ঘোষ মৃতা। তখন আমরা গিয়ে টাকাটা তুলে আনব। মনিব খুশী হবে। তোমারও কিছু প্রাপ্তি হবে।

বন্ধু বললে—কোনও রিস্ক নেই ত?

—কিছু না। মাঝখান থেকে তুমিও এক হাজার টাকা পাবে।

—আরেকটু বেশি কর তুই।

—না, বড়জোর দেড়। কারণ কোন রিস্ক নেই। আর এটা মনিবের টাকা।

বন্ধু রাজী হলো। আমি আমার কর্মপন্থা ধরে এগিয়ে চললাম।

পরদিন গেলাম ব্রেবোর্ণ রোডে লটারী অফিসে! সব শুনে অফিসের ম্যানেজার বললেন—আমরা তিন সপ্তাহের নোটিশ দেব। পর পর তিনটি ইন্‌সারশান খরচ হবে আপনাদের।

আমি বললাম—তা ত হবেই।

ম্যানেজারের ঘর থেকে এলাম কেরানীদের ঘরে। একটি কেরানীকে দশটা টাকা দিয়ে বললাম—বিনীতা ঘোষের যে টিকিট প্রাইজ পেল, সেটা কোন এজেন্ট বিক্রি করেছিলেন জানেন?

এজেন্টের নাম ঠিকানা পেলাম। ভদ্রলোকের নাম অরবিন্দ বিশ্বাস। তিনি থাকেন বেহালা অঞ্চলে। রাস্তার নাম ও বাড়ির নম্বর টুকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

।। সাত।।

দীপক সমীপে

ঘটনার গতি যখন এগিয়ে এসেছে এবং যখন বুঝতে পারলাম যে আর একটি নারীহত্যার ষড়যন্ত্র চলছে, তখনই আমি বাধ্য হয়ে আমার ইঙ্গিত লোক—প্রখ্যাত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর শরণাপন্ন হলাম।

তিনি আমার এতদিনের ইতিহাস সব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।

শুনে বললেন—আমি ত খুব ব্যস্ত। আমার সহকারী রতনলালকে আপনার সাহায্যের জন্যে দিচ্ছি। সে আপনার ভাই সেজে ওখানে থাকবে। এদিকে খবরও সব নেবে। প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবে।

আমি পরদিন রতনবাবুকে নিয়ে বের হলাম। লটারী কোম্পানীর নোটিশ ততদিনে বের হয়েছে। আমিও তিন সপ্তাহ সময় পেয়ে গেলাম।

পরদিন রতনবাবুকে নিয়ে গেলাম বেহালায়, অরবিন্দবাবুর ঠিকানায়। দেখলাম ভদ্রলোক বেশ অভাবগ্রস্ত। তাঁকে রতনবাবু প্রশ্ন করলেন—বিনীতা দেবী যে পনেরো হাজার টাকা পেয়েছেন, তাতে আপনি কত পাবেন?

—টেন পারসেন্ট। অর্থাৎ পনেরো শো। আমার জীবনে এটাই সবচেয়ে বেশি পাওয়া।

আপনি ওকে কোথায় টিকিট বিক্রি করেন?

—ঠিকানা ত ছিল স্বামীর—ভদ্রা গ্রামে। তিনি একটা অফিসে কাজ করতেন। শুনেছি চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বামীর কাছে চলে গেছেন।

—কোন্ অফিসে কাজ করতেন?

বেণ্টিক স্ট্রীটে, ২৩ নম্বর বাড়ির দোতলায় অফিসটা—"রিজেন্ট প্রসেস।"

—ধন্যবাদ তাঁর হাতে দশটা টাকা দিয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা।

পরদিন গেলাম বিনীতার অফিসে। ম্যানেজারকে রতন পরিচয় দিয়ে বললে—বিনীতা মার্ডার কেসের তদন্তে এসেছি।

আশ্চর্য। চার মাস আগে সে ছুটি নিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি। তাকে মার্ডার করা হয়েছে?

—আচ্ছা চাকরি পাবার সময় তার যে ডিগ্রীর সার্টিফিকেট দিয়েছিল, তার কপি আছে? সেগুলো দেখতে চাই।

জানা গেল যে, বিনীতা ম্যাট্রিক পাশ করেছিল চন্দপুর গার্লস স্কুল থেকে। সেটা হাওড়া জেলায়। তারপর সে কোলকাতায় বেথুন কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করে। তখন বাধ্য হয়ে চন্দনপুর রওনা হলাম আমি আর রতনবাবু।

চন্দনপুর পৌঁছে সেখানকার গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করলাম

আমি আর রতনবাবু।

হেডমিস্ট্রেস্‌কে আমি বললাম—আমরা লালবাজার থানা থেকে আসছি বিশেষ জরুরী কাজে।

—কি ব্যাপারে?

—আপনাদের স্কুল থেকে বিনীতা ঘোষ নামে একটি মেয়ে পাশ করেছিল। তার বিষয়ে কিছু জানতে চাই। তার বাড়ির ঠিকানা কি তাও জানাবেন দয়া করে।

তিনি বললেন—সত্যি খুব ভাল মেয়ে ছিল বিনীতা। লেখাপড়ায়, গানবাজনায়—সব দিকেই বেশ ভাল ছিল—ব্যবহারও ছিল খুব সুন্দর। তার বাবার নাম হরেকৃষ্ণ ঘোষ। তিনি থাকেন এখানেই—আজও বেঁচে আছেন।

—বিনীতা এখান থেকে চলে গেল কেন?

—অনিমেষ সান্যালের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়—ও তাকে বিয়ে করতে চায়। বাবা-মা মত দেন না। তাই হয়ত কোনও গোলমাল হয়। বিয়ে করেই স্বামীর সঙ্গে চলে যায় কোলকাতায়। সেখানে বোধ হয় চাকরি করত। এর বেশি কিছু জানি না।

নমস্কার জানিয়ে আমরা চললাম হরেকৃষ্ণ ঘোষের বাড়ি। কড়া নাড়তেই একটি মেয়ে দরজা খুলে দিল। চেহারা দেখে মনে হল, বিনীতারই ছোট্ট বোন। রতনবাবু বললেন—হরেকৃষ্ণ বাবু আছেন?

—আছেন।

—তাঁকে একটু ডেকে দেবেন?

—দিচ্ছি, আপনারা ঘরে এসে বসুন।

মেয়েটি ভেতরে চলে গেল। সামনের ঘরে ফরাস পাতা। দেওয়ালে ঠাকুর দেবতা, সাধু-সন্ন্যাসীর ছবি। মধ্যবয়সী একজন ভদ্রলোক ঢুকলেন। বললেন—আমি হরেকৃষ্ণ ঘোষ! কোত্থেকে আসছেন আপনারা?

—আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম। মাফ করবেন? কিন্তু আমার কথাগুলির উত্তর ঠিকমত দেবার চেষ্টা করুন। বিনীতার বিষয়ে কিছু বলতে হবে।

বিরক্ত হলেন তিনি। বললেন—বিনীতাকে আমি চিনি না। সে আমার কেউ নয়।

আমি বললাম—আপনার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি, তা জানি। মিথ্যা বলবেন না। আমরা পুলিশের লোক।

—পুলিশ! তা এখানে কেন?

—বিনীতা মারা গেছে। সে মৃত্যুও স্বাভাবিক নয়। তাই—

—বিনীতা যদি মরে গিয়ে থাকে, ত সে বেঁচে গেছে। সে বিষয়ে করণীয় কিছুই নেই।

—দেখুন, তা বলে এ বিষয়ে কোনরকম তদন্ত না করে, আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। আমাদের ধারণা অনিমেষ সান্যালই খুনী। অপরাধী ধরা আমাদের

কর্তব্য—আপনার কর্তব্য আমাদের সাহায্য করা।

ভদ্রলোক যা বললেন, তা আগের জানা ইতিহাস। কেবল বেশি বললেন এই যে, বিনীতা যখন বেথুনে পড়ত, তখনই অনিমেষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে এম. এ. পাশ করে। কিন্তু আমাদের পরিবার গোঁড়া। ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ ঠিক সাপোর্ট করিনি আমি। তখন তারা নিজেরাই বলে যে, বিনীতার বয়স যখন আঠারো পার হয়ে গেছে, তখন সে বিয়ে করতে পারে। কেউ বাধা দিতে পারবে না।

ওদের কথা শুনে আমি বজ্রাঘাত হলাম। আমার লক্ষ্মী মেয়ে বিনীতা কিনা সমাজ-বিরোধী কাজ করবে। আমি রেগে বললাম—এ হতে পারে না অনিমেষ—তুমি চলে যাও, তা না হলে পুলিশে খবর দেব।

অনিমেষ বললে—তাকে ডাকুন। সে সাবালিকা। আমার কথায় সে রাজী।

বিনীতাও তার প্রস্তাবে রাজী। আমি তখন তার বিয়ের জন্যে যে গহনাপত্র করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে বললাম—বেরিয়ে যাও। আর এ বাড়িতে এসো না তোমরা। বিনীতা, তুমি আজ থেকে আমার কাছে মৃতা।

বিনীতা অনিমেষের হাত ধরে চলে যাচ্ছিল গহনা না নিয়ে, অমিমেষ বললে—বাবার উপহার মাথায় তুলে নাও বিনীতা। বলে সে গহনার বাক্সটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এরপর ওদের খবর আর জানতাম না। পরোক্ষ সূত্রে খবর পাই ঐ বদমায়েসটা বিলেত গেছে ব্যারিস্টারী পড়তে। বিনীতা চাকরি করে। তারই গহনা ও নগদ টাকায় সে গেছে বিলেতে। তারপর শেষ পরীক্ষা না দিয়ে সে নাকি চলে আসে দেশে। আজ প্রথম শুনলাম, বিনীতাকে মেরে ফেলা হয়েছে। ওর মনে যে একটা ক্রিমিন্যাল লুকিয়ে ছিল, তা আমি ওকে দেখেই বুঝেছিলাম। বিনীতা তা বুঝতে পারেনি বলেই ভুল করেছি। যাক পুরানো কথা আর বাড়িয়ে দরকার নেই। ওর মা শুনলে কান্নাকাটি করবে।

সব শুনে বেরিয়ে পড়লাম।

রতনবাবু বললেন—এবার আমাদের যেতে হবে ভদ্রায় অনিমেষ সান্যালের বাড়িতে।

আমি রতনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দূর সম্পর্কের ভাই বলে পরিচয় দেব, এই কথা হলো।

তারপর আমরা ফিরলাম কোলকাতায়। লটারীর টাকা পাওয়া গেলে আমার বন্ধুকে দেড় হাজার টাকা দিয়ে, বাকী টাকা নিয়ে চাকর সেজে রতনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ভদ্রায় ফিরলাম।

খরচখরচা বাদে তেরো হাজার টাকা তুলে দিলাম মালিকের হাতে। সান্যাল খুশী হয়ে বললেন—মানুষ যে কতটা নির্লোভ হতে পারে, তুমি তা দেখালে বিজয়। আর এ লোকটি কে?

আমি বললাম—এ আমার দূর সম্পর্কের ভাই। আমি কিছুদিন ছুটি নেবো। তাই সে সময়ে আমার বদলী এ কাজ করবে। এর সব দায়িত্ব আমার। এও আমার মত বিশ্বাসী।

অনিমেষ আমাকে দুশো টাকা দিতে গেল। আমি তা নিলাম না। বললাম—এ টাকা নিলে পাপ হবে। আমি যা করেছি, তা মনিবের হুকুম ভেবে করেছি। কিন্তু টাকা নিলে পাপ চাপবে আমার ঘাড়ে।

টাকাটা সে রেখে দিল। কিন্তু আমি তখন লক্ষ্য করলাম রমাকে। আবার তার অবস্থা খারাপের দিকে চলেছে। ডাক্তারেরা আশা ছেড়ে দিয়েছেন বলা যায়। কিন্তু কোনও প্রত্যক্ষ প্রামাণের অভাবে ধরতে পারলাম না তাকে। আমরা সেখানে পৌঁছবার ঠিক দু'দিন পরেই মারা গেল রমা। রমার বুকে আছড়ে পড়ে অনিমেষের সে কি কান্না।

আমার সারা শরীর যেন রাগে জ্বলে গেল। কি নিপুণ অভিনয়? কিন্তু কেন? কি লাভ তার?

শবদাহ করে সান্যাল ফিরল ঠিক মূর্তিমান শোকের প্রতিমূর্তির মতোই।

দেখতে দেখতে শ্রাদ্ধও চুকে গেল।

আমি ভাবতে লাগলাম, কেনই বা সান্যাল তাকে বিয়ে করল—কেনই বা দগ্ধে মারল? বিনীতাকেই বা মারল কেন?

কোনও উত্তর পেলাম না।

।। আট ।।

মিস ডরোথির রহস্য

আমাদের সব চিন্তা ও ভাবনার কুলকিনারা পাওয়া গেল রমার মৃত্যুর দিন পনেরো কুড়ি পরে।

লাইফ্ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর একজন অফিসার এলেন সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে। রমা আর সান্যালের "জয়েন্ট লাইফ ইন্‌সিওর" করা ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকার। একজনের মৃত্যু হলে অন্যজন টাকাটি পাবে। ডাঃ শর্মা ও আরও একজন বড় ডাক্তার হৃদ্‌রোগ বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন—তাই টাকা পেতে কোনও অসুবিধে নেই।

মাত্র আড়াই বছর প্রিমিয়াম দেওয়া হয়েছে। তাই কোম্পানী থেকে তদন্ত করতে এলো। যথারীতি তদন্তও হলো—কোন ব্যাপারে খুঁত পাওয়া গেল না এতটুকুও। ইন্‌ভেস্টিগেটিং অফিসার স্বাভাবিক মৃত্যু বলে রিপোর্ট দিলেন। কয়েকদিন পরে ভদ্রা ছেড়ে বাইরে চলে গেল সান্যাল। যাবার আগে বলে গেল

—বিজয়, তুমি আর তোমার ভাই বাড়িতে থাকো। এখানে আমার মন টিকছে না। তাছাড়া ব্যবসার দিকটাও দেখতে হবে। তোমরা থাকতে পারবে ত?

সুযোগ ভালই পেলাম। তাছাড়া লটারীর টাকা এনে দেবার পর থেকে আমাকে সান্যাল খুবই বিশ্বাস করত। বললাম—পারব না কেন?

সান্যাল চলে গেলে আমরা হারানো সূত্র খুঁজতে বসলাম। রমা গরীবের ঘরের অশিক্ষিতা মেয়ে—তাকে সান্যাল বিয়ে করেছিল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর টাকার লোভে। কিন্তু সে বিনীতাকে খুন করল কেন?

সান্যাল চলে গেলে আমরা নকল চাবির সাহায্য তার ড্রয়ার, আলমারি সব খুলে খুলে খুঁজতে লাগলাম। আলমারির মধ্য থেকে পাওয়া গেল বিনীতার তিনখানা চিঠি। বিনীতা অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সে একা থাকতে রাজী ছিল না আর। সান্যালকে সে অনুরোধ করেছিল নিয়ে যেতে। সে লিখেছিল, সান্যাল তার আবাসস্থল কেন গোপন করতে চায়? সে কি বিনীতাকে অবিশ্বাস করে? বিনীতা তার সর্বস্ব বিক্রি করে তাকে বিলেত পাঠাল—কিন্তু সে শেষ পরীক্ষা না দিয়ে চলে এলো কেন? প্রশ্ন করলে সে এড়িয়ে যায়। যার জন্যে সব ত্যাগ করে এসেছে, সে এমন করছে কেন?

শেষ চিঠিতে বিনীতা জানিয়েছিল, সান্যাল তাকে না নিয়ে গেলে সে ভদ্রায় গিয়ে পোস্টমাস্টারের কাছ থেকে তার ঠিকানা খুঁজে বের করবে। চিঠি পড়ে রতনবাবু বললেন—সান্যাল প্রথমে মারতে চায়নি বিনীতাকে। কেন সে বিলেতে থেকে শেষ পরীক্ষা না দিয়ে হঠাৎ চলে এসেছিল তাও তাকে জানায়নি। বিনীতা অপ্রত্যাশিত ভাবে অন্তঃসত্ত্বা হওয়াতে সে বিব্রত বোধ করেছিল। কারণ বিনীতা এলেই তার লাইফ ইস্‌সিওরেন্স সংক্রান্ত প্ল্যান নষ্ট হতো। তাই অগত্যা সান্যাল তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে হত্যা করেছে। তার নিজের পাপের ফল তাকে ভোগ করতে হবে বলেই বোধ হয় কাটা হাতটা ট্রেনে পড়েছিল; তবে পুলিশের বিজ্ঞপ্তি পড়ে সে নিশ্চিন্ত আছে—কেউ তার খোঁজ পায়নি। রতনবাবুর কথা সত্য বলে মনে হলো আমার।

পরদিন দুপুরবেলা আমি আর রতনবাবু শুয়ে আছি। এমন সময় ঘন ঘন কড়া বেজে উঠল। এগিয়ে গেলাম। দেখি পোস্টঅফিস থেকে যে লোকটি চিঠি নিয়ে আসে, সে কড়া নাড়ছে।

সে বললে—বাবু কোথায়?

—তিনি নেই। চিঠি থাকলে দিয়ে যান। আপনার পাওনা নিয়ে যান।

লোকটা দু'খানা চিঠি দিয়ে দুটো টাকা নিয়ে চলে গেল। আমরা দু' জনে খুব সাবধানে খামটার মুখ ভিজিয়ে চিঠি বের করলাম। একটা বিলিতি মেয়ের চিঠি। বিলেত থেকে একজন মেমসাহেব লিখেছে। তার নাম মিসেস ডরোথি সান্যাল!

রতনবাবু বললেন—সর্বনাশ! বিলেত গিয়েও লোকটা বিয়ে করেছিল! ঐ চিঠি থেকে জানা গেল, অমিমেষ বিলেতে গিয়ে জমিদার বলে নিজের পরিচয় দেয়। বিনীতার গহনা বিক্রি করা টাকায় জমিদার সেজে সেজে সে ভাব করে ডারোথির সঙ্গে। ডরোথি একটি অর্কেস্ট্রা পার্টিতে শিল্পী হিসেবে কাজ করে।

সে লিখেছে—তুমি জমিদারী বিক্রি করে চলে আসবে বলেছিলে, অথচ আজও এলে না। জমিদারী কি বিক্রি শেষ হয়নি। হলে তুমি চলে এসো। এসে এখানে ব্যারিস্টারী পাশ করে প্র্যাকটিস করো। এই অর্কেস্ট্রা গার্লস জীবন আমার ভাল লাগে না। আর।

চিঠির সঙ্গে ফটো ছিল। একটা ডরোথি আর আনিমেষের যুগল-মূর্তির ফটো; অন্যটা ডরোথি আর তার ছেলের ফটো।

রতনবাবু বললেন—এ ফটো আর চিঠি তাকে দেবো না। এটা পরে সাক্ষীর কাজ করবে!

।। নয়।।

ড্রাগনের ছোঁয়া

কয়েকদিন পর সান্যাল ফিরে এসে বললে—বিজয়, আমি এখানে থাকব না। ব্যবসা-বাণিজ্য উঠিয়ে দিলাম। রমা চলে গেল—এ বাড়িতে আর থাকতে ভাল লাগে না। মন টিকছে না একেবারে। এর দেয়ালে মেঝেতে—প্রতিটি জিনিস জড়িয়ে আছে রমার স্মৃতির পরশ।

—তা তো হবেই বাবু—পরিশ্রম ত কম করেননি বৌদিকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু ভাগ্য!

—ভাল কথা, এবার ভাবছি মধ্যভারতে যাব। নাগপুরে একটা ওষুধের ব্যবসা খুলবো।

—আমি আপনার সঙ্গে যাব ত?

—হ্যাঁ—নিশ্চয়ই। তোমার মত এমন বিশ্বাসী লোক পাব কোথায়?

—আর প্রয়োজন হলে আমি একটু দেশ থেকে ঘুরে আসব ক'দিন। তখন আমার ভাই থাকবে।

—ঠিক আছে।

কয়েকদিন পরেই লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের পঞ্চাশ হাজার টাকা এসে গেল। তারপর রওনা হবার পালা। রওনা হবার আগে রতনবাবু বিনীতার জিনিসগুলো প্যাক করবার সময় ভাল করে দেখলেন। তিনি আমাকে দেখালেন যে, প্রতিটি জিনিসেই সাধারণভাবে চোখে না পড়ে এমনি করে বিনীতার নাম খোদাই করা

আছে। সে সব জিনিস এখনো পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

যাক সেসব কথা পরে হবে। আমি যে কথা বলছিলাম, তাই বলি আপাততঃ।

তারপর আমরা চললাম নাগপুরের দিকে। সুন্দর সাজানো শহর—পাশেই রেলওয়ে স্টেশন। পোস্টঅফিস আছে, কোর্ট আছে। সবদিক থেকে সুন্দর শহর এই নাগপুর।

এখানে এসেই সান্যাল দূরে দূরে ঘুরতে লাগল। কেন, তা বুঝতে পারলাম না তখন।

একদিন বললে—ব্যবসার ফিকির ঘুরছি, ঘোরঘুরি না করলে চলবে না। তাই এই প্রচেষ্টা। একদিন বাইরে যাবার সময় আমাকে বললে—বিজয়, আমি কাজে একটু বেরিয়ে যাব।

আমি জানতাম, কেন সে বেরিয়ে যাচ্ছে। কারণ, ক'দিন আগেই একটা চিঠি পেয়েছিল সান্যাল। তাতে লেখা ছিল ঃ—

প্রিয় সান্যাল, তুমি বহুদিন আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করনি। তুমি ছিলে আমার একজন প্রধান সহায়ক। কিন্তু আজকাল তুমি আমার সঙ্গে দেখা কর না, কেন তা জানি না।

আমার মনে হয়, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও না।

যা হোক, ভবিষ্যতে আমার সাহায্য তোমার প্রয়োজন হবে বলে মনে করি।

ইতি—ড্রাগন।

সেই চিঠিটা তার হাতে দেওয়া হয়নি। রতনবাবু সেটাও গোপনে রেখে দিয়েছিলেন।

সত্যিই তারপর বাইরে গেল সান্যাল। বাইরে যাবার সময় সান্যাল বললে—বিজয়, ক'দিনের জন্যে আমি বাইরে যাচ্ছি। আশা করি, তোমার অসুবিধে হবে না। তোমরা দু'জনে ভালই থাকবে।

আমি বললাম—ঠিক আছে! সব কিছু তদারক করব আমি।

—বিজয়, তোমাকে আমি খুব বিশ্বাস করি, বাইরে থেকে আসার আগেই আমি কিছু বলতে চাই না। তবে তোমরা নিশ্চয়ই এ-বাড়ির ব্যবস্থা করে রাখবে।

—ঠিক আছে।

পরদিন চলে গেল সান্যাল। আমরা যথারীতি তার মালপত্র গুছিয়ে তাকে তুলে দিয়ে এলাম ট্রেনে। যাবার আগে একটা চিঠি দিয়েছিল পোস্ট করার জন্যে। আমি আর রতনবাবু খাম খুলে সেটা পড়লাম।

তাতে লেখা ঃ—

প্রিয়তমা ডরোথি,

অনেকদিন তোমার চিঠি পাইনি। তুমি যে কেন চিঠি দাওনি, জানি না। আমার একটা সম্পত্তি বিক্রি করে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছি, আর একটা সম্পত্তি বিক্রি করে আরও একলক্ষ টাকা পেলেই চলে যাব বিলেতে। সেখানে প্র্যাকটিস করব। তুমি আমার ভালবাসা জানবে।

ইতি—

সান্যাল।

চিঠিটা ভালো করে আগাগোড়া পড়ে বুঝলাম ড্রাগনের এককালের অনুচর এই সান্যাল। বিলেতে গিয়ে সে ডরোথির প্রেমে পড়ে—তাতে ভেজাল নেই। একটা সম্পত্তি মানে রমা— শেষ হয়েছে। তা হলে সে দ্বিতীয় সম্পত্তির সন্ধানে গেছে।

কে সেই দ্বিতীয় সম্পত্তি?

ভাবতে ভাবতে বিস্মিত হলাম। বুঝলাম আবার সম্পত্তির খোঁজে বের হয়েছে সান্যাল।

দিন দশেক পরে ফিরল সান্যাল।

দেখলাম, আরেক সম্পত্তি নিয়ে ফিরেছে সে। আবার বিয়ে করে বৌ নিয়ে ফিরছে। বললে—ইনি আমার সংসারের নতুন কর্ত্রী। হঠাৎ বিয়ে করে ফেললাম। প্রস্তুত হবার সময় পাইনি।

আমি অবাক!

সত্যি ফুটফুটে বৌ সান্যালের। তবে সে শিক্ষিত নয়। ভগ্নীপতির গলগ্রহ হয়ে ছিল এতকাল। সান্যাল বিজ্ঞাপন দিয়ে বিনা পণে বিয়ে করেছে।

তার নাম অমলা। সান্যাল পরিচয় করিয়ে দিল আমাদের সঙ্গে। আমরা বললাম—নতুন বৌদি।

কিন্তু জানতাম যে, নতুন বৌদি সান্যালের দ্বিতীয় সম্পত্তি।

বিনা পণে বিয়ে করেছে শুনে, পাড়া-প্রতিবেশী সব ধন্য ধন্য করতে লাগল। আমি আর রতনবাবু ভাবলাম, এরকম না হলে সান্যালের নতুন জমিদারী বিক্রি করার সুবিধা হবে না।

মনে মনে তাই চিন্তিত হলাম খুব।

বিয়ের তিন-চার দিন পরে একদিন লাইফ ইনসিওরেন্স এজেন্ট এল, তারপর ইন্সপেক্টর, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, ডাক্তার প্রভৃতি এলেন। আবার লাইফ ইন্‌সিওর করা হলো। অমলার ও মিঃ সান্যালের। এবার লক্ষ টাকা।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার প্রশ্ন করলেন—আগে কি কোন লাইফ ইন্‌সিওর ছিল?

সান্যাল, বললে—না মশাই, এতদিন এ জিনিসের প্রয়োজন বুঝিনি। ভেবেছি, যে টাকা প্রিমিয়াম দেব, সেটা ব্যবসাতে খাটালে অনেক বেশি মুনাফা আসবে ঘরে। এবার বিয়ে করলাম, ছেলেপুলে হবার সম্ভাবনা আছে। কি জানি, হঠাৎ যদি মরেই যাই, একটা সঞ্চয় থাকা ভাল। জীবন ত পদ্মপত্রের জল!

আড়াল থেকে শুনে ভাবলাম—বারে বারে ঘুঘু ধান খেয়ে যাও; এবার তোমার নিস্তার নেই। রতনবাবু বসে আছেন ফাঁদ পেতে।

চা ও প্রচুর খাবার খেয়ে ইন্‌সিওরেন্স কর্মীরা বিদায় নিলেন। সংসার ধীরগতিতে গতানুগতিকভাবে গড়িয়ে চলল।

আমি একদিন নিরিবিলিতে রতনবাবুর সঙ্গে আলোচনা করলাম।

রতনবাবু বললেন—আপনার ধারণা ঠিক বিজয়বাবু। এ নতুন জমিদারীর ব্যবস্থা করেছে।

—এখন উপায়?

—অমলাকে খুন করার চেষ্টা যদি হাতে-নাতে আমরা ধরিয়ে দিতে পারি, তবে সব কথা প্রমাণ হবে এবং তাতে সুবিধাও হবে।

আমি বললাম—ঠিক।

এদিকে একদিন দেখলাম নতুন একটা ঘটনা। সেটা আমি রতনবাবুকে পরে বলি। রতনবাবু তা শুনে বুঝতে পারলেন, ড্রাগনের দলের সঙ্গে সান্যালের ঘনিষ্ঠতার কারণ। এবারে সে ঘটনার কথা বলছি।

।। দশ।।

ড্রাগনের চক্রান্ত

সেদিনটা ছিল মেঘলা।

বেলা দশটা নাগাদ সান্যাল হঠাৎ খেতে এলো। কোথায় সে যাবে, তা বলে গেল না।

আমি ভাবলাম তাকে অনুসরণ করতে হবে। রতনবাবুও আমার কথায় সায় দিলেন।

রতনবাবুকে বাড়িতে রেখে আমি অনুসরণ করলাম স্যানালকে।

শহরের প্রান্তে একটা নিরালা রেস্টুরেন্ট। দেখি সান্যাল সেই রেস্টুরেন্টের মধ্যে প্রবেশ করল। তারপর একটা কেবিনে ঢুকে পর্দা সরিয়ে দিল।

একটু পরে আমিও রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করে পাশের কেবিনে বসে চুপচাপ শুনতে লাগলাম ওদের কথা। এক কাপ চা আর এক প্লেট আলুর দমের অর্ডার

দিয়ে, ওদের কথার দিকে মন দিলাম।

সান্যালের গলা শুনতে পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গলা।

সান্যাল বললে—তা হলে আপনি বুঝতে পারছেন ত, আমি কেন ওসব কাজ করছি না।

লোকটি বললে—সে কথা ঠিক। তুমি যদি আমাদের দলের সঙ্গে কাজ করতে না চাও, তবে জোর করব না আমরা। তবে আমাদের দলে কাজ করলে দু'পয়সা বেশি লাভই হয়।

—তা হয়। কিন্তু আমি নতুন ব্যবসা যা করছি তাতে মোটা লাভ হবে। আমার অন্য পথে পা দেবার ইচ্ছা নেই।

—বেশ, তুমি যা ভাল বোঝ, কর।

—তবে একটা কথা।

—বল।

—আমি যদি বিদেশে যাবার পাশপোর্ট না পাই তবে আপনার সহায়তায় বর্ডার কিছু ব্যবস্থা করে পাস করতে হবে।

—বেশ। এর জন্যে কত দেবে?

—কত আপনি চান? আমি আগে টাকা দিয়ে তারপর বর্ডার পাস করব। এক হাজার দেবো। আমাকে আপনারা বর্মার বর্ডার পাস করিয়ে দেবেন। সেখান থেকে যাব হংকং, তারপর ইংল্যাণ্ডে যাব প্লেনে।

—তা মন্দ নয়। ঠিক আছে, তা করা যাবে। কিন্তু তুমি পাশপোর্ট পাবে না যে! আজকাল উপযুক্ত গ্রাউণ্ড ছাড়া সরকার পাশপোর্ট দিচ্ছে না—ফরেন মানি শর্ট কিনা!

এই রকম দু'চার কথার পর ওরা উঠে পড়বে বুঝে আমি আগেই বেরিয়ে চলে এলাম। আত্মগোপন করে রইলাম।

সান্যাল চলে গেল।

যে লোকটার সঙ্গে কথা বলছিল, পরে দেখলাম সে-ই ঐ দোকানের মালিক।

আমি সব বুঝতে পারলাম। রতনবাবুকে এসে বললাম।

রতনবাবু বললেন—ওকে ধরা যাবে না এখন। কারণ ওকে ধরলে সান্যাল সাবধান হয়ে যাবে। যখন সান্যালকে ধরব, ওকেও একই সঙ্গে ধরা হবে।

আমি বললাম—ঠিক আছে। তাই করা যাবে। আমরা পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মাস কয়েক কেটে গেল।

একদিন অমলার হঠাৎ সর্দি লাগল। সর্দির পর কাশি, গলায় ব্যথা এই সব উৎসর্গ দেখা দিল।

সান্যাল একদিন দোকান থেকে একটা স্প্রে মেশিন কিনে আনল। গলায় স্প্রে করলে নাকি গলার ব্যথা কমে যাবে।

কয়েকদিন কাটল।

সর্দি কিন্তু সারল না—উপরন্তু ধীরে ধীরে তা বেড়ে চলতে লাগল।

রতনবাবু তখন আমাকে বললেন, আর আপনি এখানে থাকবেন না।

এবার ব্যবস্থাটা আমাকে করতে দিন।

আমি তখন ক'দিনের ছুটি নিলাম—দেশে যাচ্ছি বলে। সান্যালকে বললাম—আমার ভাই এ ক'দিন কাজ করতে পারবে। সান্যাল ছুটি দিল। আমি কোলকাতা ফিরে দীপকবাবুকে সব বললাম। এদিকে তারপর যা ঘটনা ঘটল সব রতনবাবু ভাল জানেন তাঁর কাছে শুনুন।

এবারে রতন তার বক্তব্য বলতে শুরু করল।

রতনের বক্তব্যও যথারীতি নোট করা হলো। এবার রতনের বক্তব্য বলা হচ্ছে।

রতন বলতে লাগল—"আমি বিজয়বাবুর সব কথা শুনে ও সব কিছু দেখে নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম যে, সান্যাল আগের মতই অভিযান চালাবে। তবে এবার যে কোন্ অস্ত্র হাতে নিয়েছে, তা বুঝতে বেশ কষ্ট হল আমার।

বিজয়বাবু চলে যাবার পর, একদিন অমলার জ্বর খুবই বেড়ে গেল। সান্যাল ডাক্তার ডাকল, ঔষধপত্র ইন্‌জেকশন চলতে লাগল। রোগও কমতে লাগল। কিন্তু ক'দিন পরেই আবার রোগ চলল বৃদ্ধির দিকে। দ্রুত বেড়ে চলল জ্বর। শেষে কোনও দিন কমে কোনও দিন বাড়ে, ওই রকম চলতে লাগল রোগের গতি।

ডাক্তার আসেন, চিকিৎসা করেন, ঔষধ দেন। তারপর আরও একজন ডাক্তার আনা হলো। তিনি ভাল করে দেখে বললেন—টি. বি. রোগ সন্দেহ হচ্ছে। এক্স-রে করানো দরকার।

তার পরের দিন এক্স-রে করানো হলো। রিপোর্টও এসে গেল। জানা গেল, অমলার টি. বি. হয়েছে। সান্যাল ত তা শুনেই কেঁদে ফেলল।

টি. বি. স্পেশালিস্ট এলেন। ঔষধ ইন্‌জেকশন দিতে লাগলেন ভালভাবেই। ব্যবস্থামত শরীর ভাল হয়ে উঠতে লাগল অমলার।

কিন্তু ভাল হবার ক'দিন পরেই আবার রোগ বাড়ল। রোগের ধরনটা অদ্ভুত। কমে যায়—আবার বিনা কারণে বাড়ে কেন?

আমি ভাবলাম, আবার কোনও উপায়ে সান্যাল জমিদারী বিক্রির ব্যবস্থা করছে। এবার তার দাম একলক্ষ টাকা। কি উপায়ে? কিভাবে সে রোগ সৃষ্টি করে তা জিইয়ে রেখেছে? তবে কি স্প্রে দিয়ে?

একদিন ঔষধ আনতে গিয়ে ডাক্তারকে প্রশ্ন করলাম—আপনি কি

সান্যালবাবুকে স্প্রে দিতে বলেছেন?

ডাক্তার অবাক হয়ে বললেন—কি স্প্রে দেব? কাকে দেব? বোধ হয় গলায় কোনও অসুখ। আমি তখন বললাম—একটি সাদা টেস্ট টিউব থেকে কি যেন তুলে জলে গুলে, তা গলায় স্প্রে করেন।

ডাক্তার লাফিয়ে উঠে বললেন—তা হলে নিশ্চয় ওটা কালচার টিউব। এতে হয়ত কোনও বীজাণু আছে। একদিন গোপনে স্প্রে থেকে তরল পদার্থটা ঢেলে আমাকে এনে দিন তো।

আমি বললাম—ঠিক আছে।

কথামত কাজ হলো।

পরদিনই আমি গোপনে স্প্রে মেশিন থেকে কিছু লিকুইড এনে দিলাম ডাক্তারবাবুকে। তিনি বললেন—ঠিক আছে, আমি ওটা পরীক্ষা করাচ্ছি।

পরদিন যেতেই তিনি বলেন—সর্বনাশ! ঐ লিকুইডে প্রচুর টি. বি. বীজাণু পাওয়া গেছে।

—সে কি! কি ব্যাপার?

—সত্যি বলছি। ঐভাবে রোগ জিইয়ে রেখেছে। সাংঘাতিক ক্রিমিন্যাল লোকটা—অদ্ভুত ফন্দি ভেবে ভেবে বের করেছে বটে।

—তা ত হবেই, বহু দিনের পুরনো ক্রিমিন্যাল কিনা।

—বলেন কি?

—সত্যিই বলছি স্যার। আর এভাবে ধীরে ধীরে রোগে ভোগাবার অর্থ হচ্ছে যাতে কেউ সন্দেহ না করে। মারা গেলে আপনি ডেথ সার্টিফিকেট দেবেন নিশ্চয়ই, যেমন আগে রমা দেবীর হয়েছে।

—তা বটে। ভুগে মরে গেলে ব্যর্থ ডাক্তারের মনে একটা নিষ্ফলতার লজ্জা এসে যায়। লোকটা ভালভাবে সাইকোলজিও পড়েছে।

সেইদিনই আমি দীপককে টেলিগ্রাম করলাম, ঠিক পরদিন দীপক এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিজয়বাবুও এলেন। ওঁরা একটা হোটেলে উঠলেন।

তারপর কোলকাতা পুলিশকে জানিয়ে, তাদের কাছ থেকে নাগপুরের পুলিশের নামে চিঠি আনানো হলো।

দীপক তখন ওয়ারেন্ট ইসু করিয়ে নিল নাগপুর পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে। তিনি এস. পি-র অনুরোধে তা ইস্যু করলেন।

দীপক আমাকে বললে—পুলিশবাহিনী রেডি থাকবে। যখন লোকটা স্প্রে করবে তখন তুই টর্চের সিগন্যাল দিবি ছাদে উঠে। তাহলেই প্রবেশ করবে পুলিশ। হাতে-নাতে ধরতে হবে। আর স্প্রের তরল পদার্থ অ্যানালিসিস করলেই সব জানা যাবে।

সেই অনুযায়ী পরদিন সন্ধ্যাবেলা পুলিশবাহিনী তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সান্যাল সাধারণতঃ সন্ধ্যাবেলা স্প্রে দিত। আমি ঠিক সময়ে সিগন্যাল দিলাম।

হাতে-নাতে ধরা পড়ল সান্যাল। তারপর স্প্রে মেশিনের তরল পদার্থ পরীক্ষা করে টি. বি. বীজাণু পাওয়া গেছে, তা ত জানেন। সরকারী ডাক্তারের রিপোর্ট তার প্রমাণ।

এছাড়া অন্যান্য সব প্রমাণ দীপক উপস্থিত করেছে। যেমন বিনীতার জিনিসপত্র, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর রিপোর্ট ইত্যাদি। পঞ্চাশ হাজার টাকা যে পেয়েছে, তাও আপনারা জানেন।

এইভাবে এতদিন ধরে বিজয়বাবুর নিঃস্বার্থ তদন্ত ও তারপর আমার সহায়তা সহ তদন্ত করে, সান্যালের নামে যে যে অভিযোগগুলো খাড়া করেছি তা হলো ঃ

(১) বিনীতাকে সে নিজে বা তার লোক ট্রেনে হত্যা করেছে। বিনীতা যে ঐ বাড়িতে থাকতো, তা প্রমাণ পাওয়া গেছে। সান্যালের কাছে দুটো চিঠি পাওয়া গেছে। বাড়িওয়ালা, বিনীতার অফিসের ম্যানেজার, বিনীতার বাবা ইত্যাদির সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। সান্যালের বাড়িতে তার জিনিসপত্র পাওয়া গেছে—তার লিস্ট আছে।

(২) রমাকে মার্ডার—লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর সাক্ষ্য, দু'জন ডাক্তারের সাক্ষ্য ও বিজয়বাবুর সাক্ষ্য এক্ষেত্রে পাওয়া যাবে।

(৩) অমলা দেবীকে হত্যার প্রচেষ্টা—এর প্রমাণ তো হাতেনাতে মিলেছে। ডরোথির চিঠিও তার প্রমাণ।

(৪) একটি ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীকে প্রতারণা—অন্যদিতে তা করার চেষ্টা ও ড্রাগনের সঙ্গে যোগযোগ। ঐ রেস্টুরেন্ট সার্চ করলেই তার মালিককে অ্যারেস্ট করা যাবে। ড্রাগনের চর বা স্বয়ং ড্রাগন।

(৫) আর সবার শেষে বিজয়বাবু দীর্ঘদিনের নিঃস্বার্থ তদন্তের জন্য তাঁকে প্রচুর প্রশংসা করা উচিত।

সেইদিনই রাতে সান্যালকে ধরে এনে দীপক আর রতন হোটেলে নিজেদের ঘরে শুয়েছে।

মাঝরাত! হঠাৎ কি একটা শব্দে দীপকের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

দীপক চেয়ে দেখে বাইরে থেকে কে যেন কৌশলে তার ঘরের দরজার খিল খুলে ফেলল।

খিল খোলার শব্দ পেয়েই দীপকের ঘুম ভেঙে গেল! ঘুম ভাঙতেই দীপক উঠে বসল। মাথায় বালিশের তলা থেকে পিস্তলটা বের করে তৈরি হয়ে নিল। রতনকে ধাক্কা দিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। একটা ছায়ামূর্তি দরজায় দেখা গেল। হাতে চকচকে ধারালো ছোড়া!

ঘরের মধ্যে কি একটা জিনিস ফেলে সে পালিয়ে গেল ছুটে। দীপক উঠে

পশ্চাতে ছুটতে গেল, কিন্তু তার আগেই বারান্দা থেকে বাগানে লাফিয়ে পড়ে ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল।

দীপক ঘরে এসে দেখে একটা চিঠি। তাতে লেখা ঃ—

গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী,

তোমার বোধ হয় মনে গর্ব হতে পারে যে, তুমি আমার একজন অনুচরকে ধরেছো। কিন্তু সে বহুদিন দলছাড়া। সে দলে থাকলে নিশ্চয়ই তাকে ধরতে পারতে না। আশা করি ভবিষ্যতে আবার নতুন ঘটনার মধ্যে দিয়ে তুমি আর আমি মুখোমুখি মিলিত হবো। প্রীতি অন্তে—ড্রাগন।

দীপক বুঝতে পারলে ড্রাগন সত্যই অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী, তাকে ধরা সহজ নয়।

পরদিন ভোরবেলা।

পুলিশবাহিনী নির্দিষ্ট রেস্টুরেন্টে হানা দিল সকাল সাড়ে নটা নাগাদ।

দলে দলে পুলিশবাহিনী ঘিরে ফেলল রেস্টুরেন্ট। অ্যারেস্ট করা হলো রেস্টুরেন্টের কর্মীদের। কিন্তু মালিক উধাও। রেস্টুরেন্টের কর্মীরা এ ব্যাপারে কিছু জানত না। তাদের পরে ছেড়ে দেওয়া হলো।

মালিকের টেবিলের ড্রায়ারে পাওয়া গেল একটা চিঠি। তাতে লেখা—প্রিয় ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জী

তুমি সান্যালকে গ্রেপ্তার করেছো যখন, তখনই জানতে পেরেছি নাগপুরে তোমার আবির্ভাবের কথা। তুমি যে আমার অনুসন্ধানে এতদূর আসবে, তা আমি জানি। আমি ছদ্মবেশে দিন কাটাচ্ছিলাম—তাও তোমার সহ্য হলো না—তুমি হানা দিলে ঃ তাই আমাকে নাগপুর ছেড়ে পালাতে হলো। ইতি—ড্রাগন।

চিঠিটা পড়ে দীপক বললে—ছদ্মবেশী ড্রাগনের অভিযান সত্যই রসহ্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন যে সে এখানে ছিল, তা কিছুই জানা গেল না।

আরও দু'দিন পরের কথা।

দীপক একজন ইন্‌ফরমারের কাছ থেকে খবর পেল যে, ড্রাগনের একজন অনুচর, অমলা দেবীর স্বামী মিঃ সান্যালকে মুক্ত করে দিতে সাহায্য করবে, এই লোভ দেখিয়ে তাকে নিয়ে উধাও হয়েছে। এ ব্যাপারের পেছনে ড্রাগনও আছে। ঐ অনুচরটির নাম বসির খাঁ।

ঘটনাটা ঘটার ঠিক একঘণ্টার মধ্যে দীপক খবরটা পেল। খবরটা জেনেই দীপক চঞ্চল হয়ে উঠল। বসির খাঁ নাগপুর থেকে মাইল তিনেক পরবর্তী অরণ্যময় পার্বত্য অঞ্চলের দিকে চলে গেছে, তাও দীপক জানতে পারল। সে তক্ষুণি একটা প্রাইভেট কার-এ রতনকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হল।

নাগপুর থেকে তিন-চার মাইল দূরে একটি বিরাট পাহাড় ও জঙ্গল। মাঝে মাঝে এখানে বাঘ-ভাল্লুকের উপদ্রব হয়।

রতন ও দীপক পাহাড়ের উপর এসে গাড়ি থামাল। এমন সময় শুনতে পেল পাহাড়ের উপর একটা আর্তনাদ, নারীকণ্ঠের আর্ত চীৎকার। দীপক ও রতন দ্রুত পাহাড়ে উঠতে লাগল। কিছুটা উঠেই একটা সমতল অংশ। এই অংশটির শেষে বিরাট একটা খাদ।

দীপক দেখল, বসির খাঁ একটি নারীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করছে, আর মেয়েটি তার কবল থেকে মুক্ত হবার জন্যে কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছে। দীপক ও রতন ছুটে গেল সেদিকে।

দীপক বুঝতে পারল, মেয়েটিকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে বিদেশে বিক্রি করাই ড্রাগনের বা বসির খাঁর ইচ্ছে। দীপক ঠিক শিকারী বাঘের মত বসির খাঁকে আক্রমণ করল। সামনে দীপকের আকস্মিক আবির্ভাব দেখে বসির খাঁ গর্জে উঠল। সে সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট ছোরা বের করে লাফ দিয়ে পড়ল দীপকের উপরে।

অমলা অবাক বিস্ময়ে ঘটনাটা লক্ষ্য করতে লাগল। তার সারা দেহ উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে শুরু করল।

দীপক যুযুৎসুর একটা প্যাঁচ মেরে ছোরাশুদ্ধ হাত ধরে মুচড়ে দিল। তারপর চোয়ালে প্রচণ্ড বেগে একটা ঘুষি মারল।

বসির খাঁ পাক খেয়ে উল্টে পড়ল। নীচে গভীর খাদ। বসির খাঁ উল্টে পড়ল সেই খাদে। চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল তার দেহটা।

তারপর আদালতের বিচারে মিঃ সান্যালের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের খবর আমরা সংবাদপত্রে পড়েছি।

ফাঁসির মঞ্চে ড্রাগন

।। এক।।

প্রথম পরিচয়

মধ্য কোলকাতার বুকে অর্থাৎ হ্যারিসন রোড আর সূতাপটির মোড় থেকে কিছুটা বাঁদিকে গেলে ছোট্ট একটা অফিস—পূর্বাচল মার্চেন্টস্।

অফিসেই কর্তা বাঙালী। তাঁর নাম বিনয়ভূষণ সামন্ত—সংক্ষেপে বি. বি. সামন্ত।

বিভিন্ন জিনিসের ব্যবসা আছে মিঃ সামন্তর। হার্ডওয়্যার, নিকেলিং থেকে শুরু

করে এক্সপোর্টের ব্যবসা পর্যন্ত তাঁর আছে।

উপার্জন মোটামুটি মন্দ নয়। বছরে তিনি যা ইনকাম ট্যাক্স দেন, সেই পরিমাণ টাকা যে কোনও সাধারণ লোকের উপার্জন হয় না সারা বছরে।

সেদিন বেলা দশটা।

মিঃ সামন্ত সবেমাত্র এসে বসলেন অফিসে। ফ্যানটার স্পীড্ দিলেন বাড়িয়ে। বেয়ারাকে বললেন—এক গ্লাস জল আনতে।

জল খেয়ে তিনি ধীরে ধীরে খাতাপত্রে মন দিলেন।

এমন সময় একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন তাঁর অফিসে।

পরনে দামী স্যুট, মুখে পাইপ।

নমস্কার জানিয়ে মিঃ সামন্ত তাঁকে বসতে বললেন।

ভদ্রলোক বসে বললেন—কতকগুলি প্রয়োজনীয় মাল বেশি পরিমাণে কিনতে হবে বলেই এলাম আপনাদের অফিসে।

শাঁসাল খদ্দের দেখে খুশি হলেন মিঃ বিনয় সামন্ত। বললেন—বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?

ভদ্রলোক পাইপে মৃদু টান দিয়ে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—আমার নাম হরিরাম পালিত। আমার একজন আত্মীয় বাইরে থাকেন—তাঁদের হার্ডওয়্যারের দোকান উড়িষ্যার গঞ্জাম অঞ্চলে।

—আচ্ছা।

—ভদ্রলোক মাঝে মাঝে কোলকাতায় আসেন। পাইকারী দরে প্রচুর মাল কেনেন তিনি। সেই সব হার্ডওয়্যারের মাল এখান থেকে হাওড়া স্টেশনে বুক করে পাঠানো হয় গঞ্জামে তাঁর দোকানে। তিনি পাইকারী দরে সে মাল কিনে আবার সারা উড়িষ্যার বিভিন্ন দোকানে খুচরো দরে বিক্রি করে থাকেন।

—একা একটা লটে কত টাকার মতো মাল কেনা হয় বলতে পারেন?

—তা প্রতি লটে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকার মাল কেনা হয়।

—বেশ তো।

—আপনাদের সব হার্ডওয়্যার মালের রেট কার্ড আমাকে দিতে পারেন?

—নিশ্চয়ই।

—আমি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। কোলকাতার বিবেকানন্দ রোডে তাঁর বিরাট বাড়ি। তিনি সব মালের অর্ডার দিয়ে অ্যাডভান্স বেয়ারার চেক দিয়ে দেবেন। তারপর আরও তিনদিন পরে আপনি চেকটা ক্যাশ করিয়ে মালটা রেডি করবেন। আপনার মাল রেডি হবার খবর পেলেই আমি চলে আসবো সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে লরী নিয়ে। মাল এখান থেকে সোজা নিয়ে যাবো হাওড়া স্টেশনে 'বুক' করতে।

—ঠিক আছে। বিরাট অর্ডারের গন্ধ পেয়ে মিঃ সামন্ত খুশি হলেন। তিনি রেট কার্ডটা এগিয়ে দিলেন মিঃ পালিতের দিকে।

মিঃ পালিত রেড-কার্ডটা দেখে বললেন—একটা কথা, মিঃ সামন্ত।

—বলুন?

—এই রেট-কার্ডের উপরেও আমার কিছু কমিশন তো প্রয়োজন।

—তা তো বটেই।

—সেই কমিশনটা আমি ঠিক পাব তো।

—নিশ্চয়ই—প্রচুর মাল নিলে আমরা টু পার্সেন্ট কমিশন দিই। আপনি নিশ্চয়ই পাবেন।

মিঃ পালিত খুশি হলেন। বললেন—তা টু পার্সেন্ট হলে প্রতিবারে যদি বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার মাল বুক হয়, তাহলে সারা বছরে প্রচুর টাকার মাল যাবে। আমার কমিশনও মন্দ হবে না।

—তা তো বটেই।

—ঠিক আছে। আমি রেট-কার্ডটা নিয়ে যাচ্ছি। কাল-পরশু নাগাদ এসে কথাবার্তা বলে নেবো। যদি রেট পছন্দ হয় পার্টির, তাহলে আপনি বিবেকানন্দ রোডে ওঁদের বাড়িতে গিয়ে কথা পাকা করে অগ্রিম চেকটা নিয়ে আসবেন কেমন?

—আচ্ছা।

—কিন্তু একটা কথা, প্রথম বারের কমিশন পাবার পর পরের বারে বাদ যাবে না তো?

—অবশ্যই নয়।

—ধন্যবাদ।

মিঃ পালিত উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—আমি শীগ্‌গীরই দেখা করবো।

—আচ্ছা। তবে চেক অ্যাড্‌ভ্যান্স করার পর যেন দেরি করবেন না।

—না না—সে কি হয়—

মিঃ পালিত পাইপে মৃদু টান দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন সকাল।

মিঃ পালিত এলেন দেখা করতে মিঃ সামন্তের সঙ্গে।

—আসুন—আসুন—বসুন।

মিঃ সামন্ত অভ্যর্থনা জানালেন।

মিঃ পালিত চেয়ারে বসলেন। মৃদু হেসে বললেন—রেটগুলো সব পছন্দ হয়েছে পার্টির, কোন কোন রেট সামান্য বেশি হলেও উনি তা মেনে নিয়েছেন।

—ঠিক আছে।

—আপনি চলুন তাহলে একদিন—

—কবে যেতে হবে?

কালই যেতে পারেন—যদি আপনার কোনও আপত্তি না থাকে।

—ঠিক আছে।

—কোন্ মাল কতটা নেওয়া হবে, তা স্থির করে তারপর চেক দেওয়া হবে মোট মূল্যের উপরে।

মিঃ সামন্ত রাজি হলেন।

পরদিন সকাল দশটা-এগারোটা নাগাদ মিঃ সামন্ত বের হলেন, মিঃ পালিতকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করলেন বিবেকানন্দ রোডে পার্টির সঙ্গে।

পার্টি বেশ সচ্ছল এবং বিশ্বস্ত বলেই মনে হলো মিঃ সামন্তের।

তিনি বললেন—আপনি একটু বসুন। দাদা এসে গেছেন, তিনি নিজেই কথা বলে কোন্ মাল কতটা নেবেন তা স্থির করবেন।

—ঠিক আছে স্যার।

মিঃ সামন্ত বসে, মিঃ পালিত আর মালের খদ্দেরের ভাই মিঃ ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলছেন—এমন সময় প্রবেশ করলেন একজন ভদ্রলোক।

তিনি বললেন—এই যে ব্যানার্জিবাবু, নমস্কার। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়টা মনে পড়ছে?

—কে আপনি? ঠিক চিনতে পারছি না।

—আমার মনিবের সঙ্গে আপনি রেসের মাঠে যেতেন। তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে তাসের জুয়ো খেলতেন—টাকা-পয়সায় হার-জিৎ হতো।

—ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে।

—আমার সঙ্গে একটু খেলাধুলো হবে না?

—না, এখন সময় হবে না।

—দয়া করে সামান্য একটু—

—দেখছেন না, আমার বন্ধুরা বসে আছেন—

মিঃ পালিত হেসে বললেন—তাতে কি? আমাদের সামনে কোনও অসুবিধা নেই।

মিঃ পালিতের কথায় মিঃ ব্যানার্জি রাজি হলেন। আধঘণ্টার মধ্যে তিনি দু'হাজার টাকা হেরে ভেতরে চলে গেলেন। ম্যানেজারকে ডেকে বললেন—ওঁকে দু'হাজার টাকা দিয়ে দিন।

মিঃ ব্যানার্জি চলে গেলে ম্যানেজার দু'হাজার টাকা এনে ভদ্রলোককে গুণে দিয়ে বললেন—আমার কমিশনটা?

—আপনার কমিশন আবার কি? একটি পয়সাও দিতে পারবো না আমি।

—তবে আর কখনো আসবেন না, জীবনে এখানে ঢুকতে দেবো না। আপনার খেলার যে কৌশল, তা আমিও জানি। এই নিন টাকা, আর কখনো আসবেন না। একটি কথাও বলবেন না আর কখনো।

এই বলে তাঁর হাতে দু'হাজার টাকা দিয়ে তাঁকে বেরিয়ে যেতে বললেন সেই মুহূর্তে।

তিনি চলে গেলে ম্যানেজার মিঃ সামন্তকে বললেন—আপনি তো ইচ্ছা করলে এই কৌশলে দু'দশ, এমন কি বিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত উপার্জন করতে পারেন। এর মধ্যে কৌশল আছে।

—কি কৌশল?

কৌশলটা দেখালেন ম্যানেজার। তা দেখে খুশি হলেন মিঃ সামন্ত।

একটু পরে মিঃ ব্যানার্জি ফিরে এলে মিঃ সামন্ত বললেন—দেখুন, আমার সঙ্গেও তো একটু খেলতে পারেন ইচ্ছা করলে।

—বেশ তো!

খেলা শুরু হলো। দশ-পনেরো মিনিটে দশ হাজার হারলেন মিঃ ব্যানার্জি। বললেন—আপনি তো টাকা জমা রেখে খেলছেন না। এ খেলা কি রকম? মুখে মুখে তো খেলা হয় না।

—তাতে কি?

—না। টাকা ফেলে না খেললে আমি দান ধরবো না।

—এ কথা কেন?

—কারণ, টাকা না রাখলে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে ঠকাচ্ছেন।

—বেশ, টাকা দেখাবো।

—কবে?

—আজই।

ব্যানার্জিবাবু চলে গেলেন। ম্যানেজারবাবু, মিঃ পালিত ও মিঃ সামন্ত স্থির করলেন যে, একটা অঙ্কের টাকা তিনজনে মিলে যোগ করে মোট অঙ্কটা দেখাবেন মিঃ ব্যানার্জিকে। মিঃ সামন্ত দু'হাজার টাকা আনতে রাজি হয়ে গেলেন।

।। দুই।।

ড্রাগনের স্পর্শ

ঘণ্টা দুই পরে।

মিঃ সামন্ত দু'হাজারের স্থলে তিন হাজার টাকা নিয়ে ফিরে এলেন। মিঃ পালিতও আনলেন এক হাজার। আর ম্যানেজারবাবুও দিলেন তিন হাজার টাকার মতো।

মোট টাকা হলো সাত হাজার।

ব্যানার্জিবাবুকে ডেকে আনা হলো। তিনি বিশ হাজার টাকা নিয়ে খেলতে বসলেন।

খেলা চলল।

কিন্তু এবার মিঃ সামন্ত খেলায় কিছুটা ভুল করলেন। ফলে তিনি হেরে গেলেন।

এবার মনের দুঃখে বেরিয়ে এলেন মিঃ সামন্ত। বললেন—একি ব্যাপার হলো?

—ব্যাপার অতি সহজ—বললেন ম্যানেজার।

—তার মানে?

—মানে আপনি কৌশলে ভুল করেছেন। যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে, এবারে আরও বেশি টাকা নিয়ে শুরু করবো আমরা।

—ঠিক আছে।

—এবার তাহলে আপনি আনুন তিন হাজার। আমরাও তাই আনবো। এবারে জিততেই হবে।

তাই স্থির হলো।

উপযুক্ত পরিমাণে টাকা নিয়ে খেলতে বসে গেলেন ওঁরা পরদিন।

আজও মিঃ সামন্ত চালে ভুল করলেন।

তিনি বেরিয়ে এসে বললেন—আর টাকা ওভাবে আমি আনতে পারবো না। প্রতিবারই দেখছি যে ভুল হচ্ছে আমার।

—তাই তো দেখা যাচ্ছে।

—এভাবে চললে আমার সর্বনাশ হবে।

—কিন্তু উপায় কি? টাকাটা তো তুলতে হবে আমাদের।

—তা হবে, কিন্তু উপায় কি?

—উপায় হলো একসঙ্গে অনেক টাকা নিয়ে খেলতে বসতে হবে। একবার ভুল হলেও হতাশ হলে চলবে না, পরের বার জেতা যাবে।

তা তো যাবেই।

এর পরদিন অনেক চিন্তা করে মিঃ সামন্ত দশ হাজার টাকা নিয়ে এলেন।

আজও হলো ঠিক একই কাণ্ড। তিনি হেরে গেলেন।

ক্ষুণ্ণ মনে তিনি ফিরে গেলেন। আর টাকা না এনে গেলেন লালবাজারে পুলিশ অফিসে।

পুলিশ অফিসার সব শুনে বললেন—এক্ষেত্রে দোষ তো আপনার। আপনি জুয়া খেলতে গেলেন কেন? এটা কি জানেন না যে জুয়াখেলা অপরাধ।

—তা জানি স্যার।

—তবে?

—আর কখনো এমন কুকাজ করবো না। কিন্তু উপায় কি? আমার—এমন সময় ফোন বেজে উঠল।

ফোন ধরলেন অফিসার মিঃ গুপ্ত—হ্যালো, কে?

—আমি ড্রাগন কথা বলছি।

—ড্রাগন!

—হ্যাঁ।

—কি ব্যাপার?

—আমি মিঃ সামন্তকে কৌশলে ঠকিয়ে পনেরো হাজার টাকা উপার্জন করেছি। আমি চাই না যে, এ ব্যাপারে আপনি মাথা ঘামান। অবশ্য আপনি এতে নাক গলালেও কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবেন না আমার।

—তোমার স্পর্ধা অসীম ড্রাগন।

তা যা বললেন তাতে কোনও আপত্তি নেই অবশ্য আমার। তবে আমাকে ধরার চেষ্টা বৃথা। কারণ ঐ লোকটি, ম্যানেজার, পালিত, সব আমারই সাজানো লোক। আর বাড়িটাও ভাড়াবাড়ি।

—বুঝেছি, তুমি একটা শয়তান।

—তা বললেও আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই।

ড্রাগন রিসিভার নামিয়ে রাখল।

।। তিন ।।

জাল চেকের রহস্য

বেলা দশটা বাজে।

ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল ফোনটা। প্রখ্যাত রহস্য-অনুসন্ধানী দীপক চ্যাটার্জি ফোন তুলল।

—হ্যালো, কে?

—আমি মিঃ গুপ্ত কথা বলছি লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে।

—কি ব্যাপার?

—অবাক কাণ্ড।

—তার মানে?

—দিনে দুপুরে ড্রাগন মিঃ সামন্ত নামে একজন ভদ্রলোকের পনেরো হাজার টাকা প্রতারণা করেছে লোভ দেখিয়ে।

—সে কি কথা?

—সত্যি কথাই বলছি। এইমাত্র খবরটা পেলাম, মিঃ সামন্ত ছিলেন লালবাজারে। সব কথা তিনি বললেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ফোন পেলাম ড্রাগনের। সে স্বীকার করেছে, এ তারই দলের কাজ।

—ঠিক আছে। আমি এক্ষুণি আসছি আপনার কাছে, সব ঘটনা শুনবো। কেমন?

—ধন্যবাদ।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখল।

সেদিনই বেলা দশটা।

দত্ত কোম্পানী একটি বিখ্যাত মার্চেন্ট অফিস। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাদের শাখা। লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার তাদের।

একটি পার্টির কাছে মালের অর্ডার দেন মিঃ দত্ত। অল্প টাকার মাল—তিনশো চল্লিশ টাকা মাত্র দাম।

পার্টি মালটা সাপ্লাই করল। খুব সুন্দর জিনিস—অন্তত চারশো টাকা দাম হওয়া উচিত।

এত দামী মাল কম টাকায় কেন ওরা সাপ্লাই করল মিঃ দত্ত বুঝলেন না।

যা হোক তিনি টাকা পেমেন্ট করতে গেলেন। পার্টি মিঃ শেঠ বললেন—সঙ্গে করে বেশি টাকা নেওয়া বিপজ্জনক। তার চেয়ে একটা বেয়ারার চেক দিলে সুবিধা হয়।

—বেশ তো।

মিঃ দত্ত শেঠের নামে একটা চেক লিখে দিলেন। কারেন্ট একাউন্টের বেয়ারার চেক।

মিঃ দত্তের চেক পেয়ে মিঃ শেঠ খুশি হয়ে হাসিমুখে চলে গেলেন।

মিঃ শেঠ কিন্তু বেরিয়ে এসেই দেখা করলেন ঠিক উল্টোদিকের ফুটপাতে দণ্ডায়মান একজন লোকের সঙ্গে।

সে বললে—চেক পেয়েছ?

—হ্যাঁ।

—এসো আমার সঙ্গে।

—প্রচুর টাকা। আমি ব্যাঙ্ক থেকে আগেই ও বিষয়ে খোঁজ নিয়েছি।

—ঠিক আছে।

গাড়ীতে করে দুজন গিয়ে উপস্থিত হলো একটা ছোট্ট প্রায়ান্ধকার বাড়ির একটা ঘরে।

দ্বিতীয় লোকটা ধীরে ধীরে তুলি দিয়ে একটা তরল পদার্থ লাগাতেই চেকের লেখা বেমালুম মুছে গেল।

লোকটি তারপর একটু সময় চেকটা শুকিয়ে নিয়ে অঙ্ক বসাল—ত্রিশ হাজার টাকা।

সোজা তারা গেল ব্যাঙ্কে।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার এত বিরাট অঙ্ক দেখে বললেন—এত টাকা?

—হ্যাঁ, বড় একটা মাল কিনলেন মিঃ দত্ত। দেখছেন না সেল্‌ফ অর্‌ বেয়ারার লেখা আছে।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ভাল করে দেখে সই মিলিয়ে টাকাটা দিয়ে দিলেন।

মিঃ শেঠ ও তার সঙ্গী লোকটা বেরিয়ে এলো ব্যাঙ্ক থেকে।

পরদিন সকালে মিঃ দত্ত জানতে পারলেন যে, তাঁর ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে ত্রিশ হাজার টাকা তোলা হয়েছে।

তিনি তো হতভম্ব! ভেবে আর কিছু ঠিক করতে না পেরে অবশেষে ফোন করলেন পুলিশে।

পুলিশ এসে সব শুনে বললে—এই মিঃ শেঠ লোকটিকে চেনেন?

—না। এই প্রথম দেখলাম।

—এই লোকটিই আপনাকে ত্রিশ হাজার টাকা প্রতারণা করেছে।

—সর্বনাশ! বলেন কি?

—ঠিক বলছি।

এমন সময় একটা চিঠি পেলেন মিঃ দত্ত সেদিনের ডাকে।

তাতে লেখা ঃ—

প্রিয় মিঃ দত্ত,

বিশেষ কারণে বাধ্য হয়ে আপনার ত্রিশ হাজার টাকা নিতে হলো। কিছু মনে করবেন না আপনি।

আশা করি, এই সামান্য টাকা গেলে কোনও ক্ষতি হবে না আপনার।

ইতি—

ড্রাগন।

মিঃ দত্ত চিঠিটা দেখালেন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে।

মিঃ গুপ্ত বললেন—সর্বনাশ—আবার যে দেখছি ড্রাগন।

—কে এই ড্রাগন?

—আপনি জানেন না? আজকের দিনে সারা দেশের সকলের সেরা ক্রিমিন্যাল।

—আশ্চর্য তো।

মিঃ দত্ত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

।। চার।।

লুণ্ঠন ও হত্যা

ভবানীপুর অঞ্চলের আধুনিকতম ও সবচেয়ে নামকরা জুয়েলারী দোকান হলো সেন জুয়েলার্স।

বেশ বড় দোকান। বহু লোক কাজ করে সেখানে। বেলা দশটায় দোকান খোলে। বন্ধ হয় রাত প্রায় নটা নাগাদ।

সেদিন সন্ধ্যা।

দোকানের খদ্দেরের ভিড় কমে এসেছে। আটটা বাজে। একটু পরে দোকান বন্ধ হবে।

মিঃ সেন কাউণ্টারে বসে ক্যাশবাক্স নিয়ে ক্যাশ গুণছিলেন।

দোকানের কর্মচারী অধিকাংশই যে যার আস্তানায় চলে গেছে দোকান থেকে।

দোকানে আছে মাত্র দুজন কর্মচারী আর মিঃ সেন নিজে।

মিঃ সেন ক্যাশ গুণলেন। মোট বাইশ হাজার তিনশো বাহান্ন টাকা।

মিঃ সেন ক্যাশটা গোণা শেষ করে খাতাপত্র মিলিয়ে ক্যাশটা একটা ব্যাগে পুরে ফেললেন।

এমন সময় দুজন লোক সমেত একটা ঝকঝকে চকচকে প্রাইভেট কার দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল।

দুজনে নেমে পড়ল একসঙ্গে। কেবল ড্রাইভার বসে রইল। তাদের দুজনেরই বেশভূষা দেখে অত্যন্ত ধনী ও অভিজ্ঞতা শ্রেণীর লোক বলে মনে হয়।

তারা এসে দাঁড়াল দোকানের সামনে। ভিতরে প্রবেশ করতে চাইল তারা।

মিঃ সেন বাইরে এসেই বললেন—কি চাই আপনাদের?

তারা বললে—আমাদের কিছু দামী গহনা কেনার দরকার ছিল।

—কিন্তু দোকান এখন বন্ধ। ক্যাশ ক্লোজ হয়ে গেছে।

—আমরা আপনার নিয়মিত খদ্দের। জিনিসগুলো আজকেই চাই। তাই যদি দয়া করে গেটটা খুলে দেন।

মিঃ সেন তখন বাধ্য হয়ে তাদের ভিতরে আসতে বললেন। বন্ধ গেটটা খুলে দিল দারোয়ান।

লোক দুটি ভেতরে এসেই একসঙ্গে হঠাৎ পিস্তল উদ্যত করে বললে—সকলে মাথার উপরে হাত তুলুন। কেউ একটু নড়চড়া করার চেষ্টা করলেই গুলি করা হবে।

মিঃ সেন ও কর্মচারী দু'জন মাথার উপরে হাত তুললেন। এমন সময় আর একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। তাতেও চারজন সশস্ত্র লোক।

এদিকে দোকানের সামনে তখন ভিড় জমে উঠতে শুরু হয়ে গেল।

দোকানের সামনে দাঁড়ানো গাড়িটির লোক চারজন আচমকা পিস্তল বের করে দু'বার ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করতেই ভিড়টা পাতলা হয়ে এলো।

সবাই সরে গেল ভয়ে।

এদিকে ভিতরের দু'জনের একজন দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল মিঃ সেনের দিকে।

মিঃ সেন হাত তুলেছিলেন। লোকটা ব্যাগটা তুলে নিল দ্রুত হাতে। তারপর দু'জনে পিছিয়ে আসতে লাগল পিস্তল উদ্যত করে।

হঠাৎ দোকানের দারোয়ান জীবন তুচ্ছ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে গেল ওদের একজনের উপরে।

গুড়ুম। পিস্তল গর্জে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে কাতর আর্তনাদ। দারোয়ানটি লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপরে।

সঙ্গে সঙ্গে লোক দু'জন এক সাথে বাইরে বেরিয়ে এলো।

নিমেষে দু'জনে একসঙ্গে গাড়িতে চেপে বসতেই গাড়িটা ছুটে বেরিয়ে গেল। অন্য গাড়িটাও ছুটে চলল সঙ্গে সঙ্গে।

মিঃ সেন দৌড়ে গিয়ে দেখলেন, গাড়ির নম্বর হলো বি এন এ ১০৭।

মিঃ সেন তৎক্ষণাৎ ফোনের রিসিভারটা তুললেন। ফোন করলেন লালবাজারে।

—হ্যালো, কে?

—আমি মিঃ সেন কথা বলছি, ভবানীপুর সেন জুয়েলার্স থেকে।

উত্তেজনায় মিঃ সেনের কণ্ঠ কাঁপছিল।

—কি ব্যাপার?

—ভয়াবহ ডাকাতি স্যার। দু'জন পিস্তলধারী লোকের কীর্তি।

—কে তারা?

—তা কি করে বলব। তারা আমার বাইশ হাজার টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে। আর দোকানের একজন কর্মচারীকে গুলি করেছে। লোকটা বেঁচে আছে কিনা জানি না।

—আচ্ছা, আসছি।

একটু পরেই মিঃ সেন চেয়ারে বসে পড়লেন ধপ করে।

আধ ঘণ্টা পরে।

পুলিশ ভ্যান এসে দাঁড়াল সেন জুয়েলার্সের ঠিক সামনে।

পুলিশবাহিনী সদলে প্রবেশ করল। একজন অফিসারও ছিলেন।

ডাক্তার পরীক্ষা করলেন নিস্পন্দভাবে পড়ে থাকা দারোয়ানকে।

দেখে বললেন—হি ইজ ডেড্। গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

মিঃ গুপ্ত ভাল করে দেখতে লাগলেন যে, দস্যুরা কোনও চিহ্ন ফেলে গেছে কিনা। কিন্তু কোন চিহ্ন মিলল না।

শুধু পাওয়া গেল মেঝের উপরে পড়ে থাকা একটা কার্ড। তাতে একটা ড্রাগনের মূর্তি আঁকা ছিল। মিঃ গুপ্ত বললেন—আবার ড্রাগন?

—তাই তো দেখছি স্যার।—বললেন একজন অফিসার।

ড্রাগনের কার্ড দেখে মিঃ গুপ্ত তক্ষুনি দীপককে ফোন করে জানালেন সব কথা। দীপক বলল—উঃ! এই ড্রাগন দেখছি দিনের পর দিন জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল।

—তাই তো করে তুলেছে। এখন দেখছি মহা মুস্কিলের ব্যাপার। আমাদের চাকরি রাখাই দায় হয়ে উঠেছে, মিঃ চ্যাটার্জি।

—ঠিক আছে—আমি দেখছি, যত তাড়াতাড়ি এর বিহিত করা যায়।

মিঃ গুপ্ত, মিঃ সেনের কাছে গাড়ির নম্বরটা নিয়ে খোঁজ করে জানলেন সেটা পুলিশ কমিশনারের গাড়ির নম্বর। ওরা যে মিথ্যা নম্বরের প্লেট এঁটে এসেছিল তা তিনি বুঝতে পারলেন।

—আপনি কি ঘটনাস্থলে একবার আসবেন দীপকবাবু?

—একজন মার্ডার হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—সূত্র কিছু পেলেন?

—বিন্দুমাত্র নয়। সত্যিই অদ্ভুত এদের কাজ করবার ক্ষমতা।

মিঃ গুপ্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

।। পাঁচ।।

মৃত্যু-পরোয়ানা

পরদিন সকাল।

ফোন বেজে উঠল ঘন ঘন দীপক চ্যাটার্জির বাড়ির ড্রইংরুমে।

—হ্যালো, কে? ফোন ধরে দীপক বললে।

—আমি ড্রাগন।

—কি চাই তোমার?

—আমি বারবার তোমাকে যা বলেছি তা আবার বলতে চাই।

—তার মানে?

—মানে আমার একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে।

—কিসের অনুরোধ?

—যে অনুরোধ বারবার করেও ব্যর্থ হয়েছি সেই অনুরোধ। আমি চাই না তোমার মতো একজন খ্যাতনামা রহস্য অনুসন্ধানীর প্রাণটা বিপন্ন হয়।

—সে তো শুনেছি আগেও।

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি বারবার আমাকে বিরক্ত করলে আমি বাধ্য হবো তোমাকে চিরদিনের মতো শেষ করে ফেলতে।

—সে চেষ্টা তো করেছ কোনও দিন কি তাতে সুফল হয়েছে?

—আচ্ছা দেখা যাবে। তুমি তাহলে আমার কথা শুনবে না?

—না না—আমি একই কথা বারবার বলতে ভালবাসি না।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখল।

টালিগঞ্জ অঞ্চলের একটা বস্তিবাড়ির একখানা ঘর।

সেদিন সন্ধ্যায় দেখা গেল এই ঘরটির মধ্যে একে একে কয়েকজন লোককে জমায়েত হতে।

ঘরটি খুব বড় নয়, প্রায়ান্ধকার ঘরটার এককোণে জ্বলছিল একটা ছোট্ট মিটমিটে মোমবাতি।

ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রায় সাত-আটজন লোক এসে জমল।

সকলে কার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। নটা বেজে গেল।

তবু তার দেখা নেই। হঠাৎ তাদের প্রতীক্ষা সার্থক করে ঘরের মধ্যে একজন লোককে প্রবেশ করতে দেখা গেল। সকলে তাকাল লোকটার দিকে।

পরনে কালো স্যুট—মাথায় টুপি। চোখে একটা কালো চওড়া ফ্রেমের চশমা। মুখের নিচের দিকটা কালো একটা কাপড়ে ঢাকা।

লোকটি আসন গ্রহণ করেই সবাইকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল—

বন্ধুগণ,

বহুদিনপরে তোমাদের আমি আবার একত্রে ডেকেছি। ডেকেছি আমি নয়—ডেকেছে আমার প্রতীক ঐ ড্রাগন।

কথাগুলি বলে লোকটা ঘরের কোণে ঝোলানো বিরাট একটা পর্দায় আঁকা ড্রাগনের মূর্তি দেখিয়ে দিল আঙুল দিয়ে।

সকলে নির্বাক।

লোকটি বলে চলল—আমি জানি তোমরা আমাকে শ্রদ্ধা কর। আমার পর পর প্রতিটি কাজ যে সফল হয়েছে তা তোমাদেরই জন্যে। এবারে শোন আমার পরবর্তী কর্মধারা।

তোমাদের প্রত্যেকের উপর যে যে কাজের ভার দেবো, আশা করি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে তোমরা।

আর জেনে রেখো—আমার সঙ্গে বেইমানির একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।

তারপর লোকটি ধীরে ধীরে প্রতিটি লোকের উপর এক একটা কাজের ভার দিল।

লোকটি একজনকে বললে—তোমার উপরে আমি একটিমাত্র বিশেষ কাজের ভার দিলাম। তা হলো দীপক চ্যাটার্জীকে হত্যা করা। তার পুরস্কার বিশ হাজার টাকা।

লোকটি চলে গেল—ড্রাগনের দলপতির এই অন্তর্ধান সকলে বিস্মিত ভাবে দেখতে লাগল।

দলপতি চলে গেলে একটু পরেই সকলে বিদায় নিল একে একে।

।। ছয় ।।

হত্যার প্রচেষ্টা

গভীর রাত।

ঢং ঢং করে দূরে পেটা ঘড়িটা জানিয়ে দিল যে, রাত দুটো বেজে গেল।

দীপক চক্রবেড়ে রোডের যে অঞ্চলে থাকে, সেটা রাত দশটার পরেই জনহীন হয়ে পড়ে।

দীপক ঘুমিয়ে ছিল নিঃসাড়ে।

জানালা দিয়ে মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে। দীপকের ঘুম আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে তাতে।

বাইরে পথের মোড়ে মোড়ে গ্যাসের ক্ষীণ ছোট্ট আলো, তাতে আঁধার দূর হয়নি বরং আরও যেন রহস্যময় হয় উঠেছে প্রকৃতি।

দীপকের ঘরের আলো নেভানো। জানালা খোলা।

হঠাৎ একটা অস্ফুট শব্দে তার ঘুমটা ভেঙে গেল।

এত রাতে কিসের শব্দ? দীপক উৎকর্ণ হলো। বিছানার উপর উঠে বসল। ভাল করে তাকাল চারদিকে।

খস্-খস্—

আবার শব্দ হলো।

দীপকের মাথার দিকের জানালাটা ছিল খোলা। দীপক দেখল, সেই খোলা জানালাতে কি একটা কালোমতো বস্তু।

গরাদবিহীন জানালা। তার উপরে স্পষ্ট দেখা গেল কালো একটা পেশী বহুল হাত, তারপর আর একটা—দুটো সবল হাত দিয়ে জানালা ধরে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি উঠে দাঁড়াল।

কালো মুখটা চেনা যায় না।

দীপক কিছু বললে না। বুঝতে পারল যে ঐ লোকটা তার ঘরে প্রবেশ করতে চায়।

দীপক বাধা দিল না।

সে চট করে তার গায়ের চাদরটা চাপা দিল তার পাশ-বালিশটার উপরে। তারপর সেটা রেখে দিল বিছানার মাঝখানে।

মনে হলো ঠিক যেন মানুষ বিছানার ঠিক মাঝামাঝি শুয়ে আছে।

দীপক এক কোণে গিয়ে পিস্তলটা হাতে নিয়ে তৈরি হলো।

সেটা রাতে তার বালিশের নিচেই থাকে। তারপর সে পাশের ঘরে গিয়ে রতনকে ডেকে তুলে গোপনে কি নির্দেশ দিল। রতন ধীর পায়ে নিচে নেমে গেল।

লোকটা এদিকে আস্তে আস্তে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে নামল।

আঁধারে তাকে দেখাচ্ছিল একটা অতি ভয়াবহ মূর্তির মতো।

ভিতরে প্রবেশ করল লোকটা। কোমর থেকে বের করল একটা তীক্ষ্ণধার ছোরা। তারপর সেটা বসিয়ে দিল বালিশের উপর।

সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠল।

লোকটা চমকে উঠে ফিরে তাকাল। দেখে ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে দীপক। তার হাতে উদ্যত পিস্তল। সে মুচকি মুচকি হাসছে।

দীপক দৃঢ় কণ্ঠে বললে—এতটুকু নড়বার চেষ্টাও করো না—তাহলে মাথাটা উড়ে যাবে।

লোকটা বাধ্য হয়ে চুপচাপ হাত তুলে দাঁড়াল।

দীপক দ্রুত হাতে তাকে বেঁধে ফেলল।

এদিকে দীপকের নির্দেশে রতন আগেই অত্যন্ত লঘু পায়ে মার্জারের মতো গতিতে নিচে নেমে গিয়েছিল।

সে দেখল গলির মোড়েই একটু দূরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে

দু'জন আরোহী। তারা গাড়ি থেকে নেমে পথে দাঁড়িয়ে আছে।

রতন আড়াল থেকে তা লক্ষ্য করে, সোজা না গিয়ে অন্যপথে ঘুরে গিয়ে ওদের গাড়ির ঠিক পেছনে দাঁড়াল।

তারপর আচমকা পিস্তল উদ্যত করে বললে—মাথার উপরে হাত তোল তোমরা। এতটুকু নড়লেই গুলি করব।

তারা হঠাৎ রতনের এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব আশা করেনি।

একজন ছোরা বের করতে যাচ্ছিল।

গুড়ুম।

সঙ্গে সঙ্গে রতনের পিস্তল গর্জন করে উঠল। একটা গুলি লোকটার হাতে বিদ্ধ হলো।

লোকটা আর্তনাদ করে উঠল।

রতন বললে—সোজা চলো ঐ বাড়ির দিকে। হাত তুলে এগিয়ে চলো।

লোক দু'জন পিস্তল দেখে বাধ্য হয়ে রতনের নির্দেশ মতো দীপকের বাড়িতে প্রবেশ করল।

দীপক বললে—নিচের ঘরে চল্ ওদের দেখি ওরা কি জানে।

রতন যে লোকগুলোকে ধরে এনেছিল, তারা বললে—আমাদের ছেড়ে দিন হুজুর। ঐ লোকটাই আমাদের দলপতি। আমরা ওর সঙ্গে এসেছিলাম ওকে গার্ড দেবার জন্য। আমাদের কসুর মাপ করুন।

দীপক তাদের দুজনকেও বেঁধে ফেলল এক এক করে।

তিনজনে একই সঙ্গে এভাবে ধরা পড়ায় তারা যেন হতভম্ব হয়ে পড়ল।

তারপর দীপক বললে—রতন, নিচের ঘরে নিয়ে চল্ ওদের। দেখি ওরা কি জানে?

ওদের নিয়ে আসা হলো নিচের ঘরে।

দীপক একজনকে জিজ্ঞাসা করলে—কে তোমাদের পাঠিয়েছে?

—জানি না।

—জানো না—না বলবে না?

—আমাদের পুলিশে দিন। এসব কথার জবাব আমরা দেব না।

দীপক বললে—রতন, লোকটাকে ইলেকট্রিক চার্জ লাগা তো। সে ব্যবস্থা তো ঠিকঠাক করাই আছে।

—ঠিক বলেছিস।

রতন ইলেকট্রিক ফ্লাশ লাগিয়ে ইলেকট্রিক চার্জ লাগাবার জন্যে তৈরি হলো।

দীপক বললে—যতক্ষণ না স্বীকার করবে, পর পর চার্জ লাগাতে থাক।

লোকটা এবার ভয় পেলো।

বললে—আমার নাম মনসুর।

—তা তো হলো—তোমরা কার দলে কাজ করো, বল তো বাছাধন? তা না হলে তোমাদের নিস্তার নেই।

—ড্রাগনের দলে।

—তাই বল। এতক্ষণে সব বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল। তুমি তাহলে ড্রাগনের দলের লোক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কে তোমাদের পাঠিয়েছে?

—কর্তা।

—তোমাদের আড্ডা কোথায়?

—বর্তমানে টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর পিছনে, নয় নম্বর বাড়িতে।

—কর্তা সেখানে আসে?

—রোজ নয়, মাঝে মাঝে। আজ তিনি সেখানে ভোরে আসবেন।

—সে থাকে কোথায়?

—তা কেউ জানে না।

—তাকে দেখেছ কখনো?

—না। তাঁর মুখ ঢাকা থাকে সব সময়।

—তবে তো কোনও কথাই নেই।

—তোমরা কতদিন এ দলে কাজ করছ?

—অল্প দিন, মাস ছয়েক হলো।

—তোমাদের আগের দলের যারা ধরা পড়েছে, তাদের বদলে বোধহয় তোমরা নতুন কাজে নেমেছ?

—হ্যাঁ।

দীপক বললে—রতন, এদের ড্রাগন পাঠিয়েছিল, আমাদের হত্যা করার জন্যে। সে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে এদের ফিরে যাবার জন্যে। তাই আর দেরি না করে আমাদের এখুনি উচিত হলো এদের আটকে রেখে, মিঃ গুপ্তকে ফোন করে ডেকে নেওয়া।

—কিন্তু এত রাতে মিঃ গুপ্ত নিশ্চয়ই তাঁর কোয়ার্টার্সে ঘুমিয়ে আছেন।

—তা বটে।

—আমরা ওদের তাহলে এখানে নিচের ঘরে বন্দী করে রাখি। তারপর শীগ্‌গির চল্। মিঃ গুপ্তের ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাঁর সাহায্য নিয়ে এখুনি হানা দিতে হবে ড্রাগনের আড্ডায়।

—ঠিক আছে।

ওদের তিনজনকেই নিচের ছোট্ট একটা মজবুত ঘরে বন্দী করে রেখে দিল দীপক।

তারপর তারা বেরিয়ে পড়ল তক্ষুণি গাড়ী নিয়ে মিঃ গুপ্তের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

।। সাত ।।

ড্রাগনের গ্রেপ্তার

ভোর ছ'টা।

মিঃ গুপ্ত সবে ঘুম থেকে উঠছেন, এমন সময় তাঁর বাড়িতে দীপক ও রতনের আবির্ভাব।

মিঃ গুপ্ত অবাক।

বললেন—কি ব্যাপার? এত ভোরে হঠাৎ যে আপনাদের উদয় হলো?

—বিশেষ জরুরী খবর আছে।

—কি খবর?

—বর্তমানে আপনি কোন দস্যু-দলপতির জন্য সবচেয়ে দুশ্চিন্তা ভোগ করছেন?

—ড্রাগনের জন্যে।

—তাকে ধরতে পারবেন?

—নিশ্চয়ই।

—তবে চলুন। সবার আগে লালবাজারে গিয়ে পুলিশ ভ্যান নিন। ওয়ারলেস ভ্যান ছাড়াও থাকবে একটা ভ্যানে ছদ্মবেশী পুলিশ, সেটাই যাবে আগে।

ঠিক আছে।

মিঃ গুপ্ত দীপকদের নিয়ে ট্যাক্সি করে চললেন লালবাজারের দিকে। ট্যাক্সি ছুটে চলল দ্রুত গতিতে।

নিজের অফিসে ঢুকে তিনি ফোন নিয়ে বসে গেলেন।

বিভিন্ন সেকশনে ফোন করলেন। পাঁচ-ছয় মিনিটের মধ্যে পুলিশবাহিনী রেডি হয়ে গেল।

তারপর একটা ভ্যানে দীপক ও রতন চলল প্লেন পোশাকে কয়েকজন আর্মড পুলিশ সহ। পিছনে কিছুটা দূরত্ব রেখে পুলিশ ভ্যান ফলো করল।

টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো।

তার ঠিক পিছনেই একটা একতলা জীর্ণ ধরনের বাড়ি।

সবে ভোর হয়েছে। পথে লোকজন প্রায় নেই বললেই হয়।

দীপক এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ল।

খট্-খট্-খট্—

কড়া নড়ে উঠল।

—কে?

ভিতর থেকে গলা শোনা গেল।

—আমি ইলেকট্রিক অফিস থেকে আসছি—মিটারটা দেখব।

দরজা খুলে গেল।

সামনে দাঁড়িয়ে একজন হিন্দুস্থানী মতো লোক। পরনে ডোরাকাটা পাজামা গায়ে খাটো শার্ট।

—হাত তোল।

দীপক পিস্তল বার করল।

লোকটা হতভম্ব, সে হাত তুলল।

দীপক বললে—বেঁধে ফেল রতন?

রতন তাকে বেঁধে ফেলতেই পুলিশবাহিনীর প্লেন ড্রেসের লোকেরা সদলে ভিতরে প্রবেশ করল।

আর একদল মিঃ গুপ্তের নির্দেশে সারাটা বাড়ি ঘিরে ফেলল।

ড্রাগনের দলের সাতজন ধরা পড়ল।

দীপক একজনকে প্রশ্ন করল—ড্রাগন অর্থাৎ তোমাদের দলপতি কোথায়?

—দোতলায় ছিল। আছে কি না জানি না।

দীপকরা দোতলায় উঠল। সেখানে দেখা গেল ড্রাগনের দলের সর্দারকে।

দীপকরা ঘরে প্রবেশ করার আগেই সে হঠাৎ একটা বোমা মেরে চারদিক আঁধার করে ফেলেছিল।

সকলে সরে এলো পিছনে।

সঙ্গে সঙ্গে ড্রাগনের দলপতি পিছনের জানালা দিয়ে পালিয়ে পাইপ বেয়ে নামতে লাগল দোতলা থেকে পথে।

কিন্তু সেখানেও পুলিশ—

পুলিশ দেখে ড্রাগন অর্ধেকটা নেমে এসে এক হাতে পাইপ ধরে, অন্য হাত দিয়ে অবিরাম গুলি ছুঁড়তে লাগল। পুলিশরা সরে গেল।

অনেকটা পিছনে সরে গিয়েও তারা ঠিক পিস্তল উদ্যত করে রইল।

ড্রাগন লাফ দিয়ে নিচে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পুলিশবাহিনী চারধার থেকে পিস্তল উদ্যত করে তাকে ঘিরে ফেলল। অবশেষে ড্রাগনকে গ্রেপ্তার করা হলো।

ড্রাগন বললে—নিশ্চয় আমার দলেরই কোন লোক আমার সঙ্গে বেইমানী করেছে—তা না হলে আমি ধরা পড়তাম না।

পুলিশ ভ্যান তাকে নিয়ে লালবাজার হেড কোয়ার্টার্সের দিকে চলল।

।। আট ।।

ফাঁসির মঞ্চে ড্রাগন

আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য! ড্রাগনের আজ বিচার হবে।

দলে দলে লোক আদালতে হাজির হলো। সে এক অভিনব দৃশ্য।

শুধু ড্রাগন নয়, তার দলবল সকলে উপস্থিত।

সবাই অবাক বিস্ময়ে ড্রাগনের অভিনব বিচার ব্যবস্থা দেখতে লাগল।

তিন দিন বিচারের পর কেস গেল শেসন কোর্টে।

সেখানে জজের সামনে বিচার চলল।

দলে দলে সাক্ষী উপস্থিত হলো। পুলিশরা চার্জশিট দিতে দিতে হিমসিম খেয়ে গেল।

অজস্র চার্জ—

নরহত্যা থেকে প্রতরণা, ডাকাতি কোনও অভিযোগই বোধহয় বাদ নেই।

একমাস বিচার চলল। তারপর বিচারক রায় ঘোষণা করলেন।

রায় ঘোষণার দিনও হাজার হাজার লোক ভেঙে পড়ল।

রায় দিলেন বিচারক, ড্রাগনের দলপতির হবে প্রাণদণ্ড—বাকী সকলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

ড্রাগন কোনও উকিল দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করেনি।

সে বিচারে কোন বিরোধিতা করেনি। নির্বিকারচিত্তে রায় শ্রবণ করল।

তার মুখে এতটুকু ভাবান্তর দেখা গেল না।

সকলে ভাবতে লাগল—

ড্রাগন এত নিশ্চিন্ত কেন? এর কারণ কি? কিন্তু কেউ এর কোনও সদুত্তর খুঁজে পেল না।

নির্দিষ্ট দিনে জেলের ভিতরে ফাঁকা জায়গায় ফাঁসির মঞ্চে ড্রাগনকে আনা হ'লো। সঙ্গে চারজন পুলিশ গার্ড।

জেলের বাইরে বহু লোকের ভিড়। ফাঁসির খবরের জন্যে সবাই উদগ্রীব।

জেলার, ওয়ার্ডার, প্রহরীরা সবাই উপস্থিত।

ফাঁসির মঞ্চে ড্রাগনকে আনা হলো।

ফাঁসির দড়ি গলায় পরাবার আগে ড্রাগনকে প্রস্তুত হতে বলা হলো।

ড্রাগনকে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে বলা হলো। ড্রাগন হাসিমুখে বললে—আচ্ছা।

আচমকা একটা ঘটনা ঘটল।

ড্রাগন হঠাৎ মঞ্চ থেকে লাফ দিয়ে পড়ল নিচে।

জেলার প্রহরীদের বললেন—ওকে ধর।

কিন্তু প্রহরীরা উল্টে জেলার ও অন্যান্য অফিসারদের দিকে পিস্তল উদ্যত করে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করতে করতে ছুটল ড্রাগনের পিছনে।

সকলে দৌড়ে গেট পেরিয়ে এলো পথে।

বাইরে ছিল দুটি গাড়ি।

গাড়িতে চেপে বসল ওরা।

জেলখানায় পাগলা ঘণ্টি বেজে উঠল। কিন্তু সিপাহীরা ছুটে আসার আগেই চারজন পুলিশ গার্ড সমেত তারা গাড়িতে চেপে বসল।

জেলার বললেন—একি ব্যাপার?

ওয়ার্ডার বললে—নিশ্চয় আমাদের চারজন গার্ডকে তাদের বাড়িতে গুম করে ড্রাগনের লোকই তাদের পোশাক পরে এসেছিল।

সকলে বিস্মিত। এও কি সম্ভব?

পুলিশ ভ্যান অনেকটা দূরত্ব রেখে ফলো করে চলল ড্রাগনের গাড়িকে।

কিন্তু হাওড়া পেরিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে কোন্ দিকে যে হঠাৎ গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল, তা পুলিশ বুঝতেও পারল না।

পরদিন প্রতিটি কাগজে ছাপা হলো বড় বড় হরফে ঃ

ফাঁসির মঞ্চ থেকে ড্রাগনের অভাবনীয় পলায়ন।

।। নয় ।।

ড্রাগনের হুঙ্কার

পরদিন সকাল।

কোলকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ মুখার্জি একটা টেলিফোন পেলেন।

রিসিভার তুলে তিনি প্রশ্ন করলেন—হ্যালে, কে কথা বলছেন?

—আমি দস্যু ড্রাগন কথা বলছি।

—তুমি যে ভানুমতীর খেল দেখিয়ে দিলে। আবার কি চাই?

—আপনারা আমাকে ফাঁসির মঞ্চে তুলে হত্যা পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই আপনাদের উপর আমার অশেষ রাগ।। কিন্তু আমাকে হত্যা করতে আপনারা পারলেন না। আপনাদের জেলখানার পুলিশ সেণ্টিদের বাড়ি থেকে সরিয়ে বন্দী করে রেখে, আমার দলের চারজন লোক সেণ্টির পোশাক পরে আমাকে উদ্ধার করেছে। কোন্ কোন্ লোকের উপরে আমার ফাঁসির ডিউটি ঠিক করা ছিল, তা জেনেই আমি কাজে

অগ্রসর হয়েছিলাম। আমি জেলে থেকেও সবদিকে নজর রেখেছিলাম, জেনে রাখুন।

পুলিশ কমিশনার বিস্মিত! বললেন—কিন্তু জেনে রেখো ড্রাগন, অদূর ভবিষ্যতে আবার তোমাকে গ্রেপ্তার করে ঠিক ফাঁসির মঞ্চে উপস্থিত কোরবই।

—তাকি নাকি?

পুলিশ কমিশনার মুখার্জী কখনো মিথ্যা আস্ফালন করে না—তার প্রমাণও শিগ্‌গীরই পাবে তুমি।

—বেশ, দেখা যাবে। আর একটা কথা। দীপক চ্যাটার্জিকেও জানিয়ে দেবেন যে, ভবিষ্যতে সে যেন সাবধানে ড্রাগনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। তা না হলে তার প্রাণ নিয়েও টানাটানি পড়ে যাবে। আমার সে চিরশত্রু তাকে আমি ক্ষমা করব না।

—কিন্তু একজন ক্রিমিন্যালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া পুলিশের কর্তব্য।

—তা ঠিক। কিন্তু পুলিশ শুধুমাত্র আমার বিরুদ্ধেই অগ্রসর হতে চায় সব সময়। কিন্তু আজকের এই দুনিয়াতে কে ক্রিমিন্যাল নয়, তা বলতে পারেন আপনি?

—সবাই ক্রিমিন্যাল?

—সবাই নয়, তবে বেশির ভাগই। আজকের দুনিয়ায় ভাই ঠকাচ্ছে ভাইকে, ধনী ঠকাচ্ছে গরীবকে, ডাক্তার ঠকাচ্ছে রোগীকে, উকিল ঠকাচ্ছে মক্কেলকে, অথচ আমার উপরেই আপনাদের এই নিদারুণ আক্রোশ কেন মিঃ মুখার্জী?

—কিন্তু তোমার মতো তারা তো নরহত্যা করে না। প্রকাশ্য দিবালোকে ক্রাইম করে না।

—আমাকে তা করতে হয় বাধ্য হয়ে।

—তাই তোমাকে আইনের মুখ চেয়ে ধরতেই হবে আমাদের, যে করেই হোক।

—তা আমি জানি। আপনারা যে আবার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন তা ভাল করেই জানা আছে আমার। কিন্তু ধরতে আমাকে পারবেন না, কারণ আমাকে ধরার ক্ষমতা আপনাদের নেই।

—বটে। দেখা যাবে। ড্রাগন, একথা জেনে রেখো যে, আমিও মিঃ মুখার্জী। বহু ক্রিমিন্যালকে গ্রেপ্তার করেই আমি আজ এত বড় পোস্ট পেয়েছি।

—বেশ, দেখাই যাক না—প্রকাশ্যে যুদ্ধে কে জয়ী হয়।

ড্রাগন রিসিভার নামিয়ে রাখল।

পরদিন সকালে প্রখ্যাত রহস্য-অনুসন্ধানী দীপক চ্যাটার্জী একটা চিঠি পেলো। টাইপ করা চিঠি।

তাতে লেখা—

প্রিয় গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী,

তুমি ভালোভাবেই জানো যে, আমার কি অপরিসীম ক্ষমতা।

সাধারণ বুদ্ধির ক্রিমিন্যালদের মতো আমি চলি না। তবু তোমার এত সাহস যে, তুমি আমাকে বন্দী করে ফাঁসির মঞ্চে তুলতে চেষ্টা করেছিলে।

কিন্তু তুমি দেখলে যে, ফাঁসির মঞ্চে আমাকে তুলতে তুমি পারলে না। তার বদলে তোমাকে পড়তে হলো ভয়াবহ বিপদের মধ্যে।

তোমার জীবন নিয়ে টানাটানি শুরু হলো।

তাই তোমাকে আমি জানাচ্ছি যে, তুমি যদি আমার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে অগ্রসর হও, তাহলে তোমাকে আর বেশিদিন এই পৃথিবীর আলো-বাতাস উপভোগ করতে হবে না।

জানি, নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস ও অটুট সংকল্প তোমার।

কিন্তু একথা সত্যি যে, এই বিশ্বাস আর সংকল্পের জোরেই দুনিয়ার সব ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করা যায় না। আরো কিছু চাই।

তুমি হয়ত ভাবতে পার যে, আমার কথার দাম কি?

দাম বাস্তবিকই আছে কিনা, তা অদূর ভবিষ্যতে প্রমাণ করার জন্যে আমি চেষ্টা করব।

বেশি কথা লেখা বা বলা আমার স্বভাব নয়। তবে আমার দলের কোনও একজনের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে তুমি যে ফাঁসির মঞ্চে সেদিন আমাকে তুলতে পেরেছিলে, এই গ্লানি আমি এই জীবনে ভুলব না।

তাই সাবধান দীপকবাবু। আবার বলছি, ভবিষ্যতে আর কখনো আমার বিরুদ্ধে অগ্রসর হবার চেষ্টা করো না।

তুমি জেনে রেখো, যে-কোনও মানুষ একদিন না একদিন বিপন্ন হতে পারে, হয়ত একদিন আমিও বিপন্ন হয়েছিলাম। কিন্তু তুমি যে কোনও দিন হওনি বা হবে না, কেউ বলতে পারে না।

আমার আন্তরিক প্রীতি জানিয়ে শেষে লিখছি যে, হয় তুমি আমার পিছনে ফলো করা বন্ধ করো অন্যথায় তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।

ইতি—
ড্রাগন

।। দশ।।

বিপদের মুখে দীপক

পরদিন বিকেলে।

দীপক ঘরে এসে কথা বলছিল একজন ছোটখাটো পুলিশ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে। তার নাম অনন্তরাম।

অনন্তরাম বলছিল—দীপকবাবু, আপনি বিশ্বাস করুন, ড্রাগনের যে খবর আমি পেয়েছি তা সঠিক ও নিশ্চিত।

—কি করম?

—তার দলের একজন লোককে আমি একটু আগে লেক রোডের একটা বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখলাম।

—ঠিক দেখেছেন?

—নিশ্চয়।

—দেখতে কোনও ভুল হয়নি তো?

—না।

—ঠিক আছে। নম্বর কত বাড়িটার?

—ছাব্বিশ বাই চার।

—ঠিক আছে! যদি তাকে ধরতে পারি, মোটা টাকা পুরস্কার পাবে তুমি।

—আচ্ছা।

তাহলে আর দেরী করে লাভ নেই—তুমি যাও। আমি উঠছি।

দীপক উঠে দাঁড়াল।

একটু পরে—

রতনকে ঠিকানাটা বলে দিয়ে দীপক রওনা হলো লেক রোডের দিকে।

সন্ধ্যার আঁধার নেমে এসেছে লেক রোডের বুকে। দীপক ছদ্মবেশে বের হলো লেক রোডের দিকে। অনন্তরাম যে ঠিকানা দিয়েছে সেখানে সত্যিই ড্রাগন থাকে কি না তা জানতে হবে।

দীপক একটু পরে উপস্থিত হলো নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

দেখল বাড়িটা বেশ সুন্দর ও ছিমছাম ধরনের। তবে বড় রাস্তার উপরে নয়, একটু ভিতরের দিকে ঐ বাড়িটা।

দীপক ভাল করে লক্ষ্য করল ঐ বাড়িটাকে।

দরজা-জানালা প্রায় সব বন্ধ। লোকজন ভিতরে কেউ আছে কিনা বা ক'জন আছে তা বোঝা যায় না।

দোতলায় একটা ঘরে আলো জ্বলছে। বাকিটা একদম সম্পূর্ণ আঁধার।

দীপক ভাবল, হয়ত অনন্তরাম ভুল করেছে। এমন বাড়িতে কি ড্রাগনের দলপতি থাকতে পারে?

তবুও ভাবল, দেখা যাক না কি ব্যাপার। খোঁজ নিতে দোষ কি?

দীপক ধীর পায়ে বাড়ির সামনের অংশ ছেড়ে পিছনের দিকে এসে দাঁড়াল।

সামনের একটা গলিপথ ঘুরে পিছন দিকে যেতে হয়। দীপক নিঃসংকোচে

সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো।

দীপক কি করবে ভাবছে—এমন সময় ঘটল এক অভাবনীয় ব্যাপার।

বাড়ির পিছন দিকের প্রাচীরটাতে একটা ছোট দরজা ছিল সেটা ছিল বন্ধ।

আচমকা উদ্যত পিস্তল হাতে করে তিনটি মূর্তিকে দেখা গেল ঝপাৎ করে দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াতে।

দীপক বিস্ময়ে হতবাক!

এত তাড়াতাড়ি দরজা খুলে যেতে পারে, আর এই তিন মূর্তি বেরিয়ে আসতে পারে পিস্তল হাতে, তা দীপক ধারণাও করতে পারেনি।

কিছু বলার আগেই সে বিস্মিত ভাবে সব দেখে ধীরে ধীরে দু'হাত উপরে তুলে দাঁড়াল।

দীপক বুঝতে পারল যে, আগে থেকেই তার উপরে নজর রেখেছিল ওরা বাড়ির ভিতর থেকে। সে কিছুই বুঝতে পারেনি।

সে গলিপথে ঘুরে বাড়ির পিছন দিকে আসতেই সুযোগ বুঝে ওরা আক্রমণ করেছে।

কিন্তু আগে কিছুই বুঝতে পারেনি বলে মুশকিল পড়েছে। এখন ওদের বাধা দেওয়া অসম্ভব।

ওদের একজন পিস্তল নামিয়ে এসে দীপককে বেঁধে ফেলল।

বন্দী দীপক নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে লাগল। কিন্তু তার কিছুই করার ছিল না।

একজন ঠাট্টা করে বলল—কি হে গোয়েন্দাপ্রবর? কর্তাকে ফাঁসিতে লট্‌কাবে না? এবার দেখো, কর্তা তোমার গা থেকে চামড়া খুলে নিয়ে তোমাকে হত্যা করবেন।

দীপক কোন উত্তর দিল না।

দীপককে বন্দী করে একটা ঘরের মধ্যে হাত পা বাঁধা অবস্থায় আট্‌কে রাখল ওরা।

।। এগার ।।

মৃত্যুর ফাঁদ

বন্দী হবার পর যেন অজস্র ক্লান্তি দীপকের সারা দেহ-মনকে অবসন্ন করে তুলল।

ধীরে ধীরে সে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল। তার দেহে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই—এমনি অবস্থা তখন।

ঘুম থেকে উঠল প্রায় কয়েক ঘণ্টা পরে। দেখতে পেলো, ড্রাগন মুখোস পরে ঘরে প্রবেশ করছে। আর তার সঙ্গে একজন অনুচর। দু'জনের হাতেই উদ্যত পিস্তল।

ড্রাগন বললে—কি হে, ঘুম ভাঙল?

—তা তো দেখতেই পাচ্ছো।

—তা পাচ্ছি। তবে তোমার ঔধত্য আর সহ্য করতে পারছি না জেনে রাখো।

—তা ভাল করেই জানি।

—এবার ভগবানকে স্মরণ কর। কারণ তোমার মৃত্যু আসন্ন।

—মৃত্যুকে যে আমি ভয় করি না, তা তো তুমি ভালো করেই জানো ড্রাগন।

—জানি। তবে আর একবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম।

—তার প্রয়োজন হবে না। এর আগে বহুবার আমার জীবনে মৃত্যু এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। অবশ্য যেদিন প্রকৃত মৃত্যু আসবে সেদিন আমি তাকে ফেরাতে পারব না, তবে জানো তো দুর্বল লোকেরা মরবার আগে বহুবার মারা যায়।

—তা জানি। তবে এটা নিশ্চিত জেনো তোমার জীবনে এই হলো শেষ মুহূর্ত।

—তা বেশ তো।

—এই যে দেখছো মেঝে—যার উপরে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, আমি সুইচ টিপে দিলে তা সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে যাবে। আর তা নেমে যাবার পর আর একটা সুইচ টিপলেই অঝোরে জল পড়তে শুরু করবে। ধীরে ধীরে সারাটা ঘর জলে ভরে যাবে। আর এর মধ্যে ডুবে দম বন্ধ হয়ে তিল তিল করে তোমাকে মরতে হবে।

দীপক কোনও উত্তর দিল না।

ড্রাগনের অট্টহাসি শোনা গেল—হাঃ হাঃ হাঃ—

তারপর সে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

দীপক বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। একটু পরে—

দীপক শুনতে পেলো একটা ঘড় ঘড় শব্দ। ধীরে ধীরে মেঝে সমেত সে নীচে নেমে যাচ্ছে।

ঘটাং—

মেঝেটা তাকে নিয়ে একটা ভূগর্ভস্থ কক্ষে এসে থামল।

দেখা গেল আর একটা নকল ছাদের মত এসে ঘরটা বন্ধ করার শব্দ হলো একটা—আর ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল।

দীপক আঁতকে উঠল।

জল সমানে পড়ছে। জল বাড়তে বাড়তে ক্রমে উপরে উঠতে লাগল। প্রথমে পায়ের পাতা ডুবল। তারপর হাঁটু পর্যন্ত জল উঠল।

দীপক বের হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু সব চেষ্টা নিষ্ফল হলো।

জল তার বুক পর্যন্ত উঠল।

ওপর থেকে ভেসে এলো শুধু ড্রাগনের অট্টহাসি—হাঃ হাঃ হাঃ—

দীপক প্রমাদ গুণল।

ঠিক এমনি সময় ঘটল একটা ঘটনা—যা দীপক কল্পনা করতেও পারেনি।

মানুষের জীবনে অবিশ্বাস্য অকল্পনীয় ঘটনাও যে কত আকস্মিকভাবে ঘটতে পারে, এ যেন তারই প্রমাণ।

রতনলালকে দীপক বের হবার সময়ে বলে গিয়েছিল যে সে অনন্তরামের কাছ থেকে খবর নিয়ে, লেক রোডের নির্দিষ্ট বাড়িতে যাচ্ছে অনুসন্ধান করতে—সত্যই বাড়িটা ড্রাগনের গোপন আড্ডা কিনা।

দীপক আরও বলেছিল যে, যদি তার ফিরতে অস্বাভাবিক দেরী হয়, বহু সময় অতীত হলেও যদি সে ফিরে না আসে, তাহলে রাত এগারোটার পর রতন যেন মিঃ সেনকে খবর দেয় লালবাজারে।

এগারোটা বেজে পনেরো মিনিট হয়ে গেল। তখনো ফিরে এলো না দীপক। রতন চিন্তিত হলো।

সে লালবাজারে ফোন করল মিঃ সেনকে। মিঃ সেন ফোন ধরলেন।

—হ্যালো, কে?

—আমি রতন।

—কি ব্যাপার?

—দীপক ড্রাগনের একটা গোপন আড্ডার খবর পেয়ে সেখানে গোপনে খোঁজ নিতে গেছে। সে বলেছে যে, এগারোটার মধ্যে সে না ফিরলে আমি যেন আপনাকে জানাই।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আমার সন্দেহ হচ্ছে সে বোধহয় বিপদে পড়েছে।

তা অসম্ভব নয়।

—তাহলে এখন কি কর্তব্য বলুন?

—ঠিকানাটা আপনি জানেন?

—তা জানি। দীপক যাবার আগে আমাকে বলে গেছে।

—ঠিক আছে। তাহলে আপনি এক্ষুণি একবার লালবাজারে চলে আসুন।

ও, কে। আপনি কি এক্ষুণি অভিযানে বের হবেন?

নিশ্চয়, না হলে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে।

—তা বটে।

রতন তৎক্ষণাৎ রওনা হলো লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টারের উদ্দেশ্যে।

।। বারো।।

পরিশেষ

লালবাজারে এসে মিঃ সেন খুব তাড়াতাড়ি দলবল নিয়ে তৈরি হয়ে নিলেন।

তারপর তিনটি ভ্যানে করে চলল পুলিশবাহিনী নির্দিষ্ট বাড়িটার দিকে।

প্রথম ভ্যানে চলেছিল ছদ্মবেশী পুলিশ। তারপর একটা জীপ—তাতে মিঃ সেন আর রতন। সবার শেষে দুটি ভ্যান—তাতে আর্মড পুলিশ বোঝাই।

নির্দিষ্ট বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে পুলিশ ভ্যান থামল।

তারপর মিঃ সেন, রতন ও ছদ্মবেশী পুলিশদল এগিয়ে চলল বাড়িটার দিকে।

বাড়িটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। যেন আফিম খেয়ে ঘুমোচ্ছে সারা বাড়ির প্রতিটি মানুষ—এমনি নিস্তব্ধতা।

মিঃ সেন গিয়ে কড়া নাড়লেন। খট খট খট....

কোনও শব্দ এলো না ভিতর থেকে। আবার কড়া নাড়া হলো।

কে? ভিতর থেকে প্রশ্ন ভেসে এলো।

—দরজা খুলুন। কোনও উত্তর নেই।

—দরজা খুলুন, বিশেষ জরুরী দরকার আছে—তবু দরজা খুলল না।

গুড়ুম। পিস্তলের শব্দ ধ্বনিতে হলো। রতন ও মিঃ সেন বসে পড়লেন তারপর পথেই শুয়ে পড়লেন।

গুলি ছুটে আসতে লাগল বাড়িটার মধ্য থেকে।

রতন চাৎকার করে উঠল—মিঃ সেন, এই বাড়িটাই ওদের আড্ডা।

মিঃ সেন অর্ডার দিলেন—কাম্ অন্—ফায়ার।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশবাহিনী পিছনের দুটি ভ্যান থেকে ছুটে এলো।

অবিরাম গুলি চলতে লাগল।

পুলিশবাহিনী গুলি শুরু করার একটু পরেই, ওদের গুলিবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ।

রতন বললে—দরজা ভেঙে ফেলুন স্যার।

—ব্রেক, ওপন্।—মিঃ সেন অর্ডার দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গুলি করতে করতে পুলিশবাহিনী এগিয়ে গিয়ে দরজায় প্রচণ্ড বেগে লাথি মারতে লাগল।

কয়েকবার লাথি মারতেই দরজা ভেঙে পড়ল।

পুলিশ ভিতরে প্রবেশ করল।

বন্দুক উঁচিয়ে সদলে পুলিশরা ঢুকতে লাগল বাড়ির মধ্যে।

পুলিশবাহিনী প্রতিটি ঘর সার্চ করতে লাগল।

দু'তিন জন ড্রাগনের অনুচর আহত হয়েছিল। তাদের সবাইকে একে একে তোলা হলো পুলিশের গাড়িতে।

পুলিশবাহিনী ড্রাগনকে কোথাও খুঁজে পেল না। দীপককেও পাওয়া গেল না। তখন তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করে দিল।

অবশেষে একতলার এক কোণে দেখতে পেলো ছোট একটা কক্ষ।

তার মেঝের তলা থেকে জলের শব্দ ভেসে আসছিল—কল্ কল্—

তারপর হঠাৎ রতনের দৃষ্টি পড়ল কোণের একটা সুইচের উপর।

—এটা কিসের সুইচ?—রতন প্রশ্ন করল।

—নিশ্চয় ওটা টিপলেই এই মেঝেটা সরে যাবে।

রতন সুইচ টিপল। ঘড় ঘড়—

মেঝের একটা অংশ সরে গেল। দেখা গেল একটা সুড়ঙ্গপথ।

তার নিচে একটা ঘর। ঘরটা জলে জলময় হয়ে গেছে।

দীপকের সারা দেহ ডুবে গিয়েছিল এতক্ষণ। সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। রতন ও মিঃ সেন তাকে উপরে টেনে তুললেন।

তারপর একটু চেষ্টা করতেই ধীরে ধীরে দীপকের জ্ঞান ফিরে এলো।

চোখ মেলল দীপক—আমি কোথায়?

—ড্রাগনের আড্ডায়।

সব কথা মনে পড়ল দীপকের। তার কানে যেন তখনো বাজছিল ড্রাগনের সেই অট্টহাসি।

—যাক্। এ যাত্রা খুব বেঁচে গেছি। দীপক বলল—ক'জন লোক ধরা পড়েছে ওদের?

—তিন জন।

—ড্রাগন?

—ড্রাগন অদৃশ্য—নিশ্চয় সে গোপন সুড়ঙ্গ পথে পালিয়েছে।

তাহলে এত চেষ্টা সব ব্যর্থ?

—তা তো বটেই।

দীপক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কেউ কোন উত্তর দিল না।

অজানা দ্বীপে ড্রাগন

।। এক।।

হলধর হালদার

হালসীবাগানের হলধর হালদার হাড়কিপ্‌টে। পাড়ায় তার হরেক রকম দুর্নাম।

লোকে বলে, সকালে উঠে তার নাম করলে নাকি হাঁড়ি ফেটে যায়—কপালে ভাত জোটে না।

কথাটা মিথ্যে নয়।

কৃপণ মানুষ অনেক দেখা যায় বটে, কিন্তু তাদের সকলকে ছাপিয়ে যায় হলধর।

বেলগাছিয়ার খাল-পুলের ঠিক নিচে হলধরের পৈতৃক আমলের তামাক আর চিটে-গুড়ের দোকান।

আয় নেহাত কম হয় না তা থেকে! তা ছাড়া, ছোটখাট মহাজনী ব্যবসাও তার আছে। তাতেও কিছু কিছু আয় হয়।

হলধর যে টাকা একবার ব্যাঙ্কে রাখা তা আর কোনও দিন তোলে না। তার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কত, তা সে জানে। কিন্তু তার সিন্দুকে যে কত টাকা জমেছে তা সঠিক বলতে পারে না।

পরনে ছঁহাতি ধুতি আর সাধারণ পাঞ্জাবি—পায়ে নিউকাট জুতো। এই হলো তার পোশাক।

অনেকে প্রশ্ন করেন—আচ্ছা হলধরবাবু, এত টাকা আছে আপনার অথচ এত কম খরচে চালান কেন? এরকম পোশাকই বা পরেন কেন?

হলধর হেসে বলল—দেখুন, আমি হলুম মা লক্ষ্মীর সিন্দুকের পাহারাদার মাত্র। এ টাকা খরচ করার কোনও অধিকার আমার নেই। আমি শুধু খাওয়াপরা বাবদ আমার টাকা খরচ করি মাত্র।

বাড়িতে স্ত্রী নয়নতারা আর একটিমাত্র ছেলে বাবলু ছাড়া আর কেউ নেই।

হলধরের বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ হবে। নয়নতারার বয়স ছত্রিশ। নয়নতারা প্রকৃতই সুন্দরী। তবে অত্যন্ত নিরীহ ও নরম ধরনের মেয়ে সে। তাই স্বামীর কৃপণ স্বভাবের জন্যে সে কিছু বলে না।

সে ওকে ভাগ্য হিসেবে মেনে নেয়।

অনেকদিন থেকেই হলধরের ইচ্ছে, সে নতুন একটা ব্যবসায়ে কিছু লগ্নী করে।

ভাল ব্যবসা হ'লে টাকা খাটাতে তার কোনও আপত্তি নেই। তবে নিশ্চিত ভাল ব্যবসা সে পায় না বলে ও নিয়ে মাথা ঘামায় না।

এমন সময় একদিন হঠাৎ একটা ব্যবসায়ের সুযোগ এসে গেল তার সামনে।

হলধরের এক দূর সম্পর্কের শ্যালকের নাম বিনয়।

বিনয় যে কি করে তা কেউ জানে না—তবে সে লোককে বলে যে, সে ছোটখাট ব্যবসা করে।

মাঝে মাঝে তার হাতে টাকা থাকে না—আবার কখনো বা প্রচুর অর্থ এসে যায়।

কোত্থেকে যে হঠাৎ টাকা সে পায়, তা কেউ বলতে পারে না।

এই বিনয় একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হলধরের কাছে! পরনে দামী স্যুট, পায়ে জুতো, মুখে সিগারেট।

বললে—নতুন একটা ভাল ব্যবসার ব্যবস্থা করে দিতে পারি জামাইবাবু। করবেন?

—কিসের ব্যবসা?

—ব্যবসাটা ভালই, তবে এতে টাকা যে লাগবে অনেক! তবে এতে প্রচুর লাভ। আর তা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়।

—কিসের ব্যবসা?

—অর্ডার সাপ্লাইয়ের।

—তার মানে?

—মানে বিভিন্ন কোম্পানীর বিভিন্ন জিনিসের অর্ডার নিয়ে তা আমরা সাপ্লাই করব।

—অর্ডার দেবে কারা?

—বড় বড় যত সাহেব বা দেশী কোম্পানীরা নানারকমের জিনিসের প্রচুর অর্ডার দেয়। সেই সব মাল অনেক কম দামে বাজারে পাওয়া যায়। টাকা সঙ্গে সঙ্গেই পেমেণ্ট।

ব্যবসাটা ভালই মনে হয়।

—তা বটে, তবে অনেক টাকা চাই। টাকা হলে সেণ্ট পারসেণ্ট লাভ।

—কি রকম?

—তা ধরুন চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা।

—টাকা উপার্জন করতে ক'দিন লাগবে?

—বড় জোর দু'সপ্তাহ—তার বেশি নয়।

—ঠিক আছে। তা হলে চল ওদের অফিসটা দেখে আসি।

—হ্যাঁ, চলুন।

হলধর বললে—অফিস ক'টায় খোলে?

—বেলা সাড়ে দশটায়। সাহেব আসেন বেলা এগারটার সময়। তিনিই মালের অর্ডার দেন। এরকম দু'তিনটে অফিসে নিয়মিত মাল সাপ্লাই করতে পারলে প্রচুর লাভ হবে।

—বুঝেছি।

—আপনি তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া সেরে নিন। তারপর চলুন বেরিয়ে পড়ি।

হলধর বিনয়ের জন্যে চা ও খাবারের ব্যবস্থা করে চলে গেল স্নান-খাওয়া করতে।

বেলা এগারোটা বেজে গেল। হলধর বিনয়ের সঙ্গে বের হলো ধর্মতলার দিকে সেই সাহেব-কোম্পানীর অফিসে।

বেশ সুন্দর সাজানো-গোছানো অফিস। চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে সব ফার্ণিচার।

তিন চারটি কেরানী কাজ করছে বসে।

একপাশে সুন্দরী দুটি লেডি টাইপিস্ট টাইপ করে চলেছে অবিরাম—খটাখট—খটাখট—

অন্যদিকে এন্‌কোয়ারি কাউণ্টারে সুন্দরী একটি অ্যাংলো মেয়ে বসে আছে।

বিনয় তার কাছে গিয়ে বলল—সাহেব আছেন?

—না, তিনি নেই—এক্ষুণি হয়তো আসবেন। আপনারা বসুন।

—ধন্যবাদ।

বিনয় আর হলধর বসে রইল চুপ করে। মিনিট কুড়ি পরে একজন সুদর্শন সাহেব প্রবেশ করলেন। পরনে দামী স্যুট। সকলে তাঁকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়।

তিনি তাঁর চেম্বারে ঢুকে পড়লেন।

বিনয় কার্ড পাঠাল। তিনি একটু পরেই তাদের ডেকে পাঠালেন।

বিনয় ঢুকল হলধরকে সঙ্গে করে।

—কি চাই আপনাদের? সাহেব প্রশ্ন করলেন।

—স্যার, আমরা আপনার মেশিনারী পার্টস-এর সাপ্লাইয়ের অর্ডারটার জন্য এসেছি।

—আপনারা পারবেন সাপ্লাই করতে?

—হ্যাঁ। রেট কত করে দেবেন?

ছ'টাকা পিস। দশ হাজার পিস্ চাই।

—ঠিক আছে। আপনি স্যাম্পল্ দেখান।

সাহেব একটা স্যাম্পল্ বের করে দিলেন ড্রয়ার থেকে।

বিনয় বললে—আমরা ঘণ্টাখানেক পরে কন্ট্রাক্ট করব স্যার।

—ঠিক আছে।

বিনয় হলধরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অর্ডারের মালটা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

হলধর বললে—কোথায় এটা পাওয়া যায়, তা জান তুমি?

—জানি, কানিং স্ট্রীটে।

—দাম কতো করে?

—পিস্ প্রতি সাড়ে তিন টাকা। আমি দেখেছি জামাইবাবু।

—তবে চলো সেখানে।

দু'জনে এলো ক্যানিং স্ট্রীটে। মালটা ওরা দেখাল নির্দিষ্ট দোকানটিতে। বিনয় প্রশ্ন করলে কত করে পিস এগুলো?

—সাড়ে তিন টাকা।

—দশ হাজার পিস হবে?

—তা হবে।

—ক'দিন লাগবে সাপ্লাই করতে?

—তিন-চার দিন বড়জোর।

—ঠিক আছে। মালটা ছাড়বেন না—আমরা ওটা নেবো স্থির করেছি।

—ঠিক আছে।

হলধর খুশী হয়। সাত-আট দিনের মধ্যে নগদ পঁচিশ হাজার টাকা লাভ হবে। সে তক্ষুণি বলে—চল, আমরা আগে সাহেবের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে আসি। তারা আবার ফিরে আসে ধর্মতলায় সাহেবের অফিসে।

।। দুই।।

চক্রান্তের জাল

হলধর ধর্মতলার অফিসে ফিরে এসেই বিনয়কে সঙ্গে নিয়ে দেখা করল সাহেবের সঙ্গে।

সাহেব বললেন—কি হলো আপনারা কি মালটা দিতে পারবেন?

—হ্যাঁ স্যার।

—তা হলে কি কনট্রাক্ট করব?

—করুন।

—কিন্তু দু'হাজারের বেশি টাকা অগ্রিম দেবো না। বাকীটা অন ডেলিভারী।

—তাই হবে, স্যার।

তৎক্ষণাৎ সাহেব সেক্রেটারীকে বললেন, কনট্রাক্ট ফর্ম টাইপ করে আনতে।

টাইপ করে আনল টাইপিস্ট। সাতদিনের মধ্যে দশ হাজার পিস স্যাম্পল মতো মাল সাপ্লাই করবে হলধর। দাম মোটমাট ষাট হাজার টাকা। দু'-হাজার টাকা অগ্রিম নিয়ে হলধর কনট্রাক্ট সই করে বেরিয়ে এলো।

বিনয় বললে—তা হলে আমাদের এবার ক্যানিং স্ট্রীটের মালটা কিনতে হবে।

—হ্যাঁ।

—চলুন সেখানে। মোট পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা লাগবে দশ হাজার পিসে। দু'হাজার টাকা আছে। বাকিটা ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে হবে।

বিনয়কে সঙ্গে নিয়ে হলধর গেল ব্যাঙ্কে। তেত্রিশ হাজার টাকা তুলল ব্যাঙ্ক থেকে।

তারপর ফিরে এলো ক্যানিং স্ট্রীটে।

ক্যানিং স্ট্রীটের ভদ্রলোক বললেন—পুরো টাকাটা দিয়ে যান—তিন চার দিনের মধ্যে মাল পাবেন। আমি অগ্রিম টাকাটা নিয়ে রসিদ দিচ্ছি।

—ঠিক আছে।

হলধর মোট পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে রসিদটা নিয়ে বাড়ি ফিরল। তার মন খুশিতে ভরে উঠল।

বিনয়কে বললে—মাঝে মাঝে এরকম আরও অর্ডার ধরতে পার?

—নিশ্চয় পারি।

—বেশ তবে আমাকে জানিও।

—জানাবো।

হলধর বাড়ি ফিরল। বিনয়কে বললে—তিনদিন পরে দেখা করতে।

তিনদিন পরে।

বিনয় আর হলধর ক্যানিং স্ট্রীটে গেল মাল ডেলিভারী নিতে।

তারা ন'হাজার আটশো পিস মাল ডেলিভারী দিল। বললে—আর মাল নেই। দুশো পিস্ মাল কম আছে। তার জন্য তারা টাকা ফেরত দিল—সাতশো টাকা ফেরত দিল তারা।

হলধর দেখল, অর্ডার সাপ্লাই করার তখনো তিন-চার দিন বাকী আছে। সে বাজারে তন্ন তন্ন করে খুঁজল—ঐ মালটা । দুশো পিস অন্যত্র পাওয়া যায় কিনা দেখল। কিন্তু কোথাও ঐ মাল পাওয়া গেল না।

হলধর চিন্তিত হলো।

সপ্তম দিন।

হলধর বিনয়কে নিয়ে গেল সাহেবের ধর্মতলা স্ট্রীটের অফিসে। বললে, ন'হাজার আটশো পিস মাল জোগাড় হয়েছে। দুশো পিস কম আছে।

সাহেব গম্ভীরভাবে বললেন—আমি চাই পুরো দশ হাজার পিস। এক পিসও কম হলে আমার চলবে না। তা হলেই কনট্রাক্ট ক্যানসেলড হবে।

হলধর মাথায় হাত দিল।

সাহেব বললে—আমার দু'হাজার টাকা অ্যাডভান্স যায় যাক্—কম মাল আমি নিতে পারবো না।

হলধর আর কি করে। সে ন'হাজার আটশো পিস মাল ফেরত নিয়ে চলল।

বিনয় বললে—ভয় নেই, বাজারে অনেকটা বিক্রি হয়ে যাবে। মল্লিক বাজারে দেখুন।

—তুমি যাবে না?

—না, একটা জরুরী কাজ আছে।

জরুরী কাজের অজুহাতে বিনয় কেটে পড়ল।

হলধর একটা ঠেলায় করে মাল চাপিয়ে নিয়ে চলল মল্লিক বাজারে।

তারা মালটা দেখে বললে মালের বাজারে কোনও ডিম্যাণ্ড নেই। এ মালের দাম বড়জোর বারো পয়সা পিস।

হলধর মনের দুঃখে মাল ফেরত নিয়ে বাড়ি ফিরল।

মনে মনে সে চিন্তা করতে লাগল, কি করা যায় এই ব্যাপারে।

পুলিশে খবর দেবে সে?

তা মন্দ নয়। এটা তো প্রকৃতপক্ষে একটা চিটিং কেস ছাড়া আর কিছু নয়।

হলধর চিন্তিত মনে চলল লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের উদ্দেশ্যে।

।। তিন ।।

ড্রাগনের ছোঁয়া

পরদিন বেলা দশটা। হলধরের সঙ্গে লালবাজারের পুলিশ অফিসার মিঃ গুপ্তের সামান্য জানাশোনা ছিল। হলধর গিয়ে সব কথা জানাল মিঃ গুপ্তকে।

মিঃ গুপ্ত সব শুনে বললেন—অত্যন্ত অদ্ভুত ধরনের কেস এটা।

—কি করা যায়?

—কনট্রাক্টটা দেখি।

হলধর সেটা দেখাল।

সেটা পড়ে মিঃ গুপ্ত বললেন—এটা তো দেখছি পুরো সিভিল অ্যাক্টের কেস।

—হ্যাঁ।

—তাহলে কিছু করা যাবে না।

—সিভিল কেস করব?

—কোনও লাভ নেই। আপনি ব্রীচ্ অব কন্ট্রাক্ট করেছেন, দোষ তো আপনারই।

—তা বটে। তা হলে উপায়?

—উপায় মোটেই নেই। কারণ আপনি মালটা আগে সব কিনে তারপর কন্ট্রাক্ট করলে ভালো হতো।

—তা ওরা করত না।

—তা ঠিক। ঐ দুটো কোম্পানীই একই দলের লোক বলে মনে হয়। আর বিনয় এর মধ্যে জড়িত।

—আমারও তাই মনে হয়।

—বিনয়ের ঠিকানা জানেন?

—জানি, হ্যারিসন রোডের একটা হোটেল থাকে। ফোনও আছে।

মিঃ গুপ্ত ফোন করলেন সেখানে। শুনলেন বিনয় আগের দিন মালপত্র নিয়ে চলে গেছে হোটেল ছেড়ে।

মিঃ গুপ্ত বললেন—আপনি একটা ডায়েরী লিখে রাখুন। জেনারেল ডায়েরী।

—ঠিক আছে।

—আর আমি চেষ্টা করে দেখি যদি কিছু করা যায়।

ডায়েরী লেখা হলো।

হলধর উঠতে যায় এমন সময় হঠাৎ মিঃ গুপ্তের ফোন বেজে উঠল ঘন ঘন। ফোন তুললেন মিঃ গুপ্ত।

—হ্যালো, কে?

—আমি ড্রাগন কথা বলছি।

—ড্রাগন?

—হ্যাঁ।

—কি ব্যাপার?

—এইমাত্র আপনার সামনে যে লোকটি বসে আছেন তিনি হলধরবাবু তো?

—হ্যাঁ।

—তাঁর তেত্রিশ হাজার টাকার কেসটা বোধ হয় তিনি ফাইল করেছেন আপনার কাছে?

—তাতে তোমার কি?

—এটা যে আমারই কীর্তি।

—তোমার?

—হ্যাঁ, তা ছাড়া এত ভাল ব্রেন কার হবে যে, এমন আইনগত ভাবে চিট করবে?

—আমিও তাই ভাবছিলাম।

—সে যাই হোক, আমি লুকিয়ে কোনও কাজ করতে ভালবাসি না। তাই সব কথা আপনাকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলাম।

—ঠিক আছে। তবে তোমার এ গর্ব বেশিদিন থাকবে না।

—এতদিন চেষ্টা করেও ধরতে পারেন নি আমাকে—তবু একথা বলছেন? বলে হাসতে হাসতে ড্রাগন ফোন নামিয়ে রাখে।

সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন বেজে উঠল প্রখ্যাত রহস্যসন্ধানী দীপক চ্যাটার্জীর ড্রইংরুমে।

রিসিভার তুলল দীপক।

—হ্যালো, কে?

—আমি মিঃ গুপ্ত বলছি।

—কি ব্যাপার?

—ব্যাপার বড় ভয়াবহ। তেত্রিশ হাজার টাকার চিটিং কেস একটা।

—কে চিট করল?

—ড্রাগন।

—ড্রাগন! সে কি?

—হ্যাঁ, সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলছি।

সংক্ষেপে মিঃ গুপ্ত ঘটনাটা খুলে বললেন দীপককে। দীপক সব শুনে বললে—হ্যাঁ, এই অবশ্য ড্রাগনের দল এখানে করেছে—তবে বিদেশে এর চেয়ে ভয়াবহ সব ঘটনা শোনা যায়। ভারতেও এ ধরনের কাজ কিছু কিছু করা হয়!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, একে বলা হয় সেলিং-বাইং বা বিজনেস চিটিং। এ কেস প্রমাণ করা খুব শক্ত—কারণ এটা সিভিল অ্যাক্টের কেস হয়ে দাঁড়ায়।

—বুঝেছি।

—ঠিক আছে। আমি দেখা করব লালবাজারে। সব কথা সেখানেই বলব। মিঃ গুপ্ত রিসিভার নামিয়ে রাখেন।

।। চার।।

হোটেলে নরহত্যা

পরদিন সকাল।

দীপক চা ও জলখাবার শেষ করে সোজা চলে আসে লালবাজারে।

মিঃ গুপ্ত তাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

বললেন—ব্যাপার তো সব শুনলেন।

দীপক বলে—হ্যাঁ। তবে একটা—

—কি?

—এখানে কন্‌স্পিরেসি বা চিটিং বাই কন্‌স্পিরেসি প্রমাণ করা যাবে না সহজে।

—কেন?

—কারণ দুটো পৃথক অফিস। আর যারা মাল নেবার চুক্তি করল, তাদের মাল সাপ্লাই দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই কন্‌ট্রাক্ট ফুলফিল না করতে পারলে তাদের কোনও দোষ নেই। তারা মাল না নিতেও পারে।

—কিন্তু কোনও ভাবেই কি ব্যাপারটা প্রমাণ করা যায় না দীপকবাবু?

—যায়, যদি বিনয় স্বীকার করে।

—কিন্তু বিনয় তো নেই—

—তার ঠিকানা জানেন না?

—জানি। তবে সে সেখান থেকে চলে গেছে।

—কোথায়?

—তা জানি না।

দীপক একটু ভেবে বলে—বিনয়কে ভয় দেখিয়ে যদি অ্যাপ্রুভাল করানো যায় তা হলে কেসটা প্রমাণ হতে পারে। তবে তা সম্ভব হচ্ছে না।

—তা বটে।

কিন্তু বিনয় হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হলো?

—বোধ হয় সে আগেই ভয় পেয়ে পালিয়েছে। কারণ হলধরবাবু যে পুলিশে খবর দিয়েছেন তা সে জানতে পেরেছে হয়তো।

—তা বটে।

—কবে থেকে সে নেই?

—কনট্রাক্ট ক্যানসেল হবার পর থেকেই সে একেবারে উধাও।

—কনট্রাক্ট ক্যানসেল হলো কবে?

—তা দিন দু'তিন হলো।

—তার মধ্যেই হলধরবাবু মাল বেচতে গেছলেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

দীপক একটু ভেবে বললে—তা হলে এখন আমাদের দু'টি কাজ করার আছে। প্রথমটা হলো, ড্রাগনকে খুঁজে বের করা আর দ্বিতীয়টি হলো, বিনয়ের অনুসন্ধান করা।

—ঠিক কথা।

—এর মধ্যে প্রথমটা খুব কঠিন কাজ, তবে দ্বিতীয়টা হয়তো কঠিন নয়।

—তা বটে—

এমন সময় হঠাৎ ফোন বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং করে।

রিসিভার তুললেন মিঃ গুপ্ত।

—হ্যাঁলো কে?

—লালবাজার?

—হ্যাঁ।

—আমি পার্ক স্ট্রীটের রিগ্যাল হোটেল থেকে কথা বলছি।

—কে আপনি?

—আমি ম্যানেজার মিঃ সোম।

—কি ব্যাপার?

—ব্যাপার খুব সিরিয়াস।

—তার মানে?

—মার্ডার কেস।

—কোথায়?

—আমার হোটেলে।

—কখন মার্ডার হয়েছে?

—বোধ হয় কাল রাতে। আজ সকালে ডেডবডি পাওয়া গেল।

—তাই নাকি? তা ঘটনাটা কি?

—আমাদের হোটেলে দু'তিন দিন হলো একটি নতুন বোর্ডার আসেন তিনি বড় একটা বের হতেন না। নিজের ঘরেই থাকতেন। তাঁর কাছে প্রায় আট হাজার টাকা ছিল।

—তারপর?

—তিনি সাতদিনের টাকা অগ্রিম দিয়ে এই হোটেলে ওঠেন। কাল রাতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন খাওয়া-দাওয়া শেষ করে। আজ সকালে আটটা পর্যন্ত তিনি দরজা

খোলেন নি। তিনি ঘুমোচ্ছেন মনে করে বয় তাকে জাগায় নি।

সাড়ে আটটা নাগাদ উঠছেন না দেখে বয় ঘন ঘন কড়া নাড়তে থাকে। অনেকক্ষণ কেটে যায়। তবু ঘুম ভাঙে না তাঁর। তারপর আমরা ঘরের দরজায় ধাক্কা দিই। সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে ফেলি।

—ভেঙে কি দেখেন?

—লোকটি বিছানায় শুয়ে আছে। দেহে হাত দিয়ে দেখি প্রাণ নেই।

—দেহে আঘাতের চিহ্ন ছিল?

—না।

—তবে তো মনে হয় পয়জনিং কেস।

—আমাদের তো তাই মনে হচ্ছে। যাই হোক শীগগির চলে আসুন আপনারা।

—বেশ, আমরা আসছি।

মিঃ গুপ্ত রিসিভার নামিয়ে রাখেন।

দীপকের দিকে চেয়ে মিঃ গুপ্ত বলেন—একবার যাবেন নাকি?

—চলুন।

—বেশি দূরে নয়। পার্কস্ট্রীটের রিগ্যাল হোটেলে যেতে হবে।

তারপর পুলিশ ভ্যান নিয়ে মিঃ গুপ্ত দীপককে সঙ্গে করে আসেন ঘটনাস্থলে। বাড়িটার সামনে স্থানীয় থানার কনস্টেবল ছিল।

দীপকের নির্দেশে মিঃ গুপ্ত তাদের চলে যেতে বললেন।

দীপক তখন মিঃ গুপ্তকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন।

দোতলা বাড়ি। দোতলার একটি ঘরে ছিল সেই মৃতদেহটা।

দীপক দেখল মৃতদেহটা নীল হয়ে গেছে।

দীপক বললে—এ পরিষ্কার বিষের কেস!

—কিন্তু কে বিষ দিতে পারে?

—তা তো জানি না।

—মনে হয় কোনও লোকের মাধ্যমে ড্রাগন বিষ দিয়েছে লোকটিকে, কিন্তু তা প্রমাণ করা যাবে না।

—তা বটে। আচ্ছা, একটা কথা।

—বলুন?

—হোটেলে লোকটা তার নাম ঠিকানা লিখে দিয়েছিল?

—তা তো দেবেই।

—তা দেখেই তো লোকটার পরিচয় জানা যাবে। কোন ভয় নেই, এ কেস সল্‌ভ করতে দেরি হবে না।

ম্যানেজার রেজিস্টার নিয়ে আসে।

দীপক দেখে—তাতে নাম লেখা—মিঃ বিনয় বিশ্বাস।

দীপক চিন্তিত হলো।

বললে—একটা ভাল সূত্র পেলাম মিঃ গুপ্ত।

মিঃ গুপ্ত বললেন—সেকি!

—হ্যাঁ।

—তার মানে?

—মানে হলধরবাবুর কেসের আসামীর নাম কি বলুন তো?

—বিনয়।

—আমার মনে হয়, সে এই বিনয় ছাড়া আর কেউ নয়।

—তা হতে পারে।

—আচ্ছা মিঃ সোম, একটা কথা—

—বলুন।

—এ হোটেলের বেয়ারারা সবাই বিশ্বাসী লোক নিশ্চয়ই?

—অবশ্যই।

—তা হলে বেয়ারারা খাবারের সঙ্গে বিষ দেবে না বলেই মনে হয়।

—তা বিশ্বাস করা কঠিন।

—আচ্ছা এই ট্রাঙ্কটা খুলুন তো মিঃ গুপ্ত।

মিঃ গুপ্ত বললেন—কিভাবে খোলা যাবে এই ট্রাঙ্কটা?

—আমার কাছে নকল চাবি আছে। চাবি খুলে দেখুন ভেতরে টাকা পয়সা ঠিক আছে কিনা।

ট্রাঙ্ক খুলে দেখা গেল তাতে আছে মাত্র এক হাজার তিনশো টাকা।

দীপক বললে—তাহলে বয়-বেয়ারারা যে টাকার লোভে খুন করেনি বোঝা গেল।

—তা বটে।

—এবারে পরবর্তী কাজ হলো বডিটা পোস্টমর্টেমে পাঠাবার আগে একবার হলধরবাবুকে ফোন করা ।

—বেশ তো।

দীপক হলধরবাবুকে ফোন করে তৎক্ষণাৎ তাঁকে পার্ক ষ্ট্রীটের রিগ্যাল হোটেলে আসতে বললেন।

একটু পরে হলধরবাবু এসে গেলেন।

দীপক বললে—দেখুন তো এই মৃতদেহটা চেনেন কিনা?

হলধরবাবু বললেন—ভাল করেই চিনি।

—কার বডি এটা?

—এটা নিশ্চিন্তভাবে আমার শ্যালক বিনয়ের ডেড্‌বডি।

দীপক বললে—তা হলে আমি যা সন্দেহ করেছিলাম তাই সত্যে পরিণত হলো।

মিঃ গুপ্ত বললেন—কিন্তু কে বা কারা তাকে হত্যা করল বলুন তো? আর কেনই বা করল?

দীপক বললে—সে রহস্য ভেদ করা খুব কঠিন হবে না মিঃ গুপ্ত।

।। পাঁচ।।

ড্রাগনের হুঙ্কার

তদন্ত শেষ হলো।

দীপক বললে—ড্রাগনের পক্ষে খাবারে কিছু মিশিয়ে হত্যা করা খুব সহজ নয়।

—তা বটে। বললেন মিঃ গুপ্ত।

—আমার মনে হয় সে বা তার অনুচর হয়তো রাতের বেলা কোন ও বিষাক্ত গ্যাস এঘরে প্রবেশ করিয়ে হত্যা করেছে বিনয়কে।

—তাই মনে হয়।

—কিন্তু এখন উপায় কি?

—উপায় প্রকৃত হত্যাকারীকে ধরার প্রচেষ্টা করা।

একটু থেমে দীপক বললে—যা হোক, মৃতদেহ পাঠিয়ে দিন পোস্টমর্টেমে বলবেন আজই রিপোর্টটা চাই।

মিঃ গুপ্ত ডেড্‌বডি পাঠিয়ে দিলেন পোস্টমর্টেমের জন্যে।

এমন সময়—

হঠাৎ হোটেলের ফোন ঘন ঘন বেজে উঠল।

মিঃ গুপ্ত ফোন তুললেন।

—হ্যালো, কে?

—আমি ড্রাগন কথা বলছি।

—ড্রাগন?

—হ্যাঁ।

—ব্যাপার কি?

—ব্যাপার অতি সহজ। আমি স্বীকার করছি যে, আমিই হত্যা করেছি বিনয়কে।

—তুমি?

—হ্যাঁ।

—আমরাও তাই আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু তুমি এমন কাজ কেন করলে ড্রাগন?

—কারণ প্রমাণ লোপ করতে হবে তো।

—প্রমাণ লোপ?

—হ্যাঁ। তা না হলে তো তোমরা একে এ্যাপ্রুভাল করিয়ে কেসটা প্রমাণ করতে। এখন সব প্রমাণ সাপেক্ষ হয়ে গেলে, আর কোনও ভয় রইলো না।

—কিন্তু তুমি এত সহজে দলের লোককে হত্যা করতে পার?

—কে দলের লোক? বিনয় আমার দলের লোক নয়। টাকার লোভে ও আমার অফিসের সেলিং-বাইং-এর দালালীর কাজ করছিল—কিন্তু বিপদ বুঝে আমি তাকে শেষ করেছি।

—কিভাবে ওকে মেরেছ?

—সে তোমরা বের করগে যাও। আমার কোনও প্রয়োজন নেই। ড্রাগন আর কোনও কথা বললে না। রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ড্রাগন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা।

কোলকাতা থেকে অনেক দূরে বজবজ অঞ্চলের একটা বাড়ির একটা গোপন ঘরে চলছিল ড্রাগনের দলের মিটিং।

মিটিং-এ লোক কম ছিল না—প্রায় পনেরো-ষোলজন হবে।

সবাই কম কথা বলছিল।

কেউ বা তাস খেলছিল। এককোণে রেডিওতে গান চলছিল—

আমি যে জলসাঘরে
বেলেয়ারী ঝাড়।
নিশি পোহালে কেহ
চায় না আমায়, জানি গো আর।।

সবাই হাসি ঠাট্টা গল্পগুজবে মত্ত। কারণ প্রত্যেকেই বেশ কিছু টাকা বকশিস পেয়েছে।

এমন সময়—

হঠাৎ ক্রিং ক্রিং করে ঘণ্টাধ্বনি হলো! দপ্ দপ্ করে তিনবার জ্বলে উঠল আলো।

সকলে সচকিত হলো।

রেডিও বন্ধ হয়ে গেল।

পাশের ঘরে সবার আড়াল থেকে কথা বলছিল ড্রাগনের দলপতি।

এ ঘরে ভেসে আসছিল মাইক্রোফোনের ধীর গম্ভীর শব্দ ঃ

বন্ধুগণ,

আমার বর্তমান কাজের সফলতার মূলে তোমরা।

আজ অবধি তোমাদের মতো নানা অনুচরের সাহায্যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছি আমি।

কিন্তু আমার মন খুশিতে ভরে আছে—কারণ তোমরা কখনো বেইমানি করনি।

যা হোক, তোমাদের দু'জনের উপর, আমি একটা জরুরী কাজের ভার দিচ্ছি।

আশা করি তোমরা তা পালন করে তোমাদের কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দেবে শোন, আট নম্বর ও এগারো নম্বর—তোমাদের কর্মপদ্ধতি থেকে জেনেছি তোমরা দু'জনে হলে আমার দলের সবচেয়ে কুশলী লোক।

তাই তোমাদের দু'জনের উপর ভার দিচ্ছি—তিনদিনের মধ্যে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীকে যেমন করে হোক শেষ করতে হবে।

আমি জানি তোমরা তা পারবে। তোমাদের এ কাজের পুরস্কার মোট দশ হাজার টাকা।

আমি চাই, তোমরা এ কাজে সফল হও। দীপকের মতো লোক বেঁচে থাকা পর্যন্ত ভারতে আমরা নিরাপদ নই।

সে বারে বারে আমার চক্রান্ত ভেদ-করেছে। এমন কি সে আমাকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে। ফাঁসির মঞ্চেও আমাকে তুলেছে।

তাই তোমরা যদি তাকে শেষ করতে পার, তোমাদের উপর আমার কৃতজ্ঞতার সীমা থাকবে না।

কথা শেষ হলো।

তিনবার আলো জ্বলে উঠলো।

সবাই বুঝল ড্রাগন প্রস্থান করেছে।

।। ছয় ।।

একটি সূত্র

সেদিন সন্ধ্যায়—

ঘন ঘন ফোন বেজে উঠল।

দীপক ফোন পেলো মিঃ গুপ্তের কাছ থেকে।

দীপক ফোন তুলল। বললে—হ্যালো—কে?

—আমি মিঃ গুপ্ত কথা বলছি। আর্জেন্ট খবর আছে দীপকবাবু।

—কি খবর?

—পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

—হ্যাঁ, তীব্র পরিমাণে কার্বন মনোক্সাইড্ গ্যাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বিনয়কে হত্যা করা হয়।

—আশ্চর্য!

—হ্যাঁ, কিন্তু এটা হত্যা। কি করে যে এরা তা করল বোঝা যায় না।

দীপক হেসে উঠল।

—হাসলেন যে?

—হাসলাম এই জন্যে যে, এটা সহজ কাজ।

তার মানে?

—মানে ড্রাগনের দলের কোনও লোক বোর্ডার সেজে হোটেলে উঠেছিল। তারপর রাতের বেলা সে বিনয়ের ঘরের জানালা দিয়ে সরু একটা নল প্রবেশ করিয়ে ঘরের মধ্যে প্রচুর গ্যাস ভরে দেয়। তার ফলে মারা যায় বিনয়। ভোরবেলা সে হয়তো হোটেল ছেড়ে চলে যায়।

—সে খোঁজ নিয়েছিলাম।

—হোটেল ছেড়ে কেউ গেছে কি?

—হ্যাঁ, তিনজন লোক হোটেল ছেড়ে গেছে। তার মধ্যে দু'জনের নাম ঠিকানা জানা গেছে। তৃতীয়জন যেন নিরুদ্দেশ।

—তবে সেই ড্রাগনের লোক।

মিঃ গুপ্ত আর কিছু না বলে ফোন নামিয়ে রাখলেন।

সেদিন সন্ধ্যায়—

দীপক ড্রাগনের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হতে মনস্থ করেছিল ঠিক সন্ধ্যায়।

বিভিন্ন সব হোটেলে ড্রাগনের দলের লোকের মতো আরও ক্রিমিন্যাল হানা দেয়, দীপক সে জায়গায় অনুসন্ধানে বের হবে বলে স্থির করেছিল।

সন্ধ্যা নামল।

দীপক ঠিক সাতটা নাগাদ বের হলো তার অভিযানে। পরনে ছদ্মবেশ—পুরো পাঞ্জাবীর পোশাক। মুখে চাপ দাড়ি—বড় বড় চুল। পরনের পোশাক ঠিক পাঞ্জাবীর মতোই।

দীপক এবার আগে গেল মিড্ল্যাণ্ড হোটেলে। দীপক জানতো এই হোটেলটা হলো নানা ধরনের ক্রিমিন্যালদের আড্ডা।

অবশ্য ক্রিমিনাল ছাড়া অন্য লোকও অনেক আসে সেখানে। কেউ স্মাগলার,

কেউ ব্ল্যাকমার্কেট করা ব্যবসায়ী, কেউ বা বিরাট ধনীর সন্তান—সবে মাত্র উড়তে শুরু করেছে বাবা মারা যাবার পর।

দীপকের মনের মধ্যে নানা ধরনের চিন্তা খেলা করতে থাকে।

এর মধ্যে কে যে ড্রাগনের লোক তা সে চিনবে কেমন করে?

দীপকের মনের মধ্যে তাই একটা চিন্তার ছায়া খেলা করে বেড়াচ্ছিল।

দীপক টেবিলের এক কোণে চুপচাপ বসে পড়ল। চুপচাপ বসে সে একটার পর একটা খাবার খেতে লাগল ধীরে ধীরে।

সময় কেটে গেল।

রাত ন'টা বাজল।

ঠিক সেই সময়ে দেখা গেল একজন স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘদেহ লোককে হোটেলে প্রবেশ করতে। পরনে সাদা স্যুট। দেখে কোনও রাজপুত্র বলে মনে হয়।

দীপক একটু ভাল করে লোকটাকে দেখল। কারণ লোকটাকে তার চেনা চেনা মনে হচ্ছিল।

দীপক বললে—এই যে মিঃ শর্মা। কি ব্যাপার, আপনি হঠাৎ এখানে?

শর্মা দীপককে চিনতে না পারলেও বললে—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আমি এখানে আসি।

—তা তো আসেন, কিন্তু একটা কথা—

—বলুন?

—আমাকে চিনতে পারছেন?

—না তো!

—আমি দীপক চ্যাটার্জী। ছদ্মবেশ ধারণ করে এখানে এসেছি।

—ও, আপনি দীপকবাবু? নমস্কার।

—নমস্কার।

—তা আপনি হঠাৎ কি মনে করে এখানে এসেছেন শুনি?

—আমি এসেছি একটা বিশেষ ব্যাপার। যদি কিছু সাহায্য করতেন তো মোটা রিওয়ার্ড পাবেন।

—কি ব্যাপার?

—দস্যু ড্রাগনের নাম শুনেছেন?

—নিশ্চয়ই। বর্তমানে কোলকাতার গ্যাসপোস্টগুলো পর্যন্ত তার নাম শুনেছে।

—তাকে বা তার দলের কাউকে চেনেন?

—সে কথা বলা বারণ। কারণ তাতে জীবন বিপন্ন হতে পারে।

—বুঝেছি। কিন্তু সাবধানে বলুন—বা একটা কাগজে লিখে দিন।

—লিখতে হবে না—আমি বলছি। ড্রাগনের দলের একজন লোককে আমি

চিনি।

—কোথায় থাকে?

—ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে।

—সে যে ড্রাগনের দলের লোক তা নিশ্চিত তো?

—নিশ্চয়ই, তার সঙ্গে আমার আলাপও খুব আছে। কিন্তু আমি কথা দিতে পারছি না সঠিকভাবে।

—কেন?

—কারণ বর্তমানে তাকে যে পাবই, তেমন কোনও নিশ্চয়তা নেই।

—তা বটে। তবু চেষ্টা করুন, যাতে তার ঠিকানা জানতে পারেন।

—ধন্যবাদ। কাল এই সময় এখানে এসে জানাব তার ঠিকানা।

দীপক বললে—তা হলে আমি উঠি এখন। কেমন?

—ঠিক আছে।

দীপক উঠে দাঁড়াল।

।। সাত ।।

আবার প্রতারণা

পরদিন সকালে।

দীপক ঘুম থেকে উঠেছে, এমন সময় হঠাৎ ঘন ঘন ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেল।

দীপক রতনকে বললে—বোধ হয় মিঃ গুপ্ত আসছেন।

রতন বললে—হ্যাঁ, তাই মনে হয়।

একটু পরে—ঘরের মধ্যে সত্যি প্রবেশ করলেন মিঃ গুপ্ত।

দীপক বললে—এই যা—শীগ্‌গির চা ও খাবারের ব্যবস্থা কর। কেমন?

—আচ্ছা বলে রতন চলে গেল।

দীপক বললে—এত সকালে যে এখানে?

—কারণ নিশ্চয় আছে। ড্রাগনের কোনও খবর পেলেন কি?

—চেষ্টায় আছি। আজ সন্ধ্যায় কিছু খবর পাব আশা আছে।

—কি রকম?

—একজন লোকের সন্ধান পাব—সে ড্রাগনের দলে কাজ করে।

—তা তো হলো। এদিকে ড্রাগনের আর একটা ভয়াবহ প্রত্যারণার খবর

পেলাম।

—কি রকম?

—একজন লোককে অর্ধ মূল্যে পাঁচশো গিনি সাপ্লাই করবে বলে ত্রিশ হাজার টাকা প্রতারণা করেছে ড্রাগনের দলবল।

—ঘটনাটা শুনি।

মিঃ গুপ্ত বলতে লাগলেন।

—ভবানীপুরে থাকেন একজন ভদ্রলোক—তাঁর নাম রামরতন বিশ্বাস। তাঁর কাছে একদিন একজন ভদ্রলোক এলেন একটা গিনি নিয়ে।

—সোনার গিনি?

—হ্যাঁ, তবে পুরানো দিনের। রামরতন গিনিটা দেখে বললে—এটা আসল মাল বটে।

ভদ্রলোক বললেন—একজন চোরের কাছে এই রকম পাঁচশো গিনি আছে। চোরটা সেটা বিক্রি করে দিতে চায়।

—চোরাই মাল?

—হ্যাঁ।

—তবে তো কম দাম হওয়া উচিত।

—হ্যাঁ, কম দাম তো বটেই।

—কত?

—প্রতি পিস ষাট টাকা।

—গিনিগুলো প্রতিটি এক ভরি করে ওজন। বাজার দর প্রতিটি ১২০০ টাকা।

রামতন বললে—আমি এটা যাচাই করে দেখতে পারি তো?

—নিশ্চয়।

—ঠিক আছে।

রামরতন তৎক্ষণাৎ গেল একজন স্যাকরার কাছে। স্যাকরা গিনিটা ওজন করে দেখল। তারপর সেটা কেটে গালিয়ে নিঃসন্দেহ হলো। সে সেটা পুরোদামে কিনে নিল।

রামরতন লোকটিকে ষাট টাকা দিল মাত্র।

তার মন খুশিতে ভরে উঠল।

সে বললে—আমি সব গিনিগুলো কিনে নিতে চাই।

লোকটি বললে—পাঁচশোই কিনবেন?

—হ্যাঁ!

—তা হলে দাম পড়বে ত্রিশ হাজার টাকা।

বেশ তো তাই দেব।

—কবে নেবেন?

—আজ তো হবে না—কাল নেবো।

—কাল কেন?

—কাল ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে রাখতে হবে। টাকা দিয়ে নেবো।

—কাল তা হলে চোরটিকে আসতে বলবো তো?

—হ্যাঁ।

—আমি তা হলে চোরটিকে ও গিনিগুলো নিয়ে কাল বিকাল পাঁচটা নাগাদ কালীঘাট পার্কে আসবো। সেখানে গিনিগুলো দিয়ে টাকাটা নিয়ে চলে যাবে চোরটা। অবশ্য এ কাজের জন্য আমাকে সে দুশো টাকা দেবে বলেছে।

—ঠিক আছে।

—লোকটা চলে গেল।

রামরতন নিশ্চিন্ত মনে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যাগে পুরে গেল কালীঘাট পার্কে। গিয়ে দেখে দূরে লোকটি বসে আছে। তার সঙ্গে অন্য একটা লোক —তার হাতে থলি।

রামরতন এগিয়ে গেল। সে টাকাটা দিয়ে দিল লোকটার হাতে। লোকটা তা গুণে নিল।

তারপর রামরতন যখন মালটা নিতে যাবে তখন কোত্থেকে হঠাৎ এসে গেল একটা পুলিশ সার্জেন্ট আর চারজন সাধারণ পুলিশ ।

তারা এসে চোরটিকে ও লোকটিকে গ্রেপ্তার করল। চোরটিকে একটা চড় মেরে বললে—শালা, এতদিন লুকিয়ে বেড়াচ্ছো—আজ তোমাকে পেয়েছি। থানায় চলো!

তা দেখে রামরতন ধরা পড়বার ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

তারপর সে পরদিন ভোরে গেল থানায়। তার কাহিনী শুনে সবাই বললে — এসব বানানো কৌশল। প্রতরণার ফন্দী। পুলিশ আসল পুলিশ নয়, নকল। তারা ভয় দেখিয়ে এইভাবে গিনিগুলো হাত করতে সাহায্য করেছে। এরা সকলেই একই দলের লোক।

তা শুনে রামরতন বিস্মিত হয়ে গেল। দেখে, সত্যি থানায় সে লোকটা বা চোরটা নেই। সে রকম কোনও পুলিশও নেই ঐ থানায়।

রামরতন তখন সব কেসটা ডায়েরী করল। থানার অফিসার শুনে তা জানালেন লালবাজারে—কারণ এটা একটা বিরাট অঙ্কের প্রতারণা।

একটু থামলেন মিঃ গুপ্ত। তারপর বললেন—আজ সকালে আমি অফিসে বসে আছি, এমন সময় একটা জরুরী মেসেজ ফোনে পেলাম।

—কে ফোন করেছিল?

—ড্রাগন। সে ফোনে আমাকে বললে যে, এসব তারই দলের কাজ।

—ড্রাগনের কাজ?

—হ্যাঁ।

—আশ্চর্য! লোকটা যেন যাদু জানে। কতভাবে যে সে প্রতরণা, ডাকাতি, চুরি, হত্যা ইত্যাদি সব কিছু করে চলেছে তার ইয়ত্তা নেই।

—সত্যিই তাই। লোকটির অসাধ্য কাজ নেই দেখছি।

—এখন একটা উপায় তো করতে হবে তাকে ধরার।

—নিশ্চয়।

—দেখা যাক, আজ সন্ধ্যায় খবর পাই কিনা।

—ঠিক আছে, দেখুন। আমি তা হলে এখন যাই, কেমন?

—আচ্ছা।

—মিঃ গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন।

।। আট।।

আকস্মিক আঘাত

সন্ধ্যার আঁধার নামল।

দেখতে দেখতে সাতটা বেজে গেল।

সাড়ে সাতটা নাগাদ দীপক বের হলো ঠিক আগের দিনের মতো পোশাক পরে।

মিঃ শর্মার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে যথারীতি নির্দিষ্ট সময়ে সে এসে উপস্থিত হলো মিড্‌ল্যাণ্ড হোটেলে।

আগের দিনের মতোই সে ছদ্মবেশে এক কোণে বসে রইল।

আটটা—সাড়ে আটটা—নটা।

নটা দশে এলো মিঃ শর্মা।

দীপককে আজ সে সহজে চিনতে পারল। সে এগিয়ে এসে বসল তার সামনের চেয়ারে।

—আসুন। কি খবর?

—খবর ভাল।

—তার মানে?

—মানে লোকটার নাম বিজয়। সে সাত নম্বর ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে

থাকে।

—ঠিক তো?

—নিশ্চয়।

—বেশ। যদি ধরতে পারি তাকে, ভাল পুরস্কার পাবেন।

—ধন্যবাদ।

মিঃ শর্মা বললে—আগে আমরা যে ধরনের ছোট কাজ করতাম আজকাল এরা তাও মোটা আকারে করতে শুরু করেছে।

—বুঝেছি।

—কিন্তু আমাদের কাজ ওদের করার কথা তো নয়। ড্রাগন হলো দস্যু। সে কেন প্রতারণার পথে আসবে? তাও মোটা টাকা লুণ্ঠন?

—তাই আপনাদের রাগ মিঃ শর্মা?

—ঠিক তাই।

—দেখা যাক, ড্রাগনকে ধরতে পারি কিনা।

দীপক বেরিয়ে এলো।

তারপর ট্যাক্সি নিয়ে সোজা গেল এস্প্ল্যানেডের মোড়ে। সেখানে গিয়ে সে ফোন করল মিঃ গুপ্তকে লালবাজারে।

মিঃ গুপ্ত ফোন ধরলেন।

হ্যাঁলো....কে?

—আমি দীপক।

—কি ব্যাপার?

—জরুরী ব্যাপার। ড্রাগনের সন্ধান পেয়ে যাব মনে হয়।

—কিভাবে?

—তার দলের একজনের খবর পেয়েছি। দেখি, তাকে ধরতে পারলেই ড্রাগনকে পাব।

—ঠিক আছে।

—আপনি এক্ষুণি চলে আসুন ইউরোপীয়ান-এসাইলাম লেনের সাত নম্বর বাড়িতে। লোকটার নাম বিজয়।

—আমি সেখানেই যাচ্ছি।

—আচ্ছা।

দীপক ফোন রেখে দিল।

তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে সে একটা ট্যাক্সি নিল।

ট্যাক্সি দ্রুত ছুটে চলল ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনের দিকে।

দীপক চিন্তা করতে লাগল।

মোড়ে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল দীপক।

তারপর গলিতে ঢুকে সাত নম্বর বাড়িটা পেতে দেরি হলো না।

রাত প্রায় দশটা।

সারা বাড়িটা আঁধারে ঢাকা। দীপক বাড়িটার পেছন দিক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল প্রাচীর টপকে।

ভেতরে ঢুকে দেখে বাড়িটা দোতলা। একতলায় কেউ নেই।

সব লোক কি বেরিয়ে গেছে নাকি?

দীপক দোতলায় উঠল।

দেখে একটা ঘরে আলো জ্বলছে।

দীপক ভেতরে গেল না। বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখতে লাগল।

ভেতরে বসে যে লোকটা, তাকে দীপক চেনে। তাকে অবশ্য একটা কেসে দীর্ঘদিন আগে সে দেখেছে। দীপক তাকে মনসুর বলে জানে।

দীপক বুঝতে পারল, সে আজকাল নাম ভাঁড়িয়ে বিজয় নামে ঘুরে বেড়ায়। দীপক দেখল সে একা।

একমনে টেবিলে বসে সে কি যেন করছে।

দীপক ভেতরে ঢুকবে কিনা ভাবতে লাগল।

কিন্তু ভাবা হলো না।

পেছন দিক থেকে এসে একটা পিস্তলের বাঁট দিয়ে দীপকের মাথায় সজোরে আঘাত করল।

দীপক এজন্য তৈরী ছিল না।

সে নিঃশব্দে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপরে।

সঙ্গে সঙ্গে তার হাত-পা বেঁধে ফেলল মনসুরের লোকটি।

ধীরে ধীরে দীপকের জ্ঞান ফিরে এলো।

দীপক তাকাল।

দেখে উজ্জ্বল আলোর নিচে শুয়ে আছে সে। তার হাত-পা বাঁধা। তার সামনে দাঁড়িয়ে মনসুর ও আরও দুটো লোক।

মনসুর বললে—কে তুমি?

দীপক বুঝল তার পরনে ছদ্মবেশ থাকাতে ওরা তাকে চিনতে পারেনি।

দীপক বললে—তোমার জেনে লাভ?

—তুমি চোর?

—হ্যাঁ।

—এ বাড়িতে ঢুকেছিলে কেন?

—চুরি করতে।

—টিকটিকি নও তো?

—না।

—তোমার কথা যে সত্য তার প্রমাণ?

—প্রমাণ কিছু নেই।

—তবে তোমাকে ছাড়ব না এখন।

—কেন?

—কর্তা আসবেন পরশু। তাঁকে দেখাব। তিনি যা বলবেন তাই হবে।

—কর্তা কে?

—সে তুমি চিনবে না।

—তাই বলে আমাকে আটকে রাখবে এভাবে?

—চোরের সাজা তাই হয়।

দীপক কথা বলে না। জানে কথা বলা বৃথা।

।। নয়।।

ড্রাগনের নিশানা

একটু পরে।

বোধ হয় আধঘণ্টা কেটে যায়।

এমন সময় একজন ছুটে আসে মনসুরের কাছে । বলে—পুলিশ।

—পুলিশ।

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

—এই বাড়ীতেই হুজুর।

—যাঃ, বাজে কথা।

—সত্যি হুজুর।

—হঠাৎ পুলিশ কেন?

—তা তো বুঝতে পারছি না।

বোধ হয় কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসেছে তারা।

—তা হতে পারে।

—আমার বিরুদ্ধে এমন কোনও প্রমাণ নেই যে পুলিশ কিছু করতে পারে।

—তা তো বটেই।

একটু পরে নিচে ঘন ঘন শব্দ হলো। কড়া নাড়ছেন মিঃ গুপ্ত।

একজন এসে দরজা খুলে দিল।

মিঃ গুপ্ত সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

বললেন—আর সব কোথায়?

—কারা?

—দলের লোকেরা?

—সব দোতলায় স্যার।

—চল।

সদলে মিঃ গুপ্ত পিস্তল উদ্যত করে উঠলেন দোতলায়।

উঠে দেখেন দীপক বন্দী হয়ে পড়ে আছে। তাকে ঘিরে দু'জন দাঁড়িয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে দু'জনকে গ্রেপ্তার করলেন ও দীপককে মুক্ত করলেন।

দীপক হেসে মনসুরকে বললে—কি হে, এবার বুঝতে পারলে তো আমি চোর নই।

—কে তুমি?

—আমি ছদ্মবেশী দীপক চ্যাটার্জী?

—এ্যাঁ!

ভূত দেখলেও সে বোধ হয় এতটা আঁতকে উঠত না কখনো।

মনসুর বললে—উঃ, আগে জানলে তোমাকে আমি খুন করতাম।

—কেন?

—তা হলে কর্তা মোটা রিওয়ার্ড দিতেন আমাকে।

—তা আর পেতে না। কারণ মিঃ গুপ্তের হাতে ধরা তোমাকে পড়তেই হতো।

মনসুর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

লালবাজার।

দীপক তখন স্বাভাবিক পোশাকে বসেছিল সেখানে।

বন্দী মনসুর ওরফে বিজয়কে আনা হলো সেখানে। দীপক বললে—তুমি কতদিন ড্রাগনের দলে কাজ করছো?

—ছ' মাস।

—তার আগে?

—তার আগে এসব করতাম না।

মা[illegible] তি[illegible] বছর [illegible] দেখেছি।

—তা হবে।

—তবে সত্যি কথা বলো তো বাবা।

—কি বলবো?

—ড্রাগন কোথায়?

—জানি না।

—জান না?

—সত্যি জানি না

দীপক তখন বললে—মিঃ গুপ্ত, একে দাওয়াই না দিলে কিছুই হবে না।

—দাওয়াই?

—হ্যাঁ, ভাল দাওয়াই দিতে হবে।

—বেশ তো—ভরত সিং—

একজন সেপাই ঢুকল।

—হুজুর?

—এই লোকটাকে ভাল দাওয়াই লাগাও তো—যতক্ষণ সত্যি কথা স্বীকার না করে।

—আচ্ছা।

ভরত সিং বললে—চলিয়ে সাব—

মনসুর ভয় পেলো।

বললে—বলছি।

—বেশ, বল।

—ড্রাগন এখন তার গুপ্ত আড্ডায়।

—কোথায় সেই গুপ্ত আড্ডা?

—ছাতুবাবুর বাজারের পেছনের গলিতে—দশ নম্বর বাড়িতে।

—ঠিক আছে, দেখছি। মিথ্যে হলে আবার ধোলাই হবে।

—মিথ্যা নয়।

—বেশ, দেখছি। ভরত সিং—একে নিয়ে যাও!

মনসুরকে লক্-আপে পাঠানো হলো।

দীপক বললে—মিঃ গুপ্ত, তা হলে চলুন।

—কোথায়? ঐ ঠিকানায়?

—নিশ্চয়ই। বি রেডি....

—ঠিক আছে।

—কিন্তু একটা কথা।

—বলুন?

—আমরা সদলে গেলে তারা তো পালাবে।

—তা বটে।

—দীপক একটু থেমে বললে—এক কাজ করুন। আপনারা দূরে থাকবেন। আমি দরজা দিয়ে ঢুকব।

—তা মন্দ নয়।

পুলিশ বাহিনী ছুটল।

।। দশ।।

অজানা দ্বীপের পথে

গভীর রাত।

রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা হবে।

দীপকরা সদলে এলো নির্দিষ্ট বাড়ির ঠিক সামনে।

মিঃ গুপ্ত বললেন—এবার আপনি যান ভেতরে। কেমন?

—হুঁ।

কিন্তু কথা শেষ হলো না।

ভেতর থেকে সমানে গুলি বর্ষিত হতে লাগল—গুড়ুম! গুড়ুম!

দীপক বললে—সর্বনাশ।

—কি হলো?

—ওরা জানতে পেরেছে যে আমরা এঁখানে এসে গেছি।

—তাই তো দেখছি।

—কি করা যায়?

—আমরাও গুলি চালাই?

—তাই করুন।

দু'পক্ষে সমানে গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেল। সারাটা অঞ্চল যেন সচকিত হয়ে উঠল এই ভয়াবহ যুদ্ধের শব্দে।

একটু পরে—

ড্রাগনের দল গুলি ছোঁড়া বন্ধ করল।

দীপকরা দরজা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে লাগল। তারপর একদল গিয়ে লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলল।

ভেতরে ঢুকল পুলিশ বাহিনী।

কিন্তু আশ্চর্য—এত বড় বাড়িটা যেন ঠিক ফাঁকা। কেউ নেই।

একতলার একটা ঘরে দেখা গেল সার সার সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে।

দীপক বললে—এটাই হলো পলায়নের গোপন পথ।

প্রথম সিঁড়ির নিচে একটা চিঠি।

তাতে লেখা রয়েছে ঃ

প্রিয় দীপকবাবু,

আশা করি খুব আশা নিয়ে এসেছিলেন এখানে ধরতে, কিন্তু তা পারলেন না। কারণ আপনি কোনও দিনও তা পারবেন না।

আমি অনেক টাকা উপার্জন করেছি। আর এখানে থাকবো না।

ভাবছি কোলকাতা শহর থেকে অনেক দূরে চলে যাব।

কোথায় যাব? তা জানাব না। হয়তো ভবিষ্যতে জানতে পারবেন।

এখানে শেষ করছি চিঠি। ইতি—

ড্রাগন।

দীপক চিঠিটা পড়ে বললে—আশ্চর্য তো! যেন হাওয়াতে মিলিয়ে গেল ওরা। তাই না।

—তা বটে।

মিঃ গুপ্ত চিন্তিত হলেন।

পরদিন সকালে।

কোলকাতা শহরের প্রতিটি কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হলো একটি খবর। দীপক চ্যাটার্জীর ড্রাগনের আড্ডায় হানা।

ড্রাগনের দলপতির পলায়ন।

অজানা দেশের উদ্দেশ্যে ড্রাগনের যাত্রা!

তার নিচে ছোট ছোট হরফে ড্রাগনের সংগ্রাম ও পলায়নের বিস্তৃত বিবরণ ছাপা হয়েছিল।

পরিশেষে ছাপা হয়েছিল ঃ

ড্রাগন সত্যিই অজানা দেশের দিকে যাত্রা করেছে কিনা জানি না। তবে একথা ঠিক যে, যদি ড্রাগন কোলকাতা শহরেই থাকে, তবে তার ক্রিয়াকলাপ শীগ্‌গিরই জানা যাবে। অবশ্য মনে হয় ড্রাগন সত্যিই ভারত ত্যাগ করেছে।

অবশ্য সংবাদপত্রে যা বের হয়েছিল তা সম্পূর্ণ সত্য নয়।

ড্রাগন তার বাছা বাছা কয়েকটি দলের লোক নিয়ে যাত্রা করেছিল অজানা এক দ্বীপের পথে। সে কাহিনীই এর পরে বলা হয়েছে।

।। এগারো।।

অজানা দ্বীপে

ড্রাগন তার দলবল নিয়ে একটা বিশেষ ধরনের সাবমেরিনে চড়ে রওনা হয়েছিল বঙ্গোপসাগরের কূল থেকে। তার দলের কেউ জানত না, ড্রাগন কোথায় চলেছে—কি তার উদ্দেশ্য।

তবে কেউ সাহস করে তাকে কোন প্রশ্ন করেনি—প্রশ্ন করতে চায়নি। তারা জানে ড্রাগন কি ধরনের লোক। তাকে প্রশ্ন করলে সে হয়তো পথের মাঝে কোথাও তাদের নামিয়ে দিয়ে চলে যাবে—কারণ সে রীতিমত একগুঁয়ে ধরনের মানুষ।

সাবমেরিন চলছিল।

ড্রাগন বসেছিল ক্যাপ্টেনের ঘরে। সে তাকে নির্দেশ দিয়ে চলছিল।

সময় কাটে—

এমন সময় একজন সঙ্গী ছুটে আসে।

—স্যার—

—কি ব্যাপার?

—ব্যাপার সাংঘাতিক। মনে হয় কোনও বিদেশী বা শত্রু জাহাজ আমাদের সন্ধান পেয়েছে।

—কি করে জানলে?

—কারণ আমাদের লোক পেরিস্কোপে দেখতে পেয়েছে একটা জাহাজ আসছে।

—তা আমি জানি!

—যদি ওরা আরও কাছে এসে পড়ে তবে কি করা আমাদের কর্তব্য?

—আমি যা নির্দেশ দেব, তাই করবে।

—আচ্ছা স্যার।

—মনে হয় জাহাজটি ঠিক শত্রু জাহাজ নয়। তবে যদি তারা আমাদের অস্তিত্ব জানতে পারে বা আমাদের তারা আক্রমণ করে তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হবে।

—তা ঠিক।

—তোমরা তৈরি থেকো। অবস্থা বুঝে আক্রমণ করার অর্ডার দেবো।

—ও, কে, স্যার।

লোকটা চলে যায়।

ড্রাগন চিন্তিত ভাবে সাবমেরিনের ক্যাপ্টেনের কার্য পদ্ধতি লক্ষ্য করে।

কিন্তু ড্রাগনের ভাগ্য ভালই বলতে হবে। কারণ জাহাজটা এদিকে এগোয় না। সেটা অন্য পথ ধরে দূরের দিকে চলে যায়।

ড্রাগনের সাবমেরিন অন্য একটা নির্দিষ্ট পথে এগোতে থাকে।

অবশেষে সাবমেরিন থামে।

সেটা ক্রমশঃ জলের তলা থেকে উপরে ভেসে ওঠে।

মাইকে ড্রাগনের কণ্ঠ শোনা গেল ঃ

বন্ধুগণ, আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এসে পৌঁছে গেছি। আর কোনও ভয় নেই আমাদের। এটা বঙ্গোপসাগরের একটি অজানা দ্বীপ। কোনও লোক এ ঠিকানা জানে না। এর আগে আমার আরও অনুচর এখানে এসেছে। তাদের বিরুদ্ধে সরকারি ওয়ারেন্ট ঝুলছিল। তারা পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে এবং নিরাপদে আছে।

তোমরা ইচ্ছে করলে এখানে নিরাপদ আশ্রয় থাকতে পারো। তোমাদের কোনও ভয় বা উৎকণ্ঠা নেই।

তবে যদি তোমরা ভয় পাও, তা হলে বাধ্য হয়ে যারা ভয় পাবে তাদের দেশে ফিরিয়ে দিতে হবে। কারণ এই সাবমেরিন আজই দেশে ফিরে যাবে নিজের কাজে। তবে প্রয়োজন বোধে আমি আবার একে খবর দিয়ে ডেকে আনব। আমি আবার ফিরে যাব কিছুদিন বাদে।

ড্রাগনের সহকর্মীদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এলো। বললে, কর্তা আমরা আপনার নির্দেশ মেনে চলতে প্রস্তুত।

—ধন্যবাদ।

সহকর্মীরা একত্রিত হয়ে দ্বীপে নামল।

ড্রাগন নামল তাদের পিছু পিছু।

সুন্দর ছোট্ট সাজানো দ্বীপ।

একধারে ফলের বাগান, অন্যদিকে উঁচু পাথর দিয়ে দ্বীপটি ঘেরা।

পাথর দিয়ে ঘেরা বলে সাধারণ কেউ বাইরে থেকে বুঝতে পারে না যে এর মধ্যে বাগান, ঝরনা, লোকজনের বসতি—সবই আছে।

এখানে অনেক দিনের প্রচেষ্টায় যে সব বাড়ি-ঘর তৈরি হয়েছে, সে বাড়িতে ড্রাগনের অনুগত লোকেরা বসবাস করে।

ড্রাগন পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

ড্রাগন তাদের বললে—আমার সঙ্গে আট-দশজন অনুগত অনুচর এসেছে। তারা একজন করে প্রত্যেকে তোমাদের বাড়িতে থাকবে। কাল থেকে তারাও তোমাদের সঙ্গে এই শহর গড়ে তোলার কাজে যোগ দেবে।

তারা সকলেই খুশী হলো।

কিন্তু তারা জানত না এর পরে এই সামান্য আনন্দময় মুহূর্তটি থাকবে না। নতুন এক বিপদের মাঝে পড়তে হবে তাদের।

পরদিন—

ড্রাগন তার আনা সব লোকদেরই পৃথক পৃথক কাজে নিয়োগ করল।

কারও কাজ হলো পাথর ভাঙা। কারও কাজ নানা জিনিস বহন করা। কারও বা কাজ পথ তৈরি করা।

নতুন একটা উপনিবেশ গড়ে তুলছিল ড্রাগন এই অঞ্চলে। তারই কাজ চলেছিল পূর্ণ উদ্যমে।

কিন্তু তবু গোলমাল শুরু হয়ে গেল।

ড্রাগনের দলের একজন ছিল সর্দার খাঁ। সে জানতো না যে, তারই প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু রহিমও এখানে কাজ করে।

সেদিন সকালে সে কাজ করতে গিয়ে রহিমের সাক্ষাৎ পেল।

রহিম তখন ড্রাগনের অনুগত প্রজা। সে বেশ সুখেই এখানে দিন কাটাচ্ছিল।

হঠাৎ সর্দার খাঁকে তারই অধীনে কাজ করতে আসতে দেখে সে অবাক হলো।

আর সর্দার খাঁর মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল।

সে রহিমকে প্রশ্ন করলো—তুই রহিম না?

—হ্যাঁ।

—বহুৎ আচ্ছা। বহুৎদিন পরে তোকে আমি দেখতে পেয়েছি। আজ তার ব্যবস্থা হবে।

—ব্যবস্থা? তার মানে?

—মানে তুই ভালই জানিস।

—কিছুই জানি না।

—তবে জানবি। এ দলের প্রধান লোক হলো আফজল খাঁ সাহেব।

—শুনেছি। তা তুমি কি বলতে চাও?

—আমি বলতে চাই না কিছু!' শুধু তোর মুণ্ডটা নিপাত করাই আমার কাজ। বলেই সর্দার খাঁ রহিমের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রহিমও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা আঘাত হানতে গেল।

কিন্তু তা পারল না। সর্দার খাঁর ঘুসি এসে পড়ল তার চোয়ালে।

রহিম পড়ে গেল।

সর্দার খাঁ হয়তো তাকে মেরে শেষ করত। কিন্তু তা পারল না। বাধা দিল একজন। ড্রাগনের দলপতি কখন এসে দাঁড়িয়েছিল তা কেউ জানতো না। সেই সর্দার খাঁকে বাধা দিল।

ড্রাগনের দলপতিকে দেখেই সর্দার খাঁ রুখে দাঁড়াল।

সে কোমর থেকে বের করল একটা ছোরা।

ড্রাগনের দলপতি তার স্পর্ধা দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

সে আচমকা তার উপরে লাফিয়ে পড়ে এক হাতে গলা চেপে ধরল, অন্য হাতে চেপে ধরল ছোরা সুদ্ধ হাতটা।

যুযুৎসুর প্যাঁচ শুরু হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে।

কিন্তু ড্রাগনের দলপতির সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম হলো না সর্দার খাঁ। তার হাতের ছোরাটা ছিটকে পড়ল। এমন সময় দু'জন লোক এগিয়ে এসে সর্দার খাঁকে ধরে ফেলল।

এদিকে দলে দলে লোক এসে জমে গেল সেখানে অল্প সময়ে।

ড্রাগনের দলপতির আদেশে একজন বন্দী করল সর্দার খাঁকে। তাকে নিয়ে যাওয়া হলো অজানা দ্বীপের হেড কোয়ার্টারের ছোট অফিস ঘরে।

ড্রাগন দ্রুত পায়ে আগেই চলে গেল সেখানে। তার দলের লোক আরো অনেকে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

ড্রাগনের দলপতি অফিস ঘরে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

তার সামনে হাজির করা হলো বন্দী সর্দার খাঁকে। রহিমও ছিল।

ড্রাগন ডাক দিল—সর্দার খাঁ!

—হুজুর।

—তুমি কি চাও যে আমি তোমাকে ভারতে নিয়ে গিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিই?

—না, স্যার।

—তুমি রহিমকে আক্রমণ করেছিলে কেন?

—ওর সঙ্গে আমার পুরনো শত্রুতা ছিল।

—শোন সর্দার খাঁ, তোমরা সকলেই শোন। এই অজানা দ্বীপে যারা আসবে, তাদের কিন্তু কখনো পুরনো শত্রুতা মনে রেখে চলতে আমি দেবো না। এখন তোমাদের নতুন জীবন। তা জানো?

সর্দার খাঁ নতজানু হয়ে ড্রাগনের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইল।

—সমাপ্ত—

শ্রী স্বপনকুমার

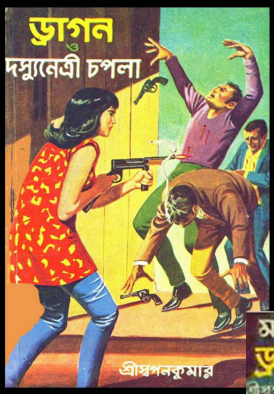

ড্রাগন

সমগ্র

দ্বিতীয় খন্ড